নগর বর্ধমানের দেবদেবী

(পরিমার্জিত ও সংযোজিত চতুর্থ সংস্করণ)

নীরদবরণ সরকার

পরিবেশনায়

শ্রীমতী সুজাতা সরকার
৮০, দুর্গাদাস তেওয়ারী রোড্,
কোটাল হাট, বর্ধমান—৭১৩১০২
ফোন—(০৩৪২) ২৫৩১২৪৪

পদ্মা-গঙ্গা পাবলিকেশন
স্টল নং-৩৪, ভবানী দত্ত লেন
কলকাতা - ৭০০০৭৩

NAGAR BARDHAMANER DEB-DEBI (Bengali)
By Nirod Baran Sarkar

প্রথম প্রকাশ ঃ
'রথযাত্রা'
২৯শে আষাঢ়, ১৪০৬ সাল, ইং ১৪ই জুলাই, ১৯৯৯

প্রাপ্তিস্থান ঃ
'নিউ সরবরাহ'
সর্ব্বমঙ্গলা পাড়া, নেতাজী
স্ট্যাচুর সামনে, বর্ধমান।

প্রাপ্তিস্থান ঃ
৮০, দুর্গাদাস তেওয়ারী রোড্
কোটালহাট, বর্ধমান-২

প্রচ্ছদ ঃ
শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস
বর্ধমান

মুদ্রক ঃ
শ্রী অশোক পাল
লেজার প্রিন্টিং (কম্পিউটার)
পাল প্রিন্টার্স
৬৬/বি মানিকতলা স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

প্রকাশিকা ঃ
শ্রীমতী সুজাতা সরকার
৮০, দুর্গাদাস তেওয়ারী রোড্,
কোটাল হাট, বর্ধমান—৭১৩১০২

উৎসর্গ

পিতা স্বর্গীয় নীহার রঞ্জন সরকার
মাতা স্বর্গীয়া নন্দরাণী সরকার
মাতামহী স্বর্গীয়া শৈলবালা রায়
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রী নীলরতন সরকার
জ্যেষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতি কমলা দত্ত কে।

ঃ সূচীপত্র ঃ

ভূমিকা

Dr. Mihir Choudhury Kamilya
M.A.,Ph. D.
Reader
Ex Head of the Department of Bengali,
Co-ordinator, D.S.A. (Sponsored by UGC)
Co-ordinator, Bengali Correspondence Course
THE UNIVERSITY OF BURDWAN
Burdwan-713104, W.B.

Office Phone : (0342)
63-913, 63-914
63-917-19, Ext. 434
Resi. Phone : (0342) 65082
Tarabag Teachers Qrs.
Block--A, Flat--6
P.O.+Dist : BURDWAN
Pin.- 713104

বর্ধমান খুব প্রাচীন নগর। মহাবীর বর্ধমানের এ-নগরে আগমন ঘটেছিল। প্রাচীন সাহিত্য শাস্ত্রে, অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতচন্দ্রের কাব্যে নগর বর্ধমানের প্রভূত প্রসংশা আছে। প্রাচীন নগরী বলে বর্ধমানে দেখার জিনিস অনেক। যুগে যুগে কালে কালে বর্ধমান মহারাজাদের অনন্য সব কীর্ত্তি কালের করাল গ্রাস থেকে এখনো আত্মরক্ষা করে চলেছে। সুপ্রাচীন মঠ-মন্দির-মসজিদ আস্তানা সৌধ পুস্করিণী বাগ-বাগিচা—এমনি সব অনেক প্রাচীন দর্শনীয় জিনিস বর্ধমান নগরে থরে থরে সাজানো। সেকালের লোকেরা এসব দেখতেন, দুরান্তরের লোকেরা আকুল আগ্রহে ছুটে আসতেন। দেশি-বিদেশি পর্যটকেরা এদেশে এলে বর্ধমান নগর না-দেখে ফিরতেন না। একজন কবি তো বলেই ছিলেন—'বর্ধমান দেশ ভাই সবাকার নাভি'। আর একজন বলেছিলেন—'ধন্য গৌড় যে দেশে এ দেশ'। কিন্তু সাম্প্রতিককালে মানুষ এত আত্ম-কেন্দ্রিক হয়েছে, অর্থের পেছনে এতো ছুটেছে যে, এই সব প্রাচীন জিনিস দর্শনকে অকাজ, কু-কাজ, বিলাস বলে মনে করে। কিন্তু তবু কিছু লোক আছেন, যাঁরা দেশে প্রাচীন ঐতিহ্যকে শ্রদ্ধা করেন, পুরনো জিনিস দেখে তৃপ্তি লাভ করেন। দেখার জন্য সময় ও অর্থ খরচ করতে পেছপা হন না।

'নগর বর্ধমান' বর্ধমান জেলার রাজধানী শহর। বর্ধমান জেলাকে নিয়ে গ্রন্থ অনেক বেরিয়েছে। সমগ্র জেলার ইতিহাস, ভূগোল, সংস্কৃতি, রাজনীতি, মনীষী ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয়ে অনেক লেখকই স্মরণীয় শ্রম দান করেছেন। কিন্তু এক্কেবারে নগর বর্ধমানকে নিয়ে? —না—তেমন কোনো বই আমার চোখে পড়ে নি। অথচ বর্ধমান শহরে দীর্ঘ তেত্রিশ বছর আছি। আর রাঢ় সংস্কৃতির উপরে দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে গবেষণা করেছি।

ঠিক এই রকম একটি পরিস্থিতিতে অনন্য সুন্দর এক প্রচ্ছদ নিয়ে শ্রীযুক্ত নীরদ বরণ সরকার তাঁর 'নগর বর্ধমানের দেব দেবী' গ্রন্থটি প্রকাশ করলেন। শ্রীযুক্ত

সরকার লোক-সংস্কৃতির গবেষণার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নবাগত। সারাজীবন অন্য পেশায় যুক্ত ছিলেন। কিন্তু আকস্মিকভাবে একান্ত ভালোবাসার তাগিদে ও স্বেচ্ছাদায়িত্বে তাঁর মাতৃভূমি নগর বর্ধমানের গৌরববাহী প্রাচীন সম্পদকে তিনি জনসমক্ষে তুলে ধরতে ব্রতী হয়েছেন। তিনি এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে নগর বর্ধমানের পঁচিশটি দর্শনীয় প্রাচীন সম্পদের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন। আর তারই জন্য তাঁর যে-শ্রম, যে-সেবা ও আন্তরিকতা প্রকাশিত হয়েছে, তাতে আমি অভিভূত হয়েছি। আর তারই জন্যে শ্রীযুক্ত সরকারের এই পদক্ষেপকে, সাদর অভিনন্দন জ্ঞাপন করি। তাঁর গ্রন্থে নগর বর্ধমানের মহন্তর অস্থল, দেবী সর্বমঙ্গলা, লক্ষ্মীনারায়ণ, দুর্লভা কালী, রাধাবল্লভ, কঙ্কালেশ্বরী, শক্তি বিবি থেকে বর্ধমানেশ্বর শিব হয়ে একশ আট শিব পর্যন্ত অসংখ্য প্রবন্ধে প্রাচীন-নগর-বর্ধমান মূর্ত হয়ে উঠেছে। এই কাজটি তিনি উপস্থাপন করে শুধু বর্ধমানবাসীর নয়, দেশবাসীর সাধুবাদ লাভ করবেন। এসব জিনিস মানুষের অবহেলা ও উপেক্ষার শিকার হয়ে একদিন হয়তো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কিন্তু এগুলি যে আমাদের পিতৃ পুরুষের অনন্য সৃষ্টি ও অভিনব ভাবনার ফসল, এই বোধটি তাঁর মতো আর কে বুঝেছে? তাঁর গবেষণায় হয়তো মন্দিরের সংস্কার করতে কেউ ছুটে আসবে না, বিগ্রহের গায়ে কেউ রং চড়াবে না, কিন্তু এই গ্রন্থটি পাঠ করলে বর্ধমান যাদের জন্মভূমি তাদের ভেতরে ভেতরে একটি অনন্যসুন্দর ভাব ও ভাবনা নিশ্চিত ক্রিয়া করবে। শ্রীযুক্ত সরকারের সাফল্য সেখানেই। আর এরই মধ্য দিয়ে লেখকের সঙ্গে পাঠকেরাও কিছুটা মাতৃঋণ শোধের দুর্লভ সুযোগ পাবেন। দূরান্তর থেকে গবেষকরা আসবেন, অনুসন্ধিৎসু মানুষ হাজির হবেন, অনেক কৌতূহলী জুটবেন, আর তাঁদের কাছে 'নগর বর্ধমানের দেব দেবী' গ্রন্থটি তাঁদের মনের অনেক খোরাক জোগাবে।

শ্রীযুক্ত সরকারের প্রাজ্ঞ বোধ, বয়স্থ ব্যক্তিত্ব, সম্প্রীতি-স্বচ্ছল মন আর গভীরতর ভালোবাসা গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। আর তারই জন্য নগর বর্ধমানের সামগ্রিক ইতিহাসের একটি বদ্ধ দরজার তিনি দ্বার উদঘাটন করলেন। সনামধন্য শিল্পী গোপাল দাসের নয়ন লোভন প্রচ্ছদটি পাঠকের চোখকে তৃপ্তি দেবে, ভেতরের ছবিগুলি পাঠককে কৌতূহলী করবে। তেমনি অনেক জানা জিনিসের সঙ্গে অনেক অজানা তথ্য উপহার দিয়ে লেখক আমাদের জ্ঞানের ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করলেন। নগর বর্ধমানের প্রাচীন লোক সংস্কৃতির ধারক বাহক ও প্রচারক এই গ্রন্থকারকে আমি প্রশ্নাতীত কণ্ঠে অফুরন্ত অভিনন্দন জ্ঞাপন করি। তাঁর লেখনী স্বর্ণপ্রসূ হউক —প্রার্থনা করি।

স্বাঃ মিহির চৌধুরী কামিল্যা

শিক্ষার ক্ষেত্রে শেষ কথা কেউ কখনও বলতে পারেন না। আমরা শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করার সময় পর্যন্ত শিখি। এই শেখাটাই আমাদের জীবন ধর্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। শিক্ষা বিকাশের উল্লেখযোগ্য প্রকাশ হল আবিষ্করণ। শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী আবিষ্কার করেন। নীরদবাবুও নিজেকে এবং বর্ধমানের অনেক পুরা কীর্ত্তির পুরা কাহিনী আবিষ্কার করলেন। নীরদবাবু (ব্যক্তিগত জীবনে তিনি আমার বন্ধু) এরকম লেখক ও গবেষক হয়ে উঠতে পারেন, এ কথা কোনদিন ভাবি নি। তাঁর চেষ্টা ও নিষ্ঠা অনবদ্য।

বর্ধমান শহর এবং শহরতলির শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সত্যই বর্ধমান। এই বর্ধমানের প্রাচীন এবং বর্ত্তমান দেব-দেবীর প্রতিষ্ঠানগুলি আজও আমাদের সাংস্কৃতিক চিন্তা ও চেতনার প্রাণ কেন্দ্র। নীরদবাবুর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল হিসাবে মহন্ত অস্থল, দুর্লভা কালী মা, কঙ্কালেশ্বরী কালী মা, বিজয়ানন্দ বিহার সহ উল্লিখিত সব পীঠস্থানগুলি আমাদের মনজগতে বহুকাল ছবি হয়ে থাকবে। "নগর বর্ধমানের দেব-দেবী" এই আত্ম সর্বস্ব চেতনার যুগে আমাদের মনের সংস্ক্রীয়ার নিশ্চয়ই সহায়ক হয়ে উঠবে। শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাচীন প্রথার সংস্কার যেমন দরকার, প্রাচীন ঐতিহ্য এর সংরক্ষণও তেমন প্রয়োজন। এই গ্রন্থ বর্ধমানের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এর ধারক হয়ে উঠবে।

স্বাঃ বিমলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়

২৬-০৮-৯৯



ডঃ সুকুমার সেন প্রতিষ্ঠিত
রাঢ় সংস্কৃতি পরিষদ
(স্থাপিত ১৯৮২)
১৯, ডি. এন. মিত্র. লেন ● বর্ধমান-৭১৩১০১
[Organisation of Social and analytical aspects]
(S.T.D-0342)
©-64025

বর্ধমানের নগর দেব-দেবী

রাঢ়ের সংস্কৃতি প্রাগিতিহাসের। এর ধর্ম ও ধর্মানুসারী ঐতিহ্যের পিছনে রয়েছে বিভিন্ন ধর্ম প্রবাহের আন্দোলন। ভারতের আদি বাসিন্দা, অনার্য, অস্ট্রিক, দ্রাবিড় প্রভৃতি সারা ভারতে যেসব দেব-দেবীর পূজা-আর্চা করত আর্য সভ্যতা তাঁদের বিনষ্ট না করে অন্ত্যজ-অচ্ছ্যুৎ দৃষ্টি ভঙ্গী পরিহার করে সেই সব দেব-দেবীকে আত্মীকরণ করেছে। এই আর্য ও অনার্য সংস্কৃতির সাঙ্গীকৃত চিহ্ন হল বর্তমান 'বর্ধমানের' দেব-দেবীর বর্তমান রূপান্তর। বর্ধমানের জৈন, বৌদ্ধ, শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব ধর্মান্দোলনের তরঙ্গ বারে বারে আছড়ে পড়েছে। বর্ধমানের আদিবাসী ডোম, বোড়ো, কিরাত, কাহার প্রভৃতি অস্ট্রীক দ্রাবিড় গোষ্ঠীয়। তাদের ধর্ম ভাবনা মূর্ত হয়ে উঠেছিল বিভিন্ন দেব-দেবীর মধ্যে। মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পার মত বর্ধমানের বিভিন্ন জায়গায় ভরতপুর, বীরভানপুর, পাণ্ডুরাজার ঢিবি, মঙ্গলকোটে কুনুর ও অজয়ের সঙ্গমস্থলে ও কাঞ্চননগরে যেসব প্রত্নবস্তু পাওয়া গেছে তা থেকেই প্রমাণিত হয় রাঢ়ের ধর্মভাবনা প্রাগৈতিহাসের। ডঃ শশিভূষণ দাসগুপ্তের মতে ভারতের শক্তি সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য—মাতা পৃথ্বীকে কেন্দ্র করে। প্রাচীন বৈদিক ধর্ম কোন ধর্মকেই ব্রাত্য বলে মনে করেনি। আত্মীকরণ ও অন্তর্লীনতায় তার অস্তিত্ব রক্ষা করেছে। তাই রাঢ় বর্ধমানের ধর্ম্ম পূজা অন্ত্যজ জনের হয়েও সর্বশ্রেণীর গণ দেবতা। ধর্মের এই সাম্যভাবনা ভারত আত্মারই একটি শিষ্ট রূপ। ধর্ম শব্দের অর্থ হল যা ধারণ করে, ধৃ ধাতু ম-প্রত্যয়। রাঢ়ের ধর্মভাবনা রাঢ়ের দেব-দেবীর পূজা-অর্চনার মধ্যে অন্তঃ সলিলার মত অনাদিকাল থেকে স্রোতোমানা। ধর্ম ঠাকুর যেমন বর্তুলাকার, গোলাকার, ডিম্বাকার ও প্রস্তর খণ্ডে খোদিত ও অখোদিত শূন্য মূর্তিরূপে গ্রামে গ্রামে কোথাও ধর্মঠাকুর, শিব, নাড়ুগোপাল, নাড়েশ্বর, বানেশ্বর, মুণ্ডেশ্বর, কিরীটেশ্বর, রাঢ়েশ্বর নামে পূজিত হচ্ছেন, তেমনি মনসা, কালী, সর্বমঙ্গলা, চণ্ডী,



উত্তরফটক (রাজবাটী, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়)



বিজয়-তোরণ



শিখ ধর্মের গুরুদুয়ারা



রাধা দামোদর জীউ মন্দির (মহন্ত অস্থল)



অতীতের মহন্ত অস্থল বর্তমানে হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল





কঙ্কালেশ্বরী



কমলাকান্ত কালীসাধকের স্বনির্মিত মন্দির ([illegible])



মেঘনাদ সাহা তারামণ্ডল



বর্ধমান বিজ্ঞান কেন্দ্র



চামুণ্ডা, সিদ্ধেশ্বরী, শাকম্ভরী, যোগাদ্যা নামেও শক্তি পূজা চলে আসছে। আবার লক্ষ্মী-নারায়ণ জীউ, রাধাকৃষ্ণ, রাধাবল্লভ, নারায়ণ, বিষ্ণু প্রভৃতি নামেও পূজিত হচ্ছেন। এসবই এক এক সময়ে ভারতে যে ধর্ম বিপ্লব ঘটেছিল তারই প্রমাণ সূচিত করে। কাজেই রাঢ়ের ধর্মভাবনা একদিকে যেমন প্রাচীন, প্রাগৈতিহাসের, তেমনি তার সমন্বয় ও আত্মীকরণ কিভাবে হয়েছিল তার নমুনা মেলে। এ "যেন বিন্দুতে সিন্ধুর স্বাদ, গোষ্পদে আকাশ।" বর্ধমান তাই ভারতের বিম্বিত প্রতিরূপ।

মার্কেণ্ডয় চণ্ডীপুরাণে বর্ণিত দুর্গম ভবসাগরে নৌকা স্বরূপ বলে তিনি দুর্গা, আবার দুর্গম নামক অসুর বধ করেছিলেন বলেও তিনি দুর্গা। দেবী পুরাণে দুর্গার স্তব স্তুতি আছে—

"ত্বং হি দুর্গে মহাবীর্যে দুর্গে দুর্গ পরাক্রমে।" তেমনি দশম শতাব্দীতে রামাই পণ্ডিত যে বল্লুকা নদীর তীরে ধর্মপূজার প্রচলন করেন তাঁর 'শূন্য পুরাণ" কে পঞ্চ ম বেদ বলেছিলেন,

"বাড়ী মোর বল্লুকার।
পূজি শ্রী নৈরাকার।।
শূন্য মূর্তি ধ্যান করি।
সাকার মূর্তি ভজি।।
পূর্ব মুখে পূজা করি।
পঞ্চ ম বেদ পড়ি।।"

অর্থাৎ ধর্ম্মপূজার মধ্যে সবার সমাগম—সাকার ভাবনা, নিরাকার ভাবনা। সাকারবাদী ও নিরাকারবাদীদের সমন্বয় অন্য কোন সমাজ বা ধর্ম্মচেতনায় বিরল। বৌদ্ধ বাদীদের এই অবদানের মধ্যে বৈদিক ধর্মের ঔদার্য পরিস্ফুট। দেব-দেবী ও পীর পয়গম্বরের ভজনার মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের ভারতধর্মের বৈশিষ্ট্যটি ধরা পড়বে। নিরাকার ব্রহ্মবাদী বৈদিক ও ইসলাম ধর্মের অন্বিত রূপ।

পরম স্নেহভাজন শ্রী নীরদবরণ সরকার সম্প্রতি 'নগর বর্ধমানের দেবদেবী" নামে একটি পুস্তক প্রকাশ করে রাঢ়ের অনার্য ও আর্য সম্ভূত বৈদিক ধর্মচেতনার একটি চিত্র তুলে ধরেছেন। শ্রী সরকার ইতিপূর্বে 'বিজয়তোরণ' পত্রিকায় "সমাজ, পরিবেশ ও আমরা" শীর্ষক কয়েকটি প্রবন্ধে সমাজ চেতনার পরিচয় দিয়েছেন। এবার তিনি কেবল নগর বর্ধমানের দেবদেবীর নষ্টকোষ্ঠি উদ্ধারের চেষ্ঠা করে অবহেলিত দেবদেবীগুলিকে বর্ধমানবাসীর চোখের আলোয় তুলে ধরেছেন।

অর্বাচীন যুগের অনেকেই এ তথ্য সম্পর্কে সেরকম প্রাজ্ঞ নন। সমাজের চরম অবক্ষয়ের যুগে যখন নীতি ও মূল্যবোধ ক্ষয়িষ্ণু, বেশীর ভাগই পূজা-অর্চনার মধ্যে আড়ম্বরকেই প্রাধান্য দেয়, সেখানে দেব-দেবী সম্পর্কে সম্যক পরিচয় তুলে ধরে শ্রীমান নীরদবরণ দেশ ও জাতির প্রতি এক মহৎ কর্তব্য পালন করেছেন। কারণ

বাঙালি বড় বেশি আত্মবিস্মৃত জাতি। প্রত্যেকটি দেবদেবী ও তার আরাধনার মধ্যে যে কার্যকারণ সম্পর্ক থাকে তা গবেষকের চোখে ধরা পড়ে। শ্রীমান নীরদবরণ সেই অবেক্ষ গবেষণার দৃষ্টিতে দেবদেবীগুলির উৎস ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে প্রয়োজনীয়তা নিপুণভাবে তুলে ধরে লুপ্ত প্রায় সমাজচিত্রকে তুলে ধরে ভক্তজনের ও বিদগ্ধ জনের প্রশংসা অর্জন করবেন, সেবিষয়ে সন্দেহ নেই।

বর্ধমানের ভগ্ন প্রায় মহন্তস্থল, শ্রীশ্রীদেবী সর্বমঙ্গলা, দুর্লভা কালীমা, কঙ্কালেশ্বরী কালী, শক্তিবিবি ঠাকুর, ফৌজ দারী কালী, কমলাকান্ত কালী, সোনার কালী, দেবী দক্ষিণা কালী, তেজগঞ্জের কালী, ভৈরবীশ্বরী কালী, এর প্রত্যেকটির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে আবির্ভাব ও সমসাময়িক কালের সমাজ ভাবনা লেখকের কলমে ধরা পড়েছে। এগুলি বর্ধমানের শক্তি সাধনার পরিচায়ক। কুব্জিকাতন্ত্রে ও মার্কেণ্ডয় পুরাণে উল্লিখিত থাকায় রাঢ়ে শক্তি সাধনার কৌলিন্যকবচ পুনরুদ্ধার সম্ভব হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ বর্ধমান যে ধর্মপূজার পীঠস্থান তা ঈশানেশ্বর শিব, রাজরাজেশ্বর, বিজয়ানন্দেশ্বর শিব, বর্ধমানেশ্বর শিব ও ১০৮ শিব মন্দির তার প্রমাণ। আর তৃতীয়ত এই জেলায় বৈষ্ণব ধর্মের প্রবাহের চিহ্ন রেখে গেছে—রাধাবল্লভ জীউ, লক্ষ্মীনারায়ণ জীউ, শ্যামসুন্দর জীউ দেব-দেবী তার মূর্ত প্রতীক। একদিকে শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণবের সাঙ্গীকরণ এবং অপরদিকে এই সমস্ত দেব-দেবীকে বৈদিক ধর্ম্মে স্থান দেওয়া ভারত ধর্ম্মেরই পরিচায়ক কিন্তু শ্রীমান নীরদবরণকে বলবো, আরও বহু দেব-দেবী অনুল্লেখিত রয়ে গেছে। তাদের নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার করে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে পরবর্তী মুদ্রণে যাতে তা রূপদান করা যায় তা দেখতে হবে।

অবশেষে একটা কথা বলি। আজকের ধর্ম চেতনার মধ্যে কেবল হিন্দু দেব-দেবীর নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার করলেই হবে না। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সুফীবাদের বন্যায় বর্ধমান প্লাবিত। সেই সব পীর ও পীরস্থানের ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরা দরকার। আশাকরি নীরদবরণ তাঁর গবেষকের দৃষ্টি অদীনসত্ব করে তুলবে। পুস্তকখানি তাঁর প্রথম সৃষ্টি। 'রাঢ় সংস্কৃতি পরিষদ' এ সম্পর্কে গবেষণা কার্যে ব্রতী। শ্রী সরকার আমারই প্রেরণায় রাঢ় সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। তার উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি।

স্বাঃ শ্রী সুধীর চন্দ্র দাঁ,
সভাপতি
১৯, ডি. এন. মিত্র লেন,
রায় সংস্কৃতি পরিষদ
বর্ধমান।

নিবেদন

(প্রথম সংস্করণ)

"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতা।।"
"জননী জন্ম-ভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী।"

কেবলমাত্র বর্ধমান শহরের মধ্যেই যে সমস্ত প্রাচীন দেব দেউল এবং দুর্লভ বিগ্রহ ছিল বা এখনও যেগুলি জরাজীর্ণ অবস্থায় শেষ চিহ্নটুকু নিয়ে বিরাজ করছে এগুলি সম্বন্ধে তথ্য ভিত্তিক কোন রচনা নেই বললেই চলে। তাই সরকারী চাকুরী থেকে অবসর নিয়ে আমি বর্ধমান শহরের প্রাচীন দেবদেবী যেগুলিকে ঘিরে বর্ধমান শহর প্রাণচঞ্চল ছিল এবং ঐ সমস্ত দেবশালার সঙ্গে যুক্ত সারা বছরের বিভিন্ন সময়ের, বিভিন্ন রকমের অনুষ্ঠান যা বর্ধমান শহরকে সবসময় উৎসব মুখরিত করে রাখতো এবং সেই অনুষ্ঠানগুলি শহরের প্রতিষ্ঠিত দেবদেবীকে অবলম্বন করেই ছিল তা আজ লুপ্ত প্রায়—ভগ্ন, জীর্ণ। সেই সম্বন্ধে আমি আমার সীমিত ক্ষমতায় চেষ্টা করেছি বর্ধমানবাসীর কাছে তুলে ধরার। প্রাচীন বর্ধমানবাসী বিশেষভাবে যাঁরা এই সমস্ত দেব দেউল সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে যাঁরা রস উপভোগ করেছেন, যাঁদের স্মৃতির মণিকোঠায় আজও সেই সমস্ত উৎসবের রেশ ভেসে আসছে বা যাঁদের কাছে সব কিছুই আজ স্মৃতি, তাঁদের কাছেও যদি অতীতের সেই সমস্ত ঘটনার কিছুটা অন্ততঃ তুলে ধরতে পারি তাহলে এই বলে নিজেকে সান্ত্বনা দেব যে আমার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কিছুটা সফল হয়েছে। তবে সেই বিচার করার ক্ষমতা শুধু পাঠকদেরই।

১৯৯৬ সালে সরকারী চাকুরী থেকে অবসর নিয়েছি। কিন্তু আমি আমার কর্মজীবন থেকে অবসর নিইনি। পরন্তু আমি আজ ৬২ বছর বয়সে নূতন উদ্যমে অতীতের কিছু স্মৃতি বিজড়িত ঘটনা পাঠক পাঠিকার কাছে তুলে ধরতে চাই নিজের আত্মসন্তুষ্টির জন্য।

আমার কিছু লেখা "সমাজ, পরিবেশ ও আমরা" বর্ধমানের একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় ধারাবাহিক ছাপা হয়েছিল। কিন্তু দেখলাম বর্ত্তমান পরিবেশে সত্য কথা বলা মহা পাপ। শুধু পাপই নয়। উপরন্তু বিপদও বটে। তাই মনস্থির করে আমার লেখনি উল্টো দিকে ঘুরিয়ে দিলাম। কারণ বয়সও হয়েছে বরং ঠাকুর দেবতা সম্বন্ধে লেখা লিখি করলে মনও ভালো থাকবে এবং তার সাথে আমারও মনে ঐ সমস্ত অতীত ইতিহাস আবার জাগরিত হবে এবং শান্তি পাব। তাই আমি "নগর বর্ধমানের দেব-দেবী" গ্রন্থটি লিখলাম। আমি প্রত্যেকটি দেব মন্দিরে গিয়ে সমস্ত

তথ্য সংগ্রহ করেছি। এই বয়সেও আমি আমার বহুদিনের সাথী "প্রিয়া স্কুটারটি" নিয়ে সকালে বেড়িয়ে তথ্য সংগ্রহ করে ফিরে এসেছি আবার কিছুটা বিশ্রাম নিয়ে আবার বেড়িয়েছি তথ্য সংগ্রহে। বিশেষ করে "মহন্তর অস্থল" সম্বন্ধে যেটুকু লিখেছি সবই কিন্তু ভগ্ন মন্দিরে দিনের পর দিন গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করার কারণে। কারণ আমার ধারণা বর্ধমান মহন্তর অস্থল সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ বোধ হয় নেই। তাই আমার প্রথম লেখাই হচ্ছে "বর্ধমান মহন্তর অস্থল" আর তা ছাড়া এ সম্বন্ধে আমারও নিজের দুর্বলতা হলো অতীতে এই বর্ধমান মহন্তর অস্থলের কি রমরমাই না ছিল। শহরের বহু বিখ্যাত অনুষ্ঠান এই মহন্তর অস্থলে হয়েছে। ছেলেবেলায় প্রায় প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে তার রস গ্রহণ করেছি। তাই সেই সমস্ত ঘটনা আজও "স্মৃতি তুমি বেদনার" মত রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুভব করছি। তবে দুঃখ হয় যখন চিন্তা করি এই সমস্ত দুর্লভ দেব-দেউল সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থাই নাই। যে সমস্ত জিনিস ধবংস হয়ে যাচ্ছে সেগুলি তো আর ফিরে আসবে না। সেই সমস্ত অতীতের শিল্পকলা, ভাস্কর্য্য, দুর্লভ বিগ্রহ শুধু সংরক্ষণ এবং সংস্কারের অভাবে বর্ত্তমানে সমস্ত বিলুপ্ত।

অতীতে বর্ধমান শহরের প্রাণ সঞ্চার হয়েছিল বর্ধমান রাজবাড়ীকে ঘিরে। এই শহরের প্রাণ চাঞ্চল্য জেগেছিল ঘনশ্যাম কৃষ্ণরামের আমল থেকে। সেই চাঞ্চল্য দেব সেবাকে অবলম্বন করে গতিময় রূপ নিয়েছিল জমিদারী উচ্ছেদের সময় পর্য্যন্ত। শুধু বর্ধমান শহরেই নয় কালনা, কাটোয়া প্রভৃতি শহরে এমন কি গ্রাম গঞ্জে দেব বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে সাধারণ মানুষকে দেব সেবার মাধ্যমে মানব সেবায় উদ্বুদ্ধ করেছিলেন রাণী ব্রজ কিশোরী, কীর্ত্তিচাঁদ, চিত্র সেন, তিলক চাঁদ প্রভৃতি। জমিদারী উচ্ছেদের ফলে সেই ধারা স্তব্ধ। বর্ধমান শহরেই অধিষ্ঠাত্রী দেবী সবর্বমঙ্গলার মন্দির থেকে শুরু করে লক্ষ্মীনারায়ণ জীউর মন্দির, রাধাবল্লভ জীউ মন্দির, অন্নপূর্ণা ও রাজরাজেশ্বর মন্দির, শ্যামসুন্দর জীউর মন্দির, শক্তিবিবির ঠাকুর বাড়ী, মনমোহিনী দেবীর ঠাকুর বাড়ী, ঈশানেশ্বর শিবের মন্দির, রাজ রাজেশ্বর শিব মন্দির, বিজয়ানন্দ বিহার, ১০৮ শিবমন্দির, দুর্লভা কালীমন্দির, সাধক কমলাকান্ত কালীবাড়ী, কঙ্কালেশ্বরী কালীমন্দির, মহন্তর অস্থল, খাজা আনোয়ার বেড়ে দক্ষিণাকালী, খান্নাজী ঠাকুর বাড়ী, শ্রীশ্রী ভূবনেশ্বরী দেবী মন্দির, সোনার কালীবাড়ী, উইলবাড়ী প্রভৃতি দেবশালাগুলি হয় তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত দেবশালা নতুবা তাঁহাদের সাহায্যে পরিচালিত দেবশালা। আর এই দেবশালাগুলিকে ঘিরেই ছিল অতীতের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক সামাজিক অনুষ্ঠান এবং বিনোদনের ক্ষেত্র। আমি শৈশব থেকেই এই দেবশালাগুলি সম্বন্ধে খুবই আগ্রহী ছিলাম। কর্মস্থল থেকে অবসর নিয়ে তাই

কিছু কিছু ঐতিহ্যবাহী দেবশালাকে নিয়ে অতীত গৌরবের সামান্য কিছু তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি মাত্র। তবে কতদূর সফল হয়েছি তা বিচার্য্য। তবে এই সমস্ত ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানগুলি বর্ত্তমানে ধবংস প্রাপ্ত বা কঙ্কালসার অবস্থায় কোন রকমে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে হয়ত কিছু দিন বাদে আর কোন চিহ্নই থাকবে না।

একবালে বর্ধমানকে বলা হত দ্বিতীয় বৃন্দাবন। রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র তাঁর বিদ্যাসুন্দর কাব্যে অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে বর্ধমান শহরের সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন-

"দেখি পুরী বর্ধমান সুন্দর চৌদিকে চান
ধন্য গৌড় যে দেশে এ দেশ
রাজা বড় ভাগ্যধর কাছে নদ দামোদর—
ভাল বটে জানিনু বিশেষ ॥"

অতীতে বর্ধমান শহর সারা বছর কিরূপ গতিশীল ছিল তার কিছু কিছু দৃষ্টান্ত এখানে তুলে ধরছি। তখন বর্ধমান শহরের আষাঢ় মাসে রথযাত্রা এবং তাকে উপলক্ষ্য করে বিরাট মেলা বসত রথতলায়। বিশাল একজোড়া কাঠের রথ ছিল। একটিকে বলা হত রাজার রথ আর একটিকে বলা হত রাণীর রথ। প্রকাণ্ড মাঠে রথ টানা হতো। সমগ্র মাঠ জুড়ে মেলা বসত। মেলাতে কুটীর শিল্পের নানা জিনিস বিক্রী হতো। আট দিন পর পুনর্যাত্রা উল্টোরথ। ঐ দিনও মেলা বসত। এখন সে রথ আর নেই তাই টানা হয় না।

তারপর শ্রাবণ মাসের ঝুলন উৎসব। তখনকার দিনে মহন্তর অস্থল এবং রাজার ঠাকুর বাড়ীর ঝুলন ছিল অতি বিখ্যাত আর অত্যন্ত আকর্ষণীয়। শ্রাবণী পূর্ণিমায় এই ঝুলন উৎসব হতো। সেই সঙ্গে এক এক ঠাকুর বাড়ীতে এক এক রকম যাত্রা, কোন ঠাকুর বাড়ীতে মতি রায়ের যাত্রা, কোন ঠাকুর বাড়ীতে গণেশ অপেরা আবার কোন বাড়ীতে কৃষ্ণ যাত্রা। গ্রাম থেকে আসা মানুষ খেয়ে দেয়ে ঝুলন দেখতে আসত। আর সঙ্গে নিয়ে আসত মুড়ি বেঁধে। ঘুরে ঘুরে শহরের ঝুলন দেখার পর যে কোন ঠাকুর বাড়ীতে যাত্রা শুনতে বসে পড়ত। ভোরবেলা যাত্রাপালা শেষ হত। এই ভাবে ঝুলনের পাঁচ দিনই তারা ঝুলনের আনন্দ উপভোগ করে বাড়ী ফিরত। কারণ তখন তাদের বাড়ী ফেরার তাগিদ থাকতো না। ঝুলনের আগেই চাষের কাজ সম্পূর্ণ করে ফেলতো। আর মনের আনন্দে ঐ পাঁচদিন ঝুলন উৎসবে অংশগ্রহণ করে কাটিয়ে দিত।

শ্রাবণ মাসের ঝুলনের পরই আশ্বিন মাসের দুর্গোৎসবে সকলে অংশ গ্রহণ করে আনন্দে কাটিয়ে দিত স্ফুর্ত্তিতে মেতে উঠত।

কৃষ্ণসায়রের উত্তর পাড়ে আড়াঘাটা এবং দক্ষিণ পাড়ে চাঁদনী ঘাট। এই দুই ঘাট থেকে শীতকালে সরস্বতী পূজোর পরের দিন অর্থাৎ প্রতিমা বিসর্জনের পর সন্ধ্যায় বর্ধমান রাজার আতসবাজি পোড়ানোর প্রতিযোগিতা হত। দুই ঘাটে দুই দল থাকত। মহারাজা পারিষদদের সাথে চাঁদনীতে বসে দুই দলের আতসবাজির প্রতিযোগিতা দেখতেন। বর্ধমানবাসীরা কৃষ্ণসায়রের চার পাশে দাঁড়িয়ে এই আতসবাজি পোড়ানোর দৃশ্য উপভোগ করত। এত জনসমাগম হতো যা অকল্পনীয় ছিল। রাজ জমিদারী বিলুপ্তির পর তা বন্ধ হয়ে গেছে।

শীতকালে শহর বাসীদের আরও বড় আকর্ষণ ছিল উইলবাড়ীর ছবি। প্রতি বছর শীতকালে সরস্বতী পূজোর দিন থেকে শিবরাত্রির আগের দিন পর্য্যন্ত প্রায় একমাস ঐ উইল বাড়ীর ছবি জনসাধারণের দেখার জন্য ব্যবস্থা করা হত।

সারা বছর গোলাপবাগের চিড়িয়াখানা খোলা থাকত। এই চিড়িয়াখানা ছিল দুর্লভ সব পশুপাখীর সমাবেশ। এখানে ছিল নানা দেশ থেকে সংগ্রহ করা বিচিত্র সব পশুপক্ষীর আবাসস্থল। এই চিড়িয়াখানায় বাঘ, ভাল্লুক, ময়ূর, হরিণ, চিতাবাঘ, নেকড়েবাঘ, কুমীর, ময়াল সাপ, সজারু, নানারকম হনুমান, এ্যন্টলার প্রভৃতি সংগৃহীত ছিল। ঐ চিড়িয়াখানার কিছু কিছু অংশ এখনও জীর্ণ অবস্থায় দণ্ডায়মান। এখানে দিলখুসা প্যালেস ছিল যার কিছু অংশ এক জলাশয়ের উপর দণ্ডায়মান গ্রীষ্মের শীতলতার জন্য। এখনও ভগ্ন অবস্থায় দৃশ্যমান।

আর একটি সুন্দর মনোরম 'মানস সরোবর' আছে যার চারিদিকে সিঁড়ি বাঁধানো। তাতে বড় বড় ঝিনুকের খোল দিয়ে ঐসব সিঁড়ির চারদিক সাজানো থাকতো। ঐ সরোবরে প্রচুর মাছও থাকত। নানা রঙবেরঙের মাছ খেলা করত জলে। পাড় থেকে মুড়ি বা খাবার কিছু দিলে মাছগুলি খেতে আসত এবং দেখতে খুব ভালো লাগতো। কিছু কিছু মাছের নাকে নোলক পড়ানো থাকতো। তবে ঐ সমস্ত মাছ ধরা নিষিদ্ধ ছিল। এখনও সরোবরটি আছে কিন্তু সেই সৌন্দর্য্য আর নেই। স্থানে স্থানে পাড়গুলি ভেঙ্গে গেছে।

এই গোলাপবাগেই ছিল ইংলন্ডের মেজ্ এর অনুকরণে নির্মিত একটি গোলক ধাঁধা। কাঁটাগাছের বেড়া দেওয়া পথ এমনভাবে ঘুরে ঘুরে গেছে যে একবার ভিতরে ঢুক্‌লে আর সহজে বেরুনো যেতো না। এতে ঢুকে কিছুক্ষণ ঘুরতে বেশ মজা লাগত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মহারাজা গোলাপবাগ চিড়িয়াখানার জন্তুগুলিকে আলিপুরের চিড়িয়াখানায় দান করেন। এই চিড়িয়াখানা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মহারাজাধিরাজ তেজচাঁদ বাহাদুর। বর্ধমান গোলাপবাগ চিড়িয়াখানার প্রতিষ্ঠার প্রায় একশত বছর পরে আলিপুরের চিড়িয়াখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। শোনা যায় মহারাজা মহাতাবচাঁদ ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক আইন সভার সভ্য হিসাবে সভায় যোগদানের জন্য যে রাহা খরচা পেয়েছিলেন; তখনকার দিনে সেই রাহা খরচার ছত্রিশ হাজার

টাকা আলিপুর চিড়িয়াখানার কর্তৃপক্ষকে দান করেন। এছাড়া প্রতি বছর পৌষসংক্রান্তি এবং উত্তরায়ণ অর্থাৎ ১লা মাঘ কাঠগোলা ঘাট এবং সদর ঘাটের ঘুড়ির মেলা হতো। এখনও ঐ মেলা হয়। তবে সেইরকম জমজমাটভাব আর দেখা যায় না।

চৈত্র সংক্রান্তির দিন বর্ধমান শহরে রাণীসায়রের পশ্চিম দিকে চড়ক অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হত এবং মেলাও বসত। এখন সব বন্ধ হয়ে গেছে। বর্ধমানের আর একটি অনুষ্ঠান হত কৃষ্ণসায়রের নিকটে ঝাপান তলায় আশ্বিন মাসের পয়লা— মনসা পূজা উপলক্ষ্যে বাঁশের মাচার উপর দাঁড়িয়ে বিষধর সাপের খেলা।

কৃষ্ণসায়রের পূর্বদিকে কামান ছিল। প্রভাত হওয়ার জানান্ হত প্রতিদিন ভোর পাঁচটায় কামানের তোপ দেগে। আর দিনের কাজ শুরু হয়ে যেতো। সব দেবালয়ের দ্বার খুলে যেত এবং দেব সেবার কাজ শুরু হয়ে যেতো। এরপর সারাদিন কর্মচাঞ্চল্যের মধ্যে কেটে সন্ধ্যা নামার সাথে সাথে সারাদিনের ক্লান্তির অবসান। আবার রাত্রি নটায় তোপধবনি হতো। দেবমন্দিরের দ্বার বন্ধ হয়ে যেত। এই তখনকার বর্ধমান শহরের জীবন যাত্রা। সারা বছর চলত এই রকম গতিময় জীবনযাত্রা। মানুষের মধ্যে আনন্দ-উচ্ছ্বাস, হাসি-হুল্লোড়, ভাব-ভালোবাসা, আদান-প্রদান সবই ছিল অকৃত্রিম। সেই সমস্ত দিন সমুদ্রের অতল জলে তলিয়ে গেছে। পড়ে আছে শুধু হিংসা, দ্বেষ, প্রতিযোগিতা, কৃত্রিমতা, সমালোচনা। কারুর মুখে একটু হাসি নেই। সবাইকার মুখই গোমড়া। আর এই গোমড়া ভাবকে কাটাবার জন্য "লাফিং ক্লাব" বা 'হাসির সংঘ' গড়ে উঠেছে। কি তাজ্জব ব্যাপার! প্রাকৃতিক হাসির আর স্থান নেই। হাসাবার জন্যেও আবার কৃত্রিমতা অবলম্বন করতে হচ্ছে। এইতো আমাদের বর্তমান প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা। যাই হোক আমি অতীতে বর্ধমান শহর কি রকম গতিশীল ছিল এবং আনন্দ মুখর ছিল যেগুলি কেন্দ্র করে বর্ধমান শহরে প্রাণ চাঞ্চল্য ছিল আমি কেবল তার মধ্য থেকে কিছু কিছু তুলে ধরেছি আমার এই "নগর বর্ধমানের দেব-দেবী"-তে। আমার লেখালিখির অভ্যাস নেই। তাছাড়া জীবনের শেষ প্রান্তে এসে নিজের বহুদিনের ইচ্ছাকে একটু প্রকাশ করেছি মাত্র। ত্রুটি বিচ্যুতি থাকবে। আমার অনুরোধ, ত্রুটি বিচ্যুতিগুলি নিজগুণে ক্ষমা করে দেবেন। আমি সামান্য কিছু এই পুস্তকে স্থান দিয়েছি। বহু প্রাচীন তথ্য এখনও অজানা। তাই যদি শরীর সুস্থ থাকে তাহলে দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করার ইচ্ছা রইল। কিন্তু সবই মঙ্গলময়ের উপর নির্ভরশীল।

গ্রন্থটি মুদ্রণের জন্য 'শিবাণী আর্ট' প্রেসের সত্ত্বাধিকারী দিলীপ মণ্ডল ও তার প্রেসের সহযোগিদের সহযোগিতার জন্যে ধন্যবাদ জানাই। দিলীপবাবু আমার গন্থ প্রকাশনার জন্য বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন। তাঁকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

আমার প্রাক্তন সহকর্মী এবং অত্যন্ত আপনজন অবসরপ্রাপ্ত শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র দাস মহাশয় এই গ্রন্থের প্রচ্ছদপট তৈরী করে এবং নানা বিষয়ে সাহায্য করায় আমি কৃতজ্ঞ।

গ্রন্থ রচনায় আমাকে বিভিন্ন বিষয়ে সাহায্য করেছে আমার স্নেহধন্যা ছাত্রী শ্রীমতি মিত্রা গাঙ্গুলী এবং সাহায্য করেছে পুত্রসম শ্রী রাজেন্দ্র মোহন ঘোষ। এছাড়াও সাহায্য করেছে শ্রী সত্যনারায়ণ দাস, শ্রী রাজেশ খান্না, শ্রী সঞ্জয় দাস ও শ্রী কার্ত্তিক দে।

এই গ্রন্থটি রচনার ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম যে আমাকে উৎসাহ দিয়েছে এবং উৎসাহিত করেছে সে হচ্ছে আমার ভাই বলুন বন্ধু বলুন আমার একমাত্র দৌহিত্র একাদশ বর্ষীয় শ্রীমান সোমনাথ সেন। শ্রীমানের সম্বন্ধে প্রশংসা করা উচিৎ নয়—তবু এটুকু না বললে ভুল হবে যে শ্রী মান অল্প বয়সে রামায়ণ মহাভারত এবং প্রাচীন দেবদেবীর কাহিনীর প্রতি যেভাবে আকৃষ্ট হয়েছে এবং উপলব্ধি করেছে তা প্রশংসনীয়।

এই সময় সাপেক্ষ কাজের জন্য সবরকম সংসারের দায় দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে এবং প্রতি পদে পদে অনুপ্রেরণা জুগিয়ে আমার এই বৃদ্ধ বয়সে কাজকে সফল করে তোলার জন্য সাধারণভাবে ঋণ স্বীকার করে আমার সহধর্মিনী শ্রীমতি সুজাতা সরকারকে ছোট করছি না। তবে এই কাজে বিশেষ আন্তরিকতা ও ত্যাগ স্বীকারের যে প্রয়োজন আছে তা বলাই বাহুল্য।

আমার পুত্র শ্রী পার্থসারথি সরকার চাকুরীতে দায়িত্ব শীল পদে অধিষ্ঠিত থেকেও আমাকে বিভিন্ন বিষয়ে সাহায্য করেছে ও উৎসাহিত করেছে।

আমার পুত্রবধূ ডঃ মঞ্জরী সরকার, আমার কন্যা শ্রীমতি সুদেষ্ণা সেন ও জামাতা শ্রী অনুপ কুমার সেন আমাকে গ্রন্থ রচনায় উৎসাহিত করেছে ও সাহায্য করেছে। এদের সকলের সাহায্য ছাড়া এই বয়সে এই কাজ করা সম্ভব হতো না।

আমি আমার "নগর বর্ধমানের দেবদেবী"-তে যে সমস্ত দেবদেবী এবং মন্দির সম্বন্ধে লিপিবদ্ধ করেছি সেগুলি বর্ধমান শহরের একটি মানচিত্র সংযোজিত করে তাতে অবস্থান নির্দেশ করার চেষ্টা করেছি। হয়ত সঠিক অবস্থান নির্দেশিত হয় নি। তবুও এর থেকে পাঠক-পাঠিকাদের ঐ সমস্ত দেব মন্দিরের অবস্থান সম্বন্ধে জানতে সাহায্য করবে।

পরিশেষে "নগর বর্ধমানের দেবদেবী"-র প্রথম খণ্ড শেষ করছি কবিগুরুর বাণীতে কবিগুরুকে স্মরণ করে—

"পুরাণো সেই দিনের কথা ভুলবি কি রে হায়
ও সেই চোখের দেখা, প্রাণের কথা, সে কি ভোলা যায়।"

'রথযাত্রা'
কোটালহাট, বর্ধমান।
২৯শে আষাঢ়, ১৪০৬ সাল।

নীরদবরণ সরকার

নিবেদন
(দ্বিতীয় সংস্করণ)

'নগর বর্ধমানের দেবদেবী'র প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল 'রথযাত্রা' ২৯শে আষাঢ় ১৪০৬ সাল ইং ১৪ই জুলাই, ১৯৯৯ সাল। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হলো মকর সংক্রান্তি, ৩০শে পৌষ ১৪০৬ সাল ঃ ইং ১৫ই জানুয়ারী, ২০০০। পরিমার্জিত এবং পরিবর্ধিত আকারে।

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের ব্যাপারে যাঁরা আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন এবং সক্রিয় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তাঁরা হলেন ভাষাবিদ রাঢ় সংস্কৃতির বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় ডঃ মিহির চৌধুরী কামিল্যা মহাশয়। তিনি এই খণ্ডের ভূমিকা লিখে দিয়ে আমাকে অনুগৃহীত করেছেন এবং যৎপরোনাস্তি উৎসাহিত করেছেন, ত্রুটি বিচ্যুতি ও সংশোধন করে দিয়েছেন। তাঁর জন্য তাঁকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

আর একজন প্রবীন শিক্ষাবিদ রামকৃষ্ণ সারদাপীঠ উচ্চ বিদ্যালয়ের অবসর প্রাপ্ত এবং জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক শ্রী বিমলাকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অকুণ্ঠ উৎসাহ আমাকে এই কাজে প্রণোদিত করেছে। আমি তাঁকেও জানাই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

প্রবীন শিক্ষাবিদ এবং রাঢ় সংস্কৃতি পরিষদের সভাপতি, শ্রীযুক্ত সুধীর চন্দ্র দাঁ মহাশয় আমাকে বিভিন্ন বিষয়ে সাহায্য করেছেন এবং উৎসাহিত করেছেন। তাঁকেও জানাই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

এছাড়াও যাঁরা পরোক্ষভাবে এই প্রচেষ্টায় আন্তরিক সহযোগিতা করেছেন তাঁদের ও সকলকে আমার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাই।

আমার শক্তি সামান্য, আশা অনন্ত। কিন্তু ভরসা আছে বাংলার পাঠক বর্গের অনুগ্রহ লাভে বঞ্চিত হবো না।

মকর সংক্রান্তি
৩০শে পৌষ, ১৪০৬ সাল
ইং ১৫ই জানুয়ারী, ২০০০

নীরদবরণ সরকার

নিবেদন

(তৃতীয় সংস্করণ)

'নগর বর্ধমানের দেব-দেবী' প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল 'রথযাত্রা' ২৯শে আষাঢ় ১৪০৬ সাল ইং ১৪ই জুলাই, ১৯৯৯ সাল। কিন্তু মাত্র ৬ মাসের মধ্যেই প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হয়। ফলে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল মকর সংক্রান্তি, ৩০শে পৌষ ১৪০৬ সাল ঃ ইং ১৫ই জানুয়ারী, ২০০০ সাল। পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত আকারে।

এরপর আমার রচিত দ্বিতীয় গ্রন্থ 'প্রাচীন বর্ধমানের সংস্কৃতি ও ধর্মীয় চেতনা' প্রকাশিত হয় 'রথযাত্রা' ১৮ই আষাঢ়, ১৪০৭ সাল, ইং ৩রা জুলাই, ২০০০ সাল। বর্ধমান রবীন্দ্র পরিষদ কর্তৃক বিজ্ঞাপিত গবেষণার গবেষণা পত্র জমা দিয়ে ২৫ বৈশাখ, ১৪০৭ সাল, কবিগুরুর জন্মদিনে পরিষদ কর্তৃক আমাকে 'সাহিত্য বিনোদ' উপাধি প্রদান করা হয়।

আমার তৃতীয় গ্রন্থ 'বিস্মৃত রাঢ়ের বিলুপ্ত কথন' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৫ই আগষ্ট ২০০১ সাল। গ্রন্থটি ২০০১ সালের 'পদ্মা-গঙ্গা পুরস্কার ভূষিত হয়েছে। ১৯শে অক্টোবর কলকাতা বাংলা একাদেমী মঞ্চে এপার বাংলা ওপার বাংলার বিখ্যাত সাহিত্যিকদের উপস্থিতিতে 'পদ্মা-গঙ্গা' পুরস্কারপ্রাপ্তি। ইতিমধ্যে আমার 'নগর বর্ধমানের দেব-দেবী'র দ্বিতীয় সংস্করণও নিঃশোষিত। তাই 'নগর বর্ধমানের দেব-দেবী'র তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হ'ল ১লা জানুয়ারী ২০০২ সাল পরিমার্জিত ও পরিবর্তিত আকারে। পাঠক-পাঠিকাদের হৃদয়গ্রাহী হওয়ার নবতম এই তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল জীবন-সায়াহ্নে। এই সময়সাপেক্ষ কাজের জন্য আমার পরিবারের সকলেই সবরকম সংসারের দায়-দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে এবং প্রতি পদে পদে অনুপ্রেরণা জুগিয়ে আমাকে সফল হতে সাহায্য করেছেন। এই দুরূহ কাজে বিশেষ আন্তরিকতা ও ত্যাগ স্বীকারের যে প্রয়োজন আছে তা বলাই বাহুল্য। এছাড়াও যাঁরা পরোক্ষভাবে এই প্রচেষ্টায় আন্তরিক সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সকলকে আমার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাই। আমার শক্তি সামান্য, কিন্তু পাঠক বর্গের কাছে যে অনুপ্রেরণা পেয়েছি আশা করি তা থেকে বঞ্চিত হবো না।

১লা জানুয়ারী, ২০০২ সাল নীরদবরণ সরকার

নিবেদন

(পরিমার্জিত ও সংযোজিত চতুর্থ সংস্করণ)

'নগর বর্ধমানের দেবদেবী' গ্রন্থটির বর্তমান সংস্করণের 'নিবেদন' জানাতে গিয়ে সর্বপ্রথমেই জানাই আমার সহৃদয় পাঠকবর্গকে অকুণ্ঠ অভিনন্দন ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। আজ চার বছরে এই চতুর্থ সংস্করণের 'নিবেদন' লিখতে বসে মনে হচ্ছে, তাঁদের অকৃপণ অনুপ্রেরণা আমাকে দিয়েছে অপরিমেয় আনন্দ।

পুস্তকটির প্রথম প্রকাশ হয়েছিল ১৯৯৯ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে; এখন ২০০৩ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশ হলো সে শুধু পাঠকদের ঐকান্তিক আগ্রহেই।

বর্তমান সংস্করণটি পরিমার্জিত ও আরও কয়েকটি দেবদেবীর কথা সংযোজিত হয়ে প্রকাশিত হলো। আশা করি এবারেও সহৃদয় পাঠকগণ-এর কাছ হতে পাব অকৃপণ সহানুভূতি।

এই সঙ্গে সহৃদয়, সত্য সন্ধিৎসু পাঠকবর্গকে জানাই আরও কয়েকটি গ্রন্থের কথা যেগুলির একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে সেগুলি হলো—'প্রাচীন বর্ধমানের সংস্কৃতি ও ধর্মীয় চেতনা', 'বিস্মৃত রাঢ়ের বিলুপ্ত কথন' ('পদ্মা-গঙ্গা' পুরস্কার প্রাপ্ত), 'সর্বব্যাপী চরাচর দেবী সর্ব্বমঙ্গলা উপাখ্যান', বর্ধমান ১০৮ শিব মন্দির, 'রাঢ় বর্ধমানের সাধক কবি কমলাকান্তের জীবনী ও পদাবলী', 'আপন অন্তর্লোকে রাঢ়ে র প্রাসঙ্গিকতা'।

এর মধ্যে 'নগর বর্ধমানের দেব-দেবী' ও 'প্রাচীন বর্ধমানের সংস্কৃতি ও ধর্মীয় চেতনা' গ্রন্থ দুটি বিদেশে সমাদৃত হয়েছে।

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যাঁদের সহযোগিতায় গ্রন্থটি এগিয়ে চলেছে যুগান্তের ঘূর্ণাবর্তে পা ফেলে তাঁদের এবং আমার সহৃদয় পাঠক বর্গকে, যাঁদের হার্দ্যিক অনুপ্রেরণাই এর উৎস, তাঁদের সকলকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা আর শুভেচ্ছা জানাই আমার একান্ত আপন শ্রী গিরিধারী সরকারকে। আর যাঁরা ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা জানিয়েছেন তাঁদের কাছেও আমি চিরকৃতজ্ঞ।

২৫শে সেপ্টেম্বর, ২০০৩
শুভ মহালয়া
৮ই আশ্বিন, ১৪১০

লেখক
নীরদবরণ সরকার

এক নজরে বর্ধমান

রাঢ়বঙ্গের মধ্যমণি সুপ্রাচীন জেলা বর্ধমান। সুপ্রাচীন সংস্কৃতি সমৃদ্ধ বর্ধমান জেলার নামকরণ সবদিক থেকে সার্থক। বর্ধমান কথাটির উৎপত্তি হল বৃধ্ ধাতুর শানচ্ প্রত্যয় থেকে। যাহা দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি প্রাপ্ত হচ্ছে। ঐতিহাসিকগণের মতে চতুর্বিংশতম জৈনতীর্থঙ্কর মহাবীর বর্ধমানের নামানুসারে এই জেলার নাম হয়েছে বর্ধমান। 'নগর বর্ধমান' বর্ধমান জেলার রাজধানী শহর। বহু প্রাচীন দর্শনীয় জিনিস বর্ধমান নগরে থরেথরে সাজানো আছে। যেগুলি দেশী-বিদেশী পর্যটকদের মুগ্ধ করবে। তাই আমি এক নজরে 'নগর বর্ধমানে'র দর্শনীয় জিনিস সম্বন্ধে পর্যটকদের কাছে তুলে ধরছি।

বর্ধমান স্টেশন থেকে বেরিয়ে সামনেই পড়বে 'পালিকা বাজার'। এখান থেকে বাঁ দিকে দক্ষিণে সোজা জি. টি. রোড ধরে কিছুটা এগিয়ে ডান দিকে পড়বে 'স্পন্দন কমপ্লেক্স'। পাশেই বর্ধমান পৌরসভার প্রধান কার্য্যালয়। বাম দিকে পড়বে গুরুদ্বার। এই গুরুদ্বার এবং ধর্মশালা স্থাপিত হয়েছিল ১৯৩৫ সালের গুরু পূর্ণিমার দিন। গুরুদ্বারটি নির্মাণ করেছিলেন একজন সিভিল সার্জেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল বাবা হরকিষণ সিং। উনি বর্ধমানের সিভিল সার্জেন ছিলেন ১৯৩০-৩৫ সাল পর্যন্ত। এটি তিনি তাঁর বাবা-মায়ের স্মৃতি রক্ষার্থে নির্মাণ করে দিয়েছিলেন।

আর একটি গুরুদ্বার শ্যামবাজারের গড়গড়ার ঘাটের কাছে অবস্থিত। এইখানে গুরু নানক ১৫১০ খৃষ্টাব্দে বর্ধমানে এসে অবস্থান করেন। এই গুরুদ্বারটির নাম গুরু নানক চরণ কমল। ১৯৯১ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর ঐখানে একটি সুন্দর গুরুদ্বার নির্মাণ করা হয়। জি.টি.রোডের গুরুদ্বারের বাঁ দিকে একটু এগিয়েই 'তিন কোনিয়া' বাসস্ট্যাণ্ড —পশ্চিমবাংলার সর্বত্র যাতায়াত ও পরিবহনের সংযোগস্থল। বাসস্ট্যাণ্ড থেকে জি. টি. রোড ধরে একটু দক্ষিণে গেলেই ডানদিকে জেলাপ্রধান ডাকঘর এবং তার দক্ষিণেই প্রোটেস্ট্যাণ্ট চার্চ। উল্টো দিকে টেলিফোন ভবন। এরই দক্ষিণে 'বিজয়তোরণ'— অতীতের 'কার্জন গেট'। ১৯০৪ খৃঃ মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ মহাতাব লর্ড কার্জনের বর্ধমান আগমন উপলক্ষ্যে 'স্টার অব ইণ্ডিয়া গেট' অর্থাৎ 'কার্জন গেট' তৈরী করেন। কার্জন গেটের রাস্তার পূর্বদিকে বাঁদিকে ঢুকেই 'বর্ধমানের নন্দন' অর্থাৎ 'সংস্কৃতি মঞ্চ'। এই অঞ্চলেই 'অফিস পাড়া' অর্থাৎ জেলাশাসকের অফিস, আদালত, জেলাপরিষদ ট্রেজারি, ব্যাঙ্ক ইত্যাদি গুরুত্ব পূর্ণ অফিস। এখান থেকে সোজা পূর্বদিকে এগিয়ে গেলে দেখতে পাবেন 'অরবিন্দ স্টেডিয়াম' এবং ডান দিকে রাস্তা ধরে একটু এগিয়ে গেলে

'বর্ধমান অরবিন্দ ভবন' ও 'পৌর উচ্চবালিকা বিদ্যালয়'। এরই পশ্চিমে বর্ধমান টাউন স্কুল এবং বংশগোপাল নন্দ প্রতিষ্ঠিত বংশগোপাল টাউন হল। জি. টি. রোডের পশ্চিমে বর্ধমান পৌর বিদ্যালয় (ছেলেদের জন্য)। এই পথ দিয়েই একটু দক্ষিণে হাঁটলেই দেখতে পাওয়া যাবে 'বীরহাটা কালী মন্দির'। এখান থেকে সোজা সদর ঘাট রোড ধরে সোজা দক্ষিণে গেলে বাঁহাতে পড়বে 'বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয়'। সদর ঘাট রোড ধরে আরও দক্ষিণে একটু এগিয়ে গিয়ে ডান হাতে পড়বে 'ওঁ ক্লীং কালীমন্দির'। এরই দক্ষিণে দামোদর নদের উপর 'কৃষক সেতু' এবং কিছুটা পূর্বদিকে গিয়ে দেখতে পাবেন 'প্রশাসনিক ভবন'—আটতলা বিশিষ্ট। এই ভবনের পাশে সোজা পশ্চিমে কিছুটা গেলে বাঁ হাতে পড়বে তেজগঞ্জের কালীবাড়ী, বাইপাস জি. টি. রোডধরে কিছুটা পশ্চিমে ভিখারী বাগানে 'বর্ধমানেশ্বর শিবলিঙ্গ'। আরও পশ্চি মে বাইপাস ধরে খানিকটা গেলে রথতলা এবং রথতলার পশ্চিমে কাঞ্চন নগরে কঙ্কালেশ্বরী কালীমাতার মন্দির। এখান থেকে ফেরার পথে রাজগঞ্জে মহন্ত অস্থলের নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের মন্দির দেখা যাবে। তারপর জি. টি. রোড বাইপাস ধরে সোজা উত্তরে গিয়ে লাকুড্ডি মহল্লায় অধিষ্ঠিতা আছেন 'দুর্লভা কালী মা'। এখান থেকে সোজা বাইপাস ধরে আরও উত্তরে গেলে বাঁদিকে সরকারী দুগ্ধ কেন্দ্র এবং টি.ভি রিলে সেন্টার। জি. টি. রোড পার হয়ে অপর পার্শ্বে তালিতগড় বা মহব্বতগড়। এরই কাছে নবাবের হাটে ১০৯টি শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মহারাণী বিষণ কুমারী দেবী। এখান থেকে সোজা জি. টি. রোড ধরে পূর্ব দিকে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে জি. টি. রোডের দক্ষিণ ভাগে 'গোলাপবাগ'। এই স্থানেই বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায়তনগুলি গড়ে উঠেছে। গোলাপবাগের পূর্বে রয়েছে একটি রমনীয় উদ্যান। এটি 'রমনার বাগান' নামে খ্যাত। বর্তমানে এটি সরকারের বনদপ্তরের হাতে আছে। এখানেই রয়েছে মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ প্রতিষ্ঠিত বিজয়ানন্দ বিহার এবং বিজয়ানন্দেশ্বর শিব। রমনার বাগানের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ 'মেঘনাদ সাহা তারামণ্ডল'। তারামণ্ডলের কাছেই গড়ে উঠেছে আধুনিক বিজ্ঞান কেন্দ্র। আনন্দবাগ ও তারাবাগে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কর্মীদের আবাসন। এই আবাসনে ঢোকার মুখেই তেজচাঁদ প্রতিষ্ঠিত বুধকালী ও নাগেশ্বর শিব। তারই সামনে বাংলার রূপকার বিধানচন্দ্র রায়ের পূর্ণাবয়ব মূর্ত্তি। পাশেই বিখ্যাত 'কৃষ্ণসায়র পরিবেশ কানন' এবং ঠিক দক্ষিণে তেজচাঁদ প্রতিষ্ঠিত 'ভূ-কালী মন্দির'। কৃষ্ণসায়র থেকে পূর্বদিকে আফতাব এ্যাভিনুউ দিয়ে কিছুটা গেলেই বাঁ দিকে পড়বে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ এবং তার ঠিক পূর্বদিকে নার্সিং ট্রেনিং সেন্টার। এ পথেই সোজা পূর্ব দিকে কিছুটা এগিয়ে গেলে পড়বে বিখ্যাত শ্যামসায়র। এর পশ্চিমে 'রাজ কলেজ' ও সদর হাসপাতাল। ঈশান কোণে

'ঈশানেশ্বর শিবমন্দির'। পাশেই 'রামকৃষ্ণ মিশন' এবং হরিসভা । এর পাশেই 'হরিসভা হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়'। এখান থেকে খোসবাগানে আছেন ফৌজদারী কালী মা এবং তারই নিকটে বিখ্যাত রানীসায়র। খোসবাগানের মোড় থেকে সোজা বি. সি. রোড ধরে পশ্চিমে একটু গেলে ডানদিকে বর্ধমান সদর থানা কার্য্যালয়। থানার অপর পাড়ে রয়েছে উদয়চাঁদ জেলা গ্রন্থাগার। থানা হতে একটু পশ্চিম দিকে এগিয়ে বাঁ দিকের বি. সি. রোড্রে উপর উড়ে কালী মন্দির ও গলিতে গেলে দেখা যাবে ১৭১৬ খৃঃ প্রতিষ্ঠিত তিনগম্বুজ বিশিষ্ট 'নুরানী মসজিদ'। এই মসজিদের সামনেই ছিল নবাবদোস্ত কায়েম লেনে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মহারাজাধিরাজ মহাতাবচাঁদের প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজ। একটু পশ্চিমে গেলেই ১৮৩২ সালে প্রতিষ্ঠিত সি. এম. এস. স্কুল। বি. সি. রোড ধরে সোজা পশ্চিমে কিছুটা গেলে চৌরাস্তার মোড়। এইটি সবর্বমঙ্গলা মোড় নামে খ্যাত। একটু বাঁ দিকে এগিয়ে গিয়ে বর্ধমানের অধিষ্ঠাত্রীদেবী 'সর্বমঙ্গলা মায়ের মন্দির'। মায়ের মন্দিরের ঠিক পূর্বে শ্রীশ্রী ধনেশ্বরী দেবীর ঠাকুর বাড়ী। পশ্চিমে মিদ্দা পুকুরের ঠিক উত্তরে নিম কাঠের তৈরী ৩০০ বছরের ভৈরবীশ্বরী কালী মা। সর্বমঙ্গলা মায়ের মন্দিরের একটু পাশেই অতীতের লোকসংস্কৃতির প্রতিষ্ঠান 'উইল বাড়ী'। বর্তমানে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের অনুমোদিত বর্ধমান হিন্দু মিলন মন্দির।

সর্বমঙ্গলা মায়ের মন্দির থেকে দক্ষিণে বাঁকানদীর পুল পেরিয়ে কিছুটা গেলে 'শিশুনিকেতন বিদ্যালয়'। আরও দক্ষিণে কিছুটা এগিয়ে খাজা আনোয়ার বেড়। এখানেই দক্ষিণা কালীর মন্দির এবং ডান দিকে বেড় হাইস্কুল। খাজা আনোয়ার বেড় নবাববাড়ীর জন্যই বিখ্যাত।

সর্বমঙ্গলা মায়ের মন্দিরের পশ্চিম দিকে শ্যাম বাজার রাস্তা ধরে পুরাতনচক্ এলাকায় রয়েছে বিখ্যাত জুম্মা মসজিদ। সম্রাট আওরঙ্গজেবের পৌত্র 'শাহাজাদা অজিম-উস-শান' এই মসজিদ নির্মাণ করেন। এখান থেকে কিছুটা এগিয়েই রয়েছে কালা মসজিদ। মসজিদের খোদিত শিলালিপি থেকে জানা যায় শের শাহের আমলে এই মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল। এর রঙ কালচে ধরণের হওয়ায় এর নাম কালা মসজিদ। পুরাতন চক্ এলাকার দক্ষিণে রয়েছে একটি সমাধি ক্ষেত্র। এর নাম পীর বহরাম। এই সমাধি ক্ষেত্রে শের আফগান ও কুতুবুদ্দিনের সমাধি আছে। রাজবাড়ীর চত্বরের মধ্যে পায়রাখানা গলিতে খক্কোর সাহেবের মাজারে হিন্দু-মুসলমান সকলেই শ্রদ্ধা জানান। জুম্মা মসজিদের পশ্চিমে মোনমোহিনী ঠাকুর বাড়ী এবং শক্তিবিবি ঠাকুর বাড়ী। এই পায়রাখানাতেই মহারাণী বালিকা বিদ্যালয়।

রাজপরিবারে আরও কয়েকটি বিগ্রহ রয়েছে প্রাচীন রাধাগঞ্জে অর্থাৎ বর্তমান নূতনগঞ্জে। এইখানে ইতালীয় স্থাপত্যে নির্মিত বর্ধমান রাজ কলিজিয়েট স্কুল। পশ্চাৎভাগে আহিরী মহল ১৩০৬ সালে মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ প্রতিষ্ঠিত বিজয়

চতুষ্পাঠী। এরই ঠিক পাশেই শ্রীশ্রী শ্যামসুন্দর জীউ ঠাকুর বাড়ী। এরই পশ্চিমে একটু গিয়ে শ্রীশ্রী রাধাবল্লভ জীউ ঠাকুর বাড়ী, অন্নপূর্ণা ও রাজ রাজেশ্বর মন্দির।

বর্ধমান শহরের আকর্ষণীয় দ্রষ্টব্যগুলির মধ্যে রাজবাড়ী হ'ল অন্যতম। দূর হতে একটি টাওয়ারের উপর স্থাপিত বড় ঘড়িটি নজরে পড়বে। এইটি রাজবাড়ীর অস্তিত্বকে ঘোষণা করছে। এই রাজবাড়ী মহারাজাধিরাজ মহাতাবচাঁদ বাহাদুর ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে নির্মাণ করেন। এটি 'মহাতাব মঞ্জিল' নামে খ্যাত। মহাতাব মঞ্জিলের পূর্বে 'মুবারক মঞ্জিল'। বর্তমানে রাজপ্রাসাদটি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়। রাজবাড়ীর দক্ষিণে সুউচ্চ তোরণ দ্বার অতিক্রম করে লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে প্রবেশ করা যাবে। পুরাতন রাজবাড়ীতেই রয়েছে উদয়চাঁদ মহিলা কলেজ।

জহুরী-পট্টী পার হয়ে মিঠাপুকুরের মোড়। মিঠাপুকুরের মোড় থেকে সোজা উত্তরে মিঠাপুকুর গলির ভিতরে রয়েছে ভূবনেশ্বরী কালী মন্দির ও সোনার কালীবাড়ী। আর একটু উত্তরে 'চৈতন্য মঠ'। চৈতন্য মঠ পেরিয়ে গলির ভিতর 'বঙ্কুবিহারী' ঠাকুর বাড়ী।

রাজপ্রাসাদের প্রবেশ পথ অর্থাৎ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশের মুখে সুউচ্চ তোরণদ্বারটিই হচ্ছে উত্তর ফটক। উত্তর ফটকের সামনে উত্তর দিকে রাস্তা ধরে একটু গেলেই শূলীপুকুর। এখানেই কোম্পানি আমলে জেলখানা ছিল। শূলীপুকুর থেকে একটু এগিয়ে গেলে আফতাব চাঁদ বাহাদুরের শ্বশুর মশাই প্রতিষ্ঠিত খান্নাজী ঠাকুর বাড়ী।

উত্তর ফটক থেকে সোজা পশ্চিমের রাস্তা ধরে গেলে বোরহাট পেরিয়ে সাধক প্রবর কমলাকান্ত প্রতিষ্ঠিত কমলাকান্ত কালী মন্দির। কালীমন্দিরের ঠিক দক্ষিণে ভারতী বালিকা বিদ্যালয়। একটু দক্ষিণে কোটালহাটে রয়েছেন 'বেলকাশের তারা মা'। কমলাকান্ত কালী মন্দিরের উত্তর দিকে একটু গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ সারদাপীঠ উচ্চ বিদ্যালয়। তারই পাশেই বর্ধমানের সাংস্কৃতিক মঞ্চ রবীন্দ্র ভবন। রবীন্দ্র ভবনের উত্তরেই 'মোহনবাগান মাঠ'। মোহন বাগান মাঠের পাশে গোকুলনাথ মন্দির এবং পাশেই বি. টি. কলেজ।

আরও অনেক জিনিস দেখার রয়েছে, যেমন সাধনপুরে রয়েছে জেলা শাসকের বাংলো। পাশেই অতীতের ডাকবাংলোটিতে গড়ে উঠেছে বর্ধমান ভবন। বর্ধমান ভবন থেকে একটু পূর্বদিকে এগিয়ে গেলেই একশত ছয় বছরের পুরাতন পশ্চিমবাংলার বিখ্যাত টেক্‌নোলজী অর্থাৎ 'মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ ইন্‌স্টিটিউট অব্ ইঞ্জিনিয়ারিং এ্যাণ্ড টেক্‌নোলজী'।

নীরদ বরণ সরকার

বর্ধমান মহন্তঅস্থল

প্রায় তিন দশক পূর্বেও বর্ধমান মহন্তঅস্থল বর্ধমানবাসীর কাছে গৌরবের স্মারক ছিল। কিন্তু সেই উজ্জ্বল নক্ষত্র এখন ক্ষীণ, ম্রিয়মান। কোনরকমে অস্তিত্বটুকু বহন করে আছে। হয়ত একদশক পরে অতীতের গৌরবোজ্জ্বল মহন্তঅস্থলের আর কোন চিহ্নই থাকবে না। কেউ জানবে না যে এখানে মহন্তঅস্থল ছিল। তার গৌরবময় অধ্যায় শেষ হয়ে যাবে। তাই আমার যতটুকু জানা আছে এবং সংগৃহীত তথ্য থেকে এই মহন্তঅস্থলের সম্বন্ধে নব বর্ধমানবাসীকে অবগত করতে প্রয়াসী হয়েছি।

প্রথমেই বলি মহন্ত শব্দের অর্থ হলো, মঠাধ্যক্ষ বা দেবমন্দিরাদির পরিচালক সন্ন্যাসী। এই বর্ধমান মহন্তঅস্থলেও বহু বড় বড় দেবাচার্য্য এই দেব মন্দির নির্মাণ করে দেবসেবা করে গেছেন। এই মঠের যাঁরা সন্ন্যাসী ছিলেন তারা যে নিম্বার্ক সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন তার প্রমাণ এখনও মন্দিরেই আছে। এ ছাড়াও আরও প্রমাণ আছে ৮ম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনী বর্ধমান, ৩রা এপ্রিল ১৯১৫ থেকে জানা যায় কাঞ্চন নগরের উত্তরে বাঁকা নদীর পর পাড়ে রাজগঞ্জের মহন্ত মহারাজের 'অস্থল' এই সন্ন্যাসীগণ নিম্বার্ক সম্প্রদায় ভুক্ত। আগেকার সেই জৌলুস শেষ হয়ে গেলেও এখন মূল মন্দিরের যেটুকু অবশিষ্ট আছে তার কারুকার্য্য এবং যে সমস্ত ভগবতের শ্লোক লেখা আছে সেখান থেকেই বোঝা যায় এই মহন্ত দেবাচার্য্যরা ভগবত প্রেমে কিরূপ মুগ্ধ ছিলেন এবং কিভাবে বহ্মচর্য্য পালন করে দেবতার মূর্তি স্থাপন করে ষোড়শোপচারে তাঁদের উপাসনা করে গেছেন। বর্ধমান মহন্তঅস্থল ছিল সে দিক থেকে গৌরবের অধিকরী।

বর্তমানে মূল মন্দিরের জীর্ণ প্রবেশদ্বারে খোদিত আছে ঃ—
"১০৮ ভগবন্মিবার্ক মহা মুনিন্দ্রায় নমঃ"। সুতরাং মহন্তরা যে নিম্বার্ক সম্প্রদায় অন্তর্গত ছিলেন তা এই লেখা থেকেই প্রমাণিত হচ্ছে। মনুষ্য দেহের প্রধান উদ্দেশ্য হল ঈশ্বরপ্রাপ্তি। পরম আচার্য্য নিম্বার্ক মহামুনির একটি শ্লোক এখানে উদ্ধৃত করছি। মহামুনি নিম্বার্ক বলেছেন ঃ—

"প্রাপ্য জন্ম যদি মানুষং নরঃ
সেবতে ন তব পাদপঙ্কজম্।
ধিক্ চ জন্ম কুলমাদিদেব তদ্
যৌবানাদি সকলং ন শোভতে।।"

ঈশ্বর প্রাপ্তি হলে চিত্তে প্রসন্নতা আসবে। মন আনন্দিত হবে এবং এর ফলে মনে এবং হৃদয়ে আসবে প্রশান্তি। আমরা সাধারণতঃ রাধা-কৃষ্ণের বিগ্রহে ভক্তি সহকারে

পূজা ও আরাধনা করে থাকি। এই মন্দিরের মূল বিগ্রহই ছিল "রাধা দামোদর জীউর বিগ্রহ।" রাধা কৃষ্ণের সেবা পূজাই নিম্বার্ক বৈষ্ণবগণ করে থাকেন। নিম্বার্কীয় বৈষ্ণবগণ শ্রীকৃষ্ণের উপাসনাকেই অধিক ফলপ্রদ বলে মনে করেন। ঐ বৈষ্ণবগণের মতে পুরুষ মূর্তির মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিই হচ্ছে প্রধান। তেমনই স্ত্রী মূর্ত্তির মধ্যে শ্রীরাধিকা মূর্ত্তিই হচ্ছে প্রধানা। আর শ্রীরাধিকাই শ্রীকৃষ্ণের সবর্বপ্রধানা শক্তি। তাই এই মহন্তঅস্থলে "রাধা দামোদর" জীউর উপাসনাই ছিল প্রধান। এছাড়া আরো দেব-দেবীর পূজা হতো। এ সম্বন্ধে আমি পরে বিস্তারিত আলোচনা করছি।

জীর্ণ দ্বার অতিক্রম করার পর মূল মন্দিরের চত্বর। দুইজন দ্বারপাল মূর্ত্তি মন্দিরের দ্বার রক্ষা করছে। ছেলেবেলায় দেখেছি ঐ পূর্ণাবয়ব দ্বার পালের মূর্ত্তি দুটি মুর্ত্তি বলে মনে হতো না। হঠাৎ চোখে পড়লেই সকলেই আঁতকে উঠত। মূর্ত্তি দুটি সিমেন্টের ঢালাই করা এবং তখন জলপাই রঙে রঙ করা ছিল। হাতে দুটি বিশাল বল্লম এবং কোমরে বেণ্টে লাগান ছিল গুপ্তি। ঠিক যেন দু-জন মানবদেহধারী দ্বারপাল প্রহরায় রত। এখন মূর্ত্তি দুটি আছে। কিন্তু সেই জীবন্ত প্রহরা-দ্বার নাই, আছে মৃতপ্রায় প্রহরা-দ্বার। এই দ্বারপাল মূর্ত্তি দুটির ঠিক নিচে মন্দিরের শ্বেত-পাথরে সংস্কৃত বর্ণমালায় খোদিত আছে একটি শ্লোক। এখনও বোঝা যাবে কি লেখা আছে। সংস্কৃতে বর্ণমালায় লিখিত শ্লোকটি হলো ঃ—

"শ্রী নিম্বার্ক মতানুগঃ সুমতিমান্ গৌড়াচার্য্য বিপ্রাগজী—
নাম্মা শ্রী মধুসূদনতে বিদিতৌ বেদান্ত শাস্ত্রান্তগঃ।।
তেন রচিত সুচারু গঠনে দেবালয়ং সুন্দরং।
শাকে সাগড় রাম কুঞ্জ রঘুকামাঘে অভ্র শুক্রে রবৌ।।"

শ্রী নিম্বার্ক মতাবলম্বী সুমতিযুক্ত গৌড় দেশীয় আচার্য্য ও বিপ্রশ্রেষ্ঠ শ্রী মধুসূদন নামে, পণ্ডিতের নিকট হইতে বেদান্ত শাস্ত্র যিনি বিদিত হয়েছেন, তাঁর দ্বারা সুন্দর রচিত এই মন্দির রঘুনাথের তুষ্টির জন্য শুক্ল-পক্ষের রবিবারে নির্মিত হইয়াছে। এ থেকে বুঝতে পারা যাচ্ছে শ্রী মধুসূদন শরণ দেবাচার্য্য গোস্বামীজী এই সুন্দর মন্দির নির্মাণ করেছেন। অর্থাৎ আগেকার ছোট মন্দির নিজের মনোমত করে সবর্বসাধারণের দেবসেবার জন্য এবং দর্শনের জন্য সুন্দররূপে নানা অলংকারে ভূষিত করে নির্মাণ করেছিলেন। এর থেকেই প্রমাণ পাওয়া যায় তিনি বেদান্ত শাস্ত্রে কত জ্ঞান অর্জন করেছিলেন এবং তাঁর শিল্প কলার উপর কত দৃষ্টি ছিল। এই মধুসূদন শরন দেবাচার্য্য এই মহন্তঅস্থলের নবম মহন্ত দেবাচার্য্য ছিলেন। এরও প্রমাণ পাওয়া যায় এই মন্দিরেরই একাধারে শ্বেতপাথরে সংস্কৃত বর্ণমালায় খোদিত আছে নিচের শিলালিপিটি ঃ—

অথ বর্ধমানস্য পীঠাধিকৃত প্রাতঃস্মর কার্য্যে পূজ্যপাদোং পবিত্র নামাবলী।

১। শ্রী নরহরি দেবাচার্য্য

২। শ্রী শুকদেব দেবাচার্য্য

৩। শ্রী গোপাল দেবাচার্য্য
৪। শ্রী বসন্ত দেবাচার্য্য
৫। শ্রী উদ্ধব দেবাচার্য্য
৬। শ্রী পুরুষোত্তম দেবাচার্য্য
৭। শ্রী গোপাল শরণ দেবাচার্য্য
৮। শ্রী গিরিধারী শরণ দেবাচার্য্য

শ্রী মধুসূদন শরণ দেবাচার্য্য
বর্ধমান

সুতরাং এখান থেকেও প্রমাণিত হচ্ছে শ্রী মধুসূদন শরণ দেবাচার্য্য এই মন্দির উত্তমরূপে নির্মাণ করে তাঁর পূর্বসুরীদের নাম খোদাই করে গেছেন। উনিই বর্ধমান মহন্তঅস্থলের নবম পীঠাধীশ। শ্রী মধুসূদন শরণ দেবমহান্ত মহারাজ তখনকার দিনে দুইলক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে নুতন মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং যখন ৮ম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনী হয় অর্থাৎ ১৯১৫ সালের ৩রা এপ্রিল মাসে গোলাপবাগে, তখন বর্ধমানের মহান্ত মহারাজ ছিলেন শ্রী মধুসূদন শরণ দেব মহান্ত মহারাজ। তিনি এই সম্মিলনীতে সর্বোচ্চ ৩০০ টাকা চাঁদা দিয়েছিলেন (ঞ পরিশিষ্ট ৮ম সম্মেলন) এবং ঐ সম্মেলনে তিনি অভ্যর্থনা সমিতির সদস্য ছিলেন। (ঘ পরিশিষ্ট) এর থেকেও প্রমাণ পাওয়া যায় তিনি সাহিত্য সম্বন্ধে অনুরাগী ছিলেন।

এর পর মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করলে যারা অতীতের মহন্তঅস্থলের রমরমা অবস্থা দেখেছেন তাঁদের শুধুই মনে হবে "স্মৃতি শুধু বেদনা।" তবুও যতটুকু অস্তিত্ব আছে তার থেকে এখনও কিছু কিছু ভগবতের শ্লোক যেটুকু মন্দিরের ভেতরে খোদিত আছে তার থেকে আমি কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করছি।

"নবীন নীরদ শ্যামং নীলেন্দ্রীবর লোচনম্।
বল্লবী নন্দনং বন্দে কৃষ্ণ গোপাল রুপিনম।।"

নবীন শ্যামল মেঘের ন্যায় যার বর্ণ, নীল পদ্মের ন্যায় যার লোচন এই বল্লবী পুত্র গোপালরূপী কৃষ্ণকে প্রণাম করি।

দ্বিতীয় শ্লোকটি ঃ "শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণী কান্ত গোপীজন মনোহর।
সংসারে সাগরে মগ্নং দীনং মামাত্মসাৎ কুরু।।"

হে গোপীজনের মোনোহর রূপী, রুক্মিণী কান্ত, শ্রীকৃষ্ণ তুমি সংসার সাগরে নিমগ্ন, দীন আমাকে আত্মসাৎ কর।

পরের শ্লোকটি ঃ "সনকাদীন্ সদা বন্দে ব্রহ্ম বিদ্যা বিশারদান্।
যেষাম ভ্রুভঙ্গ মাত্রেন প্রেততু বিষ্ণু পার্ষদৌ।।"

অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা বিশারদ সনকাদি ভক্তদের প্রণাম করি, যাঁহাদের দৃষ্টি নিক্ষেপ মাত্র

বিষ্ণু পার্ষদ রূপে পরিণত হওয়া যায়। আর একটি শ্লোক উদ্ধৃত করছি কারণ শ্লোকগুলি খুবই মূল্যবান এবং সুন্দর ঃ—

"ভক্তিজ্ঞান বিরাগান্ য কলিনা জজ্জরী কৃতান।

তারুণ্যং প্রাপয়া মাস ৩ং শ্রী নারদমাশ্রয়ে ।।"

ভক্তিজ্ঞান বিরহী ও কলির প্রভাবে জজ্জরীকৃত যিনি, তিনি ভক্ত নারদকে আশ্রয় করে তারুণ্য লাভ করেন। আর একটি ভারি সুন্দর শ্লোক লেখা আছে যেটি হচ্ছে ঃ-

"অহং ভীতোহস্মি দেবেশ সংসারে স্মিন্ ভয়াভয়ে।

পাহিমাং পুণ্ডরীকাক্ষ ন জানে শরণং প্রপদ্ধে ।।"

হে দেবেশ এই ভয়ভীতি পূর্ণ সংসারে আমি অত্যন্ত ভীত হইতেছি। হে পুণ্ডরীকাক্ষ! আমাকে রক্ষা কর। আমি তোমার শরণ লইলাম।

উপরোক্ত শ্লোকগুলি থেকে প্রমাণিত হচ্ছে শ্রী মধুসূদন শরণ দেবাচার্য্য গোস্বামী ভগবৎ সম্বন্ধে কি গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন যে তিনি বেছে বেছে ঐ সুন্দর শ্লোকগুলি সবর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য মন্দির গাত্রে খোদিত করেছিলেন। এই কথাই ভেবেছিলেন, যাঁরা অন্ততঃ বিগ্রহ পূজায় বিশ্বাসী, দেবতার প্রতি যাদের ভক্তি আছে তাঁরা অন্ততঃ এই মন্দিরে এই শ্লোকগুলি পড়ে এর অর্থ উপলব্ধি করে অন্ততঃ কিছুক্ষণ এই শান্ত পরিবেশে মনকে শান্তি দিতে পারবেন।

এ ছাড়াও দশ অবতারের অর্থাৎ মৎস্য, কুর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও কল্কি অবতারের মূর্ত্তি মন্দিরের ভেতরে খোদাই করা আছে। এই বিশাল মন্দিরের ভিতরে আমরা দেখেছি ঠিক মাঝখানে রূপোর সিংহাসনে শ্রীশ্রীরাধা দামোদর জীউর অষ্টধাতুর মূর্ত্তি ছিল। এখন সেই মুর্ত্তি নেই। রাধা দামোদর জীউর ডান পার্শ্বে ছিল শ্রী হংস ভগবান, নিবাসাচার্য্য, নিম্বার্কাচার্য্য, গড়ুর ভগবান। রাধা দামোদর জীউর বাম দিকে ছিল শ্রীশ্রী রঘুনাথ জীউ, লক্ষণ ও সীতাদেবী, এবং মহাবীর হনুমাজীর এই মূর্ত্তিগুলি শ্বেত পাথরের। এখন জরাজীর্ণ অবস্থায় হংস ভগবান, নিবাসাচার্য্য, নিম্বার্কাচার্য্য এবং গরুড় ভগাবানের মূর্ত্তি মলিন অবস্থায় কোনরকমে রক্ষিত আছে। বামে মহাবীর হনুমানজীর ও জীর্ণ মলিন শ্বেত পাথরের মূর্ত্তি আছে। আর মন্দিরের ভিতরে ঢুকে ঠিক ডান দিকে আছে শ্বেত পাথরের মধুসূদন দেবাচার্য্যের মূর্ত্তি। ইনিই যে এই বিশাল মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা এবং রূপকার তা বুঝতে ভুল হবে না। তার কারণ ঐ মূর্ত্তির নিচে পাথরে খোদিত আছে বর্ধমান পীঠাধিশ বেদান্তাচার্য্য স্বর্গীয় মধুসূদন শরণ দেবাচার্য্য গোস্বামীজী। এ ছাড়াও দশভূজা সিদ্ধিদাতা গণেশ মূর্ত্তি আছে। কিন্তু সিদ্ধি দাতার অবস্থা আরও খারাপ। একটি কুলুঙ্গিতে রক্ষিত আছে এবং জল ঝড় তার মাথার উপর দিয়ে বহে যাচ্ছে এবং ধূলায় বিকৃত অবস্থায় স্থিত আছে। মন্দিরের চূড়োয় ছিল শিল্পীর কারুকার্য্য খচিত সুন্দর সোনার কলস। একেবারে উপরে ছিল আবহাওয়া নির্দেশক যন্ত্র। এই যন্ত্রে বাতাসের গতিবেগ কোন দিকে তা বোঝা যেত। একটি রূপার পাতের তৈরী ধ্বজা

ছিল। এই সব দেখে মনে হয় বেদান্তচার্য্য কি লক্ষ্য নিয়ে এই সুরম্য দেবালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং এখন কি হাল তার হয়েছে। মনে হবে দেবাচার্য্যের পাথরের মূর্ত্তি থেকে একটা চাপা আর্ত কণ্ঠস্বর ভেসে আসছেঃ "তফাৎ যাও সব ঝুট্ হ্যায়।"

বর্ধমান মহন্তঅস্থলের অবস্থান বলার এখন আর প্রয়োজন হবে না। বহু বৎসর আগে থেকেই সে নিজেই নিজের আলোকে ভাস্বর হয়ে আছে। বর্তমানে তার জ্যোতি ম্রিয়মান হলেও নিজের পরিচয়েই পরিচিত। বর্ধমান শহরের একবারে পশ্চি ম প্রান্তে বাঁকা নদীর ধারে এখনও শেষ চিহ্নটুকু নিয়ে বিরাজমান।

যেহেতু নিম্বার্ক সম্প্রয়াদের নিয়মকানুন বৈদিক রীতি অনুসারে চলে তাই এখানে গুরু পরম্পরায় মহন্ত নির্বাচিত হতো। এঁদের মতে ঈশ্বরই হচ্ছেন আদিগুরু এবং আদিগুরু ঈশ্বর হইতেই গুরু পরম্পরা ধারা চলে আসছে। এই ভাবেই বর্ধমান মহন্তঅস্থলের প্রতিষ্ঠা করেন শ্রী নরহরি দেবাচার্য্য। মন্দিরের ফলকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। অর্থাৎ বর্ধমান মহন্তঅস্থলের প্রথম পীঠাধীশ হলেন শ্রী নরহরি দেবাচার্য্য। এই ভাবে দ্বিতীয় মহন্ত হলেন শুকদেব দেবাচার্য্য, তৃতীয় গোপাল দেবাচার্য্য, চতুর্থ বসন্ত দেবাচার্য্য, পঞ্চম উদ্ধব দেবাচার্য্য, ষষ্ঠ পুরুষোত্তম দেবাচার্য্য, সপ্তম গোপাল শরণ দেবাচার্য্য, অষ্টম গিরিধারীশরণ দেবাচার্য্য, নবম শ্রী মধুসূদন শরণ দেবাচার্য্য। এঁনারই আমলে মহন্তঅস্থল স্বর্ণ শিখরে উন্নীত হয়েছিল। তারপর দশম মহন্ত হলেন মনোহর দাস মহন্ত এবং একাদশ মহন্ত সবের্বশ্বর শরণ দেবাচার্য্য। এঁর মৃত্যুর পর থেকেই মহন্তঅস্থল ধ্বংস হয়ে যায় এবং মহন্তঅস্থলের অধ্যায় শেষ।

"রাজগঞ্জ নামক স্থানে যে প্রসিদ্ধ রঘুনাথ জীউ বিগ্রহ এবং মহন্ত অস্থল অবস্থিত, কীর্তিচাঁদই তার স্থাপয়িতা। কথিত আছে, যখন কীর্তিচাঁদ বিষ্ণুপুরাধিপতির সহিত সংগ্রামর্থে গমন করেন কাঞ্চননগরস্থিত বারদ্বারী নামক আম্রকাননে। এক জন সন্ন্যাসী, উক্ত বিগ্রহটী লইয়া অবস্থান করিতেছিলেন। কীর্তিচাঁদ তথায় গমন করতঃ, ভক্তি সহকারে, রঘুনাথজীউ ও সন্ন্যাসীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলে সন্ন্যাসী তাঁহাকে কহিলেন, আপনি যে সংগ্রামার্থে গমন করিতেছেন, তাহাতে নিশ্চয় জয়লাভ করিবেন। কীর্তিচাঁদ কহিলেন : প্রভো! যদি আমি এই যুদ্ধে জয় লাভ করি, তাহা হইলে এখানে প্রত্যাগমন করিয়াই, আমি আপনার রঘুনাথজীউ ও সাধু সন্ন্যাসীদের সেবার্থে যথোপযুক্ত সম্পত্তি প্রদান করিব। দৈবানুগ্রহে তিনি যুদ্ধে জয় লাভ করিলেন ; এবং বর্ধমানে প্রত্যাগমন করিয়াই, রাজগঞ্জে উক্ত দেবতার জন্য একটি উৎকৃষ্ট বাটী প্রস্তুত করাইয়া দিলেন এবং দেবতা ও অতিথিদিগের সেবার্থে কয়েকটি নিষ্কর মহল ও দেবত্র ভূমি প্রদান করিলেন। উক্ত মোহান্তের আশ্রমে যে নিত্য শত শত সাধু সন্ন্যাসী প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া পরিতৃপ্ত হইত, তাহাও কীর্তিচাঁদের একটি অতুল কীর্তি।"

রাজবংশানুচরিত ঃ—রাখালদাস মুখোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা - ৩১

অস্থিক গ্রামের অবস্থিতি সম্পর্কে মত পার্থক্য আছে। কেউ কেউ অনুমান করেন যে, অস্থল—বর্ধমানই প্রাচীন অস্থিক গ্রাম এবং তাই শহর বর্ধমানের মহন্তঅস্থল এলাকায় এই অস্থিক গ্রাম। আবার অনেকে শুলপানি যক্ষ ও অস্থিক গ্রামের সঙ্গে মহাবীর সম্পর্কিত পুরাণ কাহিনী অবলম্বন করে অট্ঠিয় গ্রামকে

বর্ধমান রূপে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। ডঃ বিমলাচরণ লাহা কল্পসূত্রের টীকায় উল্লেখ করে অস্থিক গ্রামকে বর্ধমান নির্দেশ করে ও হাথিগাঁও এর অনুকুলে হওয়ার সম্ভাবনাকেও স্থান দিয়েছেন। কিন্তু হাথিগাঁও এর অবস্থিতি হল বাগমতী নদীর তীরে। পাবা থেকে বৈশাখী যাওয়ার পথে বাগমতী অতিক্রম করার প্রশ্ন আসে না। বর্ধমান শহর মধ্যস্থ রাজগঞ্জ অস্থল অট্‌ঠিয় গ্রাম নির্দেশ অত্যন্ত অবিবেচনা প্রসূত মন্তব্য, কারণ অস্থল ও অস্থিক গ্রামের তুলনা মূলক আলোচনা করলে দেখা যায় যে, অস্থল হল কোন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মঠ বা আখড়া। বর্ধমানের রাজগঞ্জে অবস্থিত নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের অস্থলটি সপ্তদশ শতকের শেষভাগে নরহরিদেব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পুণমচন্দ বৃদ্ধি চন্দ ঢঢ্‌টা কৃত কল্পসূত্রে হিন্দী অনুবাদ গ্রন্থে আছে "অট্‌ঠিয় গ্রাম—বর্ধমান বংগাল মৈঁ হৈ।" (বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী) পাঞ্জাবের খাড়া নামক স্থান হতে সিদ্ধ পুরুষ নরহরিদেব দামোদর জীউ শিলা বিগ্রহ সহ বাঁকা নদীর তীরে এই অস্থলের ভিত্তি স্থাপন করেন। বাঁকা নদীর তীরে বকুল গাছের তলায় ছিল "দাউজী মন্দির" এবং এখানেই শ্বেত পাথরের প্রমাণ সাইজের অপূর্ব রাধা কৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি ছিল। এই দাউজী মন্দিরই প্রতিষ্ঠা করেন নরহরি দেবাচার্য্য।

মূল মন্দিরের চারিপাশে মন্দির পরিক্রমার জন্য সরু পথ আছে। ভক্তরা ঐ পথেই মন্দির পরিক্রমা করত। এখন ঐ পথ বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। ঢোকা প্রায় অসম্ভব। মন্দিরের ডান পাশে চারিধার বেষ্টিত একতলা প্রাসাদ। চারিদিকে বারান্দা পরিবেষ্টিত। এইটি ছিল পাক শালা বা রান্নাঘর। প্রতিদিন ২০০ কর্মচারী সমেত বহু ভক্ত অন্ন গ্রহণ করত। যত ভক্ত এবং অতিথি আসত কেউ অভুক্ত অবস্থায় ফিরে যেত না। এই পাকশালার পিছনে দোতলা প্রাসাদ এর নিচের তলায় ছিল ভাণ্ডার ঘর। অর্থাৎ এখানে খাবারের জিনিস মজুত থাকত এবং দোতলায় ছিল বালাখানা। এটি খুবই সুদৃশ্য ছিল। এখানেই মোহন্তদের উপাসনার জন্যে আহ্নিক ঘর ছিল। এখানেই মহন্ত শিষ্য পরিবেষ্টিত হয়ে ত্রিসন্ধ্যা আহ্নিক করতেন। মূল মন্দিরের সামনে ছিল ঝুলন মন্দির। মন্দিরের পাশে ছিল গো-শালা। কত বিভিন্ন জাতের গরু ছিল তা বলার কথা নয়। পাশে ধর্মশালা ছিল এবং শিষ্যদের পড়াশুনার জন্য 'টোল' ছিল। এই টোলে বেদান্ত বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হতো। এই টোলটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মধুসূদন শরণ দেবাচার্য্য। ইহাই মধুসূদন চতুষ্পাঠী নামে খ্যাত। বিশাল ফাঁকা জায়গা ছিল। এই ফাঁকা জায়গাতেই বড় বড় অনুষ্ঠান হতো। চব্বিশ প্রহরার জন্য নাটমন্দির ছিল।

খুব ধুমধাম করে গোষ্ঠাষ্টমী উৎসব হতো। আর ফাঁকা জায়গায় বিশাল বিশাল গরুদের সাজান হতো এবং তাদের পূজা করা হতো। এমন কি কলার কাঁদি সমেত কলা গাছ দিয়ে সাজান হতো। সন্ধ্যায় নানা রকম অনুষ্ঠান হতো। এই অনুষ্ঠানে প্রচুর জন সমাগম হতো। কচুরী, মালপো, ক্ষীর প্রভৃতি জনসাধারণকে বিতরণ করা হতো।

রাম নবমীতে তিন দিন চব্বিশ প্রহর উৎসব হতো। নানান জায়গার বহু খ্যাত-নামা কীর্ত্তনীয়া কীর্ত্তন করতেন, খ্যাতনামা ব্যক্তিত্ব ভাগবৎ পাঠ করতেন, হরিনামের দল আসতো এবং নাম গান করত। কি জম-জমাট ছিল! কত লোক যে এই উৎসবে অংশ গ্রহণ করত তা বলাই বাহুল্য। বহু খ্যাতনামা ব্যক্তিত্বের দর্শন পাওয়া যেত। আমরা এই সব অনুষ্ঠান দেখার জন্য অতি আগ্রহে অপেক্ষা করতাম। এই অনুষ্ঠান দেখার জন্য কোন দর্শনী দিতে হতো না। সকলের জন্যই উন্মুক্ত ছিল। এর ফলে বর্ধমানবাসীরা বহু খ্যাতনামা ব্যক্তিত্বের দর্শন লাভের সুযোগ পেত।

তবে সবচেয়ে বড় উৎসব ছিল রাধাদামোদর জীউ'র ঝুলন উৎসব। আমার তো মনে হয় সারা পশ্চিম বাংলার মধ্যে মহন্তঅস্থলের ঝুলন ছিল বিখ্যাত। তখন এই মহন্তঅস্থলের ঝুলন উৎসবে প্রত্যেকের বাড়িতে দূর-দূরান্ত থেকে আত্মীয়-স্বজনেরা আসত ঝুলন উৎসব দেখার জন্য। শ্রাবণ মাসের একাদশী তিথি থেকে পূর্ণিমা তিথি পর্যন্ত এই উৎসব চলত। তবে এই উপলক্ষ্যে যে বিশাল মেলা বসত তা একাদশীর আগে থেকে পূর্ণিমার পর পর্যন্ত এই মেলা চলত। এই মেলায় নাগরদোলা থেকে আরম্ভ করে, সার্কাস, ম্যাজিক, তারপর তো বহু জিনিসের দোকান-পসরা ছিল। মনে হতো যেন ঐ পাঁচদিন যত মানুষ সব এই মহন্তঅস্থলে জমায়েত হয়েছে। মানুষের ঢল নামতো। বৈকাল থেকে ভোর পর্যন্ত মানুষের ভিড় সমানে চলত। সারারাত মানুষের কোলাহল। মনে হতো এ যেন এক আনন্দ নগরী। তারপর তো কলকাতার বিখ্যাত যাত্রাদলের আসর বসত। নট্টকোম্পানী থেকে আরম্ভ করে প্রায় সমস্ত নামী যাত্রা দলের যাত্রা দেখার সুযোগ বর্ধমানবাসীরা পেত। তখন একমাত্র কলকাতা যাত্রা দলের যাত্রা এই মহন্তঅস্থলেই হতো এবং সকলের জন্যই উন্মুক্ত প্রায় সমস্ত নামী যাত্রাদলের যাত্রা দেখার সুযোগ বর্ধমানবাসীরা পেত। তখন একমাত্র কলকাতা যাত্রাদলের যাত্রা এই মহন্ত অস্থলেই হতো এবং সকলের জন্যই উন্মুক্ত ছিল। দর্শনীর কোন ব্যাপারই ছিল না। ঐ ক-দিন যেন বর্ধমানবাসীরা হাতে চাঁদ পেত। তারপর মূল মন্দিরের সমস্ত বিগ্রহ ঝুলন মন্দিরে নিয়ে এসে এমন ভাবে সাজান হতো যে, তার শিল্পকলাই ছিল আলাদা। বিভিন্ন বিগ্রহে প্রায় ৫০ কেজি সোনার গহনা দিয়ে সাজান হতো। রূপার সাজ সরঞ্জাম যে কত ছিল তা বলা যাবে না। মন্দিরের মাঝখানে চিক্ দিয়ে আলাদা করা হতো পুরুষ ও মহিলা দর্শকদের পৃথকভাবে দর্শনের জন্য। তখনকার দিনে এইটাই সামাজিক রীতি-নীতি ছিল। এ ছাড়াও দোলউৎসব থেকে শুরু করে বৈষ্ণব ধর্মের সমস্ত উৎসবই এখানে অনুষ্ঠিত হতো। এখন 'সে রামও নাই আর সে অযোধ্যাও নাই'। মহন্তঅস্থল আজ অস্তমিত সূর্য্য। তবু আনন্দের কথা এই যে উদিত সূর্য্য হিসাবে দেখা দিয়েছে ১৯৭৮ সালে ৫ই আগষ্ট বর্ধমান হোমিওপ্যাথি মেডিকল কলেজ ও হাসপাতাল। এরই পাশাপাশি অতীতের সেই ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত দেবশালাকে বাঁচানোর চেষ্টা বর্ধমানের প্রতিটি নাগরিকের করা উচিত।

বর্ধমানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সর্ব্বমঙ্গলা

বর্ধমানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সবর্বমঙ্গলার মন্দির বর্ধমান শহরের ঠিক কেন্দ্র স্থলে শ্যাম বাজারের পূর্ব্বে অবস্থিত। যদিও দেবী মন্দিরের অবস্থান শুধু শহরবাসী কেন অনেকেরই জানা আছে, তবুও এইটুকু বলা যায় বর্ধমান শহরের বিজয়তোরণের সোজা বিজয়চাঁদ রোড ধরে পশ্চিমে খানিক দূর এলেই একটি চৌরাস্তার মোড়। এটি রাধানগরের মোড় নামে খ্যাত। ঐ মোড় ছাড়িয়ে সোজা পশ্চিমে খানিকটা গেলে আর একটি চৌরাস্তার মোড় পাওয়া যাবে। ঐ চৌমাথাটি সর্ব্বমঙ্গলা বাড়ির মোড় নামে পরিচিত। ডান দিকে হাসপাতাল যাবার রাস্তা এবং বাঁদিকে একটু এগিয়ে গেলেই মায়ের মন্দির। আর একটি রাস্তা বীরহাটার জি. টি. রোড্ থেকে সোজা পশ্চি মে তেল মারুই রোড্ হয়ে একবারে মায়ের মন্দিরের সামনে মিশেছে। বর্ধমানের নগরাধিষ্ঠাত্রী দেবী যিনি, তিনি সুপ্রাচীন দেবীমূর্ত্তি। কবে বা কে এই দেবী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, এর আদি পূজা বেদী কোথায় ছিল তার ইতিহাস মহাকালিকা আপনার অঙ্গে সংহত করে নিয়েছেন মায়ের মন্দির বেশ প্রাচীন। ৬ষ্ঠ শতকের অনুলিখিত কুব্জিকা তন্ত্র গ্রন্থে শ্রী বর্ধমান মঙ্গলাদেবীর পীঠের উল্লেখ আছে। পরবর্তীকালে, আদি চণ্ডীমঙ্গল রচনাকার মানিক দত্ত এই নূতন বর্ধমানকেই দেবী পীঠ 'বড় বর্ধমান' বলেছেন। আরো জানা যায় বর্ধমান নগরদেবী সর্ব্বমঙ্গলা ও কাঞ্চননগরের কঙ্কালেশ্বরীর প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। এ ছাড়া ও রামানন্দ যতির চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে, মানিক গাঙ্গুলীর ধর্মমঙ্গল ও ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাব্যে সর্ব্বমঙ্গলা দেবীর উল্লেখ আছে। মন্দির প্রাঙ্গণে আটচালা শিব মন্দির দুটি রাজা চিত্রসেনের আমলে এবং রাজা তেজচাঁদের আমলে তিনটি শিব মন্দির নির্মিত হয়েছিল। যে কারণে অনুমান করা যায় যে, চিত্রসেনের পূর্বে তাঁর পিতা কীর্ত্তিচাঁদ রায় এই নবরত্ন মন্দির নির্মাণ করেছিলেন।

দেবী সর্ব্বমঙ্গলা সম্বন্ধে এক প্রাচীন কাহিনী শোনা যায়। বর্ধমানের বাহির সর্ব্বমঙ্গলা তখন ধানক্ষেত ছিল এবং জলা জায়গা ছিল। এখানে অনেক পুকুর ও ছিল। ওখানে বেশীর ভাগ বর্গক্ষত্রীয়দের বাস ছিল। ওরা ঐ জলা ও পুকুর থেকে ছোট ছোট ছাক্নী জাল দিয়ে জিওল মাছ, গুগলী, শামুক, কাঁকড়া প্রভৃতি ধরতো। একদিন একজনের জালে একটি শিলার মত পাথর পাওয়া যায়। তারপর ওরা ঐ পাথরের উপর গুগলী, শামুক থেঁতো করতে থাকে। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা, প্রতিদিনের

তখন ঐ সব জলজ প্রাণীর দেহাবশেষ পুড়িয়ে চুন উৎপন্ন হতো। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা উক্ত গুগলী, শামুকের সহিত দেবীমূর্ত্তিও অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হন। কিন্তু আগুনেও ঐ শিলার কোনরূপ বিকৃতি হয় নাই। সেই রাত্রেই বর্ধমানের মহারাজা স্বপ্নাদিষ্ট হন। স্বপ্নে রাজা আদেশ পান দেবী সবর্বমঙ্গলার কাছে, আমি দামোদরের তীরে চুনের ভাটায় শিলারূপে আছি, আমায় তুমি উদ্ধার করে, রাজবাড়ীর পাশে মন্দির তৈরী করে, প্রতিষ্ঠা করে, আমায় পূজা করো। ভোর না হতেই মহারাজা ঐ চুন ভাটায় যান। গিয়ে জানতে পারেন, তিন ব্রাহ্মণ ঐ শিলাটি পূজা করার জন্য নিয়ে গেছেন। ঐ খবর জানা মাত্রই রাজা ঐ ব্রাহ্মণদের সন্ধানে গিয়ে তাঁদের সাথে দেখা করে মায়ের ঐ আদেশের কথা শোনান। কিন্তু ব্রাহ্মণগণ দেবী বিগ্রহকে রাজার নিকট দিতে অস্বীকার করেন। মহারাজা অনেক অনুরোধ করলেও ব্রাহ্মণগণ দেবী বিগ্রহ রাজাকে দিতে সম্মত হন না। তখন রাজা প্রস্তাব করেন দেবীর অধিকারী ব্রাহ্মণগণই হবেন। মহারাজা শুধু পূজার ব্যয় নির্বাহ করবেন। সেই ব্যবস্থা অনুসারে আনুমানিক তিনশ বছর পূর্বে বর্তমান বর্ধমানের পূর্ব দক্ষিণ অংশে শ্রীশ্রী সর্বমঙ্গলা মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে আজ অবধি পূজা পেয়ে আসছেন এবং বর্ধমানরাজ ও সেই প্রাচীন ব্যবস্থানুযায়ী দেবীর যাবতীয় নিত্য ও নৈমিত্তিক পূজার ব্যয় বহন করে আসছিলেন। সেই মত মহারাজা রাজবাড়ীর কাছে মন্দির নির্মাণ করে দেবীর শিলামূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এই তিন জন ব্রাহ্মণই ছিলেন বেগুট গ্রামের। একবার শোনা গেল কালাপাহাড় আসছে মন্দির ধ্বংস করতে। এই সংবাদ শুনেই মায়ের মন্দিরে তালা লাগিয়ে ঐ তিন ব্রাহ্মণ পালিয়ে যান। দেবীর বহু দিন পূজা হচ্ছে না। তখন মহারাজা বাঁকা নদীর সংলগ্ন এক তান্ত্রিক সাধককে পূজা করার জন্য নিয়ে আসেন। কিছু দিন পূজা করার পর সাধক আর পূজার ভার নিতে ইচ্ছুক হলেন না। তখন ঐ সাধক বর্ধমানের নিকটবর্তী রায়ান গ্রামের ব্রাহ্মণদের সাথে মহারাজের পরিচয় করিয়ে দেন। রায়ান গ্রামের ব্রাহ্মণেরাই পূজার ভার নেয়। এরপর সেই আগেকার তিন ব্রাহ্মণ এসে ঐ রায়ানের ব্রাহ্মণদের চলে যেতে বলেন। তখন মহারাজা বেগুট এবং রায়ান উভয় গ্রামের ব্রাহ্মণদের পালাক্রমে পূজা করার ব্যবস্থা করে দেন। এইভাবেই ঐ দুই-গ্রামের ব্রাহ্মণেরাই পালাক্রমে পূজা করছেন। সর্ব্বমঙ্গলা দেবীর জনশ্রুতি যা হোক না কেন সর্ব্বমঙ্গলা দেবী বর্ধমান শহরে কয়েকশ বছর ধরে অধিষ্ঠিতা আছেন। বর্ধমানের রাজারা দেবীকে প্রতিষ্ঠা করেন নাই, তাঁরা বর্তমান মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন মাত্র। সর্ব্বমঙ্গলার প্রাচীনত্বের নিদর্শন পাওয়া যায় রূপরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গলে।

"বর্ধমানে বন্দোদেবী সর্ব্বমঙ্গলা।
অধিষ্ঠান হন দেবী ঠিক দুপুর বেলা।।"

মন্দিরের পূর্বদিকে সদর বা প্রবেশ দ্বার। বিরাট দরজা লাগান প্রবেশ দ্বার। প্রবেশদ্বার সংলগ্ন দোতলা প্রাসাদ আছে। এগুলি ছিল অতিথিশালা, কর্মচারীদের থাকার ঘর এবং পূজারীদের থাকার ঘর। এখন এখানে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পোষ্ট অফিস এবং সংগীত বিদ্যালয় হয়েছে। প্রবেশ পথের দুই পাশেই ভিখারীদের ভীড়। বর্তমানে দক্ষিণদিকে একটি প্রবেশ পথ হয়েছে। এই প্রবেশ পথের দু-ধারে বাণিজ্যিক কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। এই কেন্দ্রের নাম দেওয়া হয়েছে "সর্বমঙ্গলা কমপ্লেক্স"। বর্তমান মন্দির পরিবেশ ভারী সুন্দর, আগেকার অপ্রয়োজনীয় জায়গা পরিষ্কার করে ঐ বিশাল জায়গায় ভারী সুন্দর ফুলের বাগান তৈরী হয়েছে। নানা সুন্দর গাছপালা লাগানো হয়েছে। একটি বিরাট ফোয়ারা নির্মিত হচ্ছে। রাত্রে নিয়ন লাইটের আলোয় একবারে মনো মুগ্ধকর পরিবেশ বলে মনে হয়। মন্দিরও সুন্দরভাবে সংস্কার করে, গ্লেস্ টাইল লাগিয়ে আধুনিক রূপে সুসজ্জিত করা হয়েছে। এই পরিবেশে কিছুটা সময় কাটিয়ে গেলে মনে আসবে প্রশান্তি। আগেকার পরিবেশ সম্পূর্ণ বদলে গেছে।

দক্ষিণের প্রবেশ পথে ঢুকেই সামনে পথের দু-ধারে দুটি শিব মন্দির, ডান দিকের শিবলিঙ্গের নাম চন্দ্রেশ্বর এবং বাঁ দিকের শিবলিঙ্গের নাম ইন্দ্রেশ্বর। এই দুটি শিব লিঙ্গই বেশ বড় আকারের এবং কালো পাথরের। বেশ ঝক-ঝক করছে। এই দুটি শিবের নাম যে চন্দ্রেশ্বর এবং ইন্দ্রেশ্বর তার প্রমাণ হচ্ছে।, ডান দিকের মন্দিরে এই কথাগুলি একটি ছোট শ্বেত পাথরে খদিত আছে ঃ-

"স্থাপিতং চিত্র সেনস্য নৃপতে জায়-য়াদ্যয়া।
রাজ্ঞা ছঙ্গ কুমার্য্যেশ-লিঙ্গং চন্দ্রেশ্বরাভিধম্।।"

বাঁ দিকে মন্দিরের গাত্রে ঐ সাদা পাথরে লেখা আছে ঃ—

"স্থাপিতং চিত্র সেনস্য ভূমিভক্তু দ্বিতীয়া স্ময়া।
মাহিয্যেন্দ্র কুমার্য্যেশ লিঙ্গমিন্দ্রেশ্বরাভিধম্।।"

শিব মন্দির দুটির ঠিক সামনে অর্থাৎ উপরে আদি মন্দির নাট মন্দির সমেত। আগে ১লা বৈশাখ এবং বিজয়াদশমীর দিন জনতার ভিড় সামাল দেওয়ার জন্য এবং খাতা পূজার জন্য ঐ আদি মন্দিরে বিগ্রহ নিয়ে এসে পূজা হতো। এখন আর সেই সমস্যা নাই। এখন নতুন নাটমঞ্চ, তার পাশে বিশাল বাগান এবং বেশ ফাঁকা জায়গা থাকায় সেই সমস্যা মিটে গেছে। এই শিব মন্দির দুটি পার হয়ে বাঁ দিকে গেলেই আর একটি প্রবেশ পথ। ঐ প্রবেশ পথে প্রবেশ করেই বাঁ দিকে তিনটি পর পর শিব মন্দির। প্রথম ও তৃতীয় মন্দিরের শিব লিঙ্গ সাদা পাথরের। নাম 'রামেশ্বর' ও 'কমলেশ্বর'। আর মাঝখানের মন্দিরের শিবলিঙ্গ কালো পাথরের। নাম 'মিত্রেশ্বর'। এই মাঝখানের মন্দিরটি বাকি দুটি মন্দির থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। অনেকটা বিষ্ণু

মন্দিরের ধাঁচে। রাজ বংশানুচরিত ঃ— রাখাল দাস মুখোপাধ্যায়ের লিখিত ১১৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত আছে। এই দুটি মন্দির রাজা তেজচাঁদ ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে নির্মাণ করেছিলেন এবং এই দুটি শিব মন্দিরস্থ শিলালিপির শ্লোক ঃ—

ঁরামেশ্বর শিবের মন্দিরস্থ শ্লোক ঃ

"শাকে সৌম্যশিবাব্ধি সপ্তিকুমিত শ্রীমঙ্গলাসন্নিধৌ
সস্ত্রিক সুরসেবকো নরপতিঃ শ্রী তেজচন্দ্রাভিধঃ।
শ্রী রামেশ্বর শঙ্গরায় বিধিবৎ শ্রীকৃষ্ণতুষ্ট্যাপ্তয়ে
সৌমং চিত্রমলস্কৃতং বিরচিতং প্রসাদমেতং দদৌ।।"

ঁকমলেশ্বর শিবের মন্দিরস্থ শ্লোক ঃ

"শ্রুত্যগ্নিসপ্তীন্দুমিতে শকাব্দে, শ্রীতেজচন্দ্রো নৃপতিঃ সদারঃ
প্রাদ্যদৃহং শ্রী কমলেশ্বরায়ে শানায় সৌধং সুবিচিত্রমেতৎ।।"

শিব মন্দির তিনটির সামনে বলির জন্য হাড়িকাঠ আছে। এখানেই বলি হয়। এরই উত্তরে নাটমঞ্চ এবং গর্ভগৃহ অর্থাৎ মূল মন্দির। মূল মন্দির দক্ষিণমুখী। মন্দিরের ছাদের দুটি স্তর আছে। প্রথম স্তরে চারকোণে চারটি রথ। দ্বিতীয় স্তরে পাঁচটি রথ। মন্দিরের প্রবেশ দ্বারে খোলা বারান্দা। বারান্দার গায়ে কিছু টেরাকোটার কাজ আছে। শিব মন্দিরগুলিতে কিছু টেরাকোটার কাজ আছে। মন্দিরের চূড়ায় পিতলের চক্র ছিল এবং তা চুরি হয়ে গেছে। এই চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ২৩শে মে (১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৬১) তারিখের 'সংবাদ ভাস্কর' এ 'কালী খানসামা কোথায় গেল' শিরোনামে বর্ধমান শহরে একটি চুরির খবর প্রকাশিত হয়।

"... .... কি অমঙ্গল সমাচার! বর্ধমানের শ্রীশ্রী মঙ্গলা দেবীর মন্দিরের চূড়ার পিতলের চক্র সকল চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। ঐ সকল চক্র যে ব্যক্তিরা চুরি করিয়াছে তাহারা আসল চৌর চক্রবর্ত্তী বটে। একে দেবীর স্থান তাহাতে সান্ত্রি পাহারা এবং ম্যাজিষ্ট্রেট সুপারনটেন্ডেন্ট্ পোলিস উভয়ে অত্রস্থলে বিরাজিত ছিলেন। এ মত সময়ে যখন তস্করেরা এই কার্য্য সমাধা করিয়া গিয়াছে তখন মোফঃ-সলে যে কি অরাজকতা হইতেছে তাহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন। দেশের লোকের আর সম্পত্তি নাই এখানে তস্করেরা দেবালয় লইয়া টানাটানি আরম্ভ করিয়াছে।"

। সর্বমঙ্গলা দেবী অষ্টাদশ ভুজা, এবং কালো পাথরের। চরণতলে মহিষ, তাহার নিকটেই অসুর। সিংহাসনে মা অধিষ্ঠাতা। ত্রিশূল দিয়ে অসুরের বক্ষ বিদীর্ণ করছেন। এই মূর্ত্তিকে মন্বন্তরা মূর্ত্তি বলা হয়ে থাকে। এই সর্বমঙ্গলা মূর্ত্তি নাকি প্রতি মন্বন্তরেই বিদ্যমান ছিলেন। মূর্ত্তির পাদদেশে একটি লেখা ছিল। কিন্তু ঐ লেখা একবারে অস্পষ্ট হয়ে গেছে। মহারাজ মহাতাব চাঁদ ঐ লেখার ছাঁচ নিয়ে

পাঠোদ্ধারের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু উহা কোন্ ভাষায় লিখিত তাহা কেহই বুঝতে সক্ষম হন নাই। শ্রীশ্রী সর্বমঙ্গলা মাতার মন্দিরে আর একটি মূর্ত্তি আছে। কেহ কেহ ইহাকেই আদি সর্বমঙ্গলা বলে থাকেন। আসলে এটি দেবী বিগ্রহ নহে। এটি সূর্য্য মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তির আকার একটি ভাঁটার মত এবং উক্ত সূর্য্য দেহে এক স্বস্তিকা মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। বিস্ময়ের কথা—সূর্য্যের অঙ্গকান্তি হতে এক দীপ্তিচ্ছটা বিচ্ছুরিত হয় ; নানা দেশ হতে বহু শ্রদ্ধা মূল নরনারী এসে উক্ত মূর্ত্তি দর্শন করে ধন্য হয়ে থাকেন। মায়ের এই মূর্ত্তি রাঢ়ের সুপ্রসিদ্ধ দেবী বিগ্রহ। এই মন্বন্তরা সিদ্ধি মাতা বহুরূপিনী, বহুশক্তির আধার ভূতা। ইনি হচ্ছেন অসুর নাশিনী, দুর্গতি হারিনী, মঙ্গলের ও আরোগ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। মায়ের নিত্য পূজা এবং অন্নভোগ বেশ শুদ্ধাচারে হয় এবং সন্ধ্যায় হয় শীতল এবং আরতি। আর ভক্তরা আসে পূজা দিতে। যতক্ষণ মন্দির খোলা থাকে ততক্ষণ পূজারীরা নিত্যযাত্রী দর্শনার্থীদের পূজার ব্যবস্থা করেন। পয়লা বৈশাখ এবং বিজয়াদশমীর দিন ভোর থেকে এত ভিড় হয় যে পুলিশ, স্বেচ্ছা সেবক বাহিনী প্রভৃতি নিয়োগ করেও ভিড় সামাল দেওয়া মুস্কিল হয়ে যায়। এ ছাড়াও বিপত্তারিনী পূজা, জ্যৈষ্ঠ মাসের মঙ্গল চণ্ডী, বাসন্তী পূজা, রাম নবমী এবং দুর্গাপূজার সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী আর বিজয়াদশমীতে আগেই উল্লেখ করেছি, প্রচুর ভক্ত সমাগম হয়। প্রতি অমাবস্যায় ধুমধাম করে পূজা হয় এবং ছাগ বলি হয়। দুর্গাপূজার নবমীতে মোষ বলি হয় এবং প্রচুর ছাগ বলি হয়।

মায়ের মন্দিরের দক্ষিণ পূর্বকোণে বিখ্যাত কামান ছিল, এটি প্রায় ৫ ফুট লম্বা। এই জায়গাটি কামানতলা নামে খ্যাত। দুর্গাপূজার সন্ধিক্ষণ জ্ঞাপনের জন্য এই কামান থেকে তোপ্ দাগা হতো। সেই শব্দ শুনে আশে-পাশের বহুদূর পর্যন্ত স্থানে সন্ধিক্ষণের বলি হত। এইটাই প্রচলিত রীতি ছিল। ১৯৯৭ সালের ৯ই অক্টোবর রাত্রি ১২টা ৩২মিঃ সন্ধিক্ষণের তোপ দাগার সময় কামান ফেটে যায় এবং বেশ কিছু হতাহত হয়। তারপর থেকে ঐ কামান দাগার যে চিরাচরিত প্রথা ছিল, ঐতিহ্য বহনকারী সেই প্রথার বিলোপ ঘটে। এই কামান দুর্ঘটনার বিস্তৃত বর্ণনা দিয়ে পদ্যাকারে একটি লেখা সাপ্তাহিক বর্ধমান 'বিজয়তোরণ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এর থেকেই ঐ দুর্ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ জানা যাবে। তাই ঐ লেখাটি আমি এখানে উদ্ধৃতি করছি সকলের জ্ঞাতার্থে ঃ

"পাঠক পাঠিকাবৃন্দ করি নিবেদন
কামান দুর্ঘটনা কথা করুন শ্রবণ।
উনিশ শো সাতানবই সালে সন্ধিপূজায়
কামান বিস্ফোরণে ঘটে বিপর্যয়।

বারোটা বত্রিশ মিনিট রাতে শুভক্ষণে
কামান বিস্ফোরণ ঘটে সুতীব্র গর্জনে।
অষ্টমীর ক্ষণ শেষ নবমী সূচনায়
দর্শনার্থী জমেছিল কামান তলায়।

শুভক্ষণ অনাথ আচার্য্য ঘোষে পলগুনে
রাধা রমণ দাসের অগ্নি সংযোজনে।
গর্জনে কামান ফেটে হয় চৌচির
বর্ধমানের জামাই হত লিখন নিয়তির।

তরুণ চিকিৎসক আশিস ঘোষ নাম
বর্ধমানবাসী করি আত্মার কল্যাণ।
উনিশ শো সাতানব্বই নয়ই অক্টোবর
দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে শোকের খবর।

পাঁচশ গজ দূরে বাঁকা পাড়ে ভাতশালায়
নাতি নিয়ে শুয়েছিল ঠাকুমা দোতলায়।
গ্রীল বেঁকে ঘরে ঢোকে কামানের চাঁই
বৃদ্ধা কমলা দাসের নিল প্রাণটাই।

মঙ্গলা মায়ের কাছে করি এ মিনতি
নিহতদের আত্মার করুন সদ্‌গতি।
রাধারমণ, অনাথ, কার্তিক, তারক ঘোষ আদি
আহত ষাটাধিক্যের চিকিৎসা ইত্যাদি।।"

এর থেকেই বোঝা যায় ঐ দুর্ঘটনার ব্যাপকতা কতদূর বিস্তৃত ছিল এবং এই দুর্ঘটনার পর থেকেই অতীতের সেই সন্ধিক্ষণের ঐতিহ্যবাহী প্রথার বিলুপ্তি ঘটে।

মন্দিরের পূজারী ব্রাহ্মণ অনেক আছেন। রায়ান এবং বেগুট দুই গ্রামের পূজারী বংশধরেরাই পূজা করেন। দুই গ্রামের পূজারীরা আলাদা আলাদা মন্ত্রে মায়ের পূজা করেন। রায়ানের পূজারীদের মন্ত্র হচ্ছে "আদিত্য মণ্ডললীলাং কোটিসূর্য্য সমপ্রভং" ইত্যাদি মন্ত্রে। কথিত আছে এই মন্ত্রটি বর্ধমান মহারাজার সভাপণ্ডিতেরা তৈরী করেছিলেন। বেগুটের পুজারীদের মন্ত্র হচ্ছে "ওঁ বালর্কদ্যুতিমিন্দুখণ্ডবিল সৎকোটির

হারোজ্জ্বলাম্” ইত্যাদি মহালক্ষ্মীর ধ্যানে। এখন মন্দিরের চারিপাশ বেশ জম-জমাট। দোকান পাসার খুব গড়ে উঠেছে। নিত্য ভক্তদেরও সমাগম প্রচুর। দূর-দূরান্ত থেকে ভক্তরা আসে মায়ের পূজা দিতে। অনেকেই মায়ের কাছে তাদের মনোস্কমনার কথা নিবেদন করেন এবং মাও তাঁদের মনোস্কামনা পূর্ণ করেন। মহারাজাধিরাজ উদয় চাঁদ মহাতাব ১৯৫৮ সালে “সর্ব্বমঙ্গলা ট্রাষ্ট” গঠন করেন। এই ট্রাষ্টই পূজা আর্চা এবং মন্দির রক্ষণাবেক্ষণ করেন। পরিশেষে বলি ঃ—

“বর্ধমানে সর্বমঙ্গলা বন্দি পদদ্বয়,
দর্শনে কলুষ নাশ চতুর্বর্গ হয়।”

গ্রন্থঋণ ঃ—
১। বর্ধমান ঃ— ইতিহাস ও সংস্কৃতি, যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী (১৯৯৪) ৩য় খণ্ড
২। রাঢ়ের গ্রাম দেবতা – ডঃ মিহির চৌধুরী কামিল্যা (১৮৮৯)
৩। বর্ধমান রাজ সভাশ্রিত বাংলা সাহিত্য — ডঃ আবদুস সামাদ
৪। অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনী ৩রা এপ্রিল ১৯১৫
৫। বর্ধমান স্মরণিকা — ১৯৮২

শ্রীশ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ জীউ ঠাকুর বাড়ী

বিজয়চাঁদ রোডের পশ্চি ম প্রান্তে কাপড়ের চক বা সোনাপটি পার হয়ে সুউচ্চ তোরণ দ্বার। তোরণ দ্বারের ঠিক সামনে রাজা বনবিহারী কাপুরের আবক্ষ মর্মর মূর্ত্তি আজও স্থাপিত আছে। এই অঞ্চলটিকে বকুলতলাও বলা হয়। অর্থাৎ এখানে একটি বিশাল বকুল গাছ আছে। তারই তলায় রাজা বনবিহারী কাপুরের মর্মর মূর্ত্তি। তার সন্নিকটে আঞ্জুমান কাছারি অর্থাৎ জমিদারীর প্রধান কার্য্যালয়। এরই পশ্চিমে বসতবাড়ী এবং সবর্বশেষ ভাগে প্রাসাদ। রাজা ত্রিলোকচাঁদ রাজবাড়ী ও লক্ষ্মীনারায়ণ জীউর ঠাকুর বাড়ীর নির্মাণ কার্য্য শুরু করেছিলেন কিন্তু তিনি শেষ করতে পারেন নাই। তাঁর অসমাপ্ত কাজ মহারাজা তেজচাঁদ এবং মহারাজা মহাতাব চাঁদ শেষ করেন। রাজবাড়ীর চার দেওয়ালে পশ্চি ম প্রান্তের মোবারক মঞ্জিল থেকে কেউ যদি পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত আঞ্জুমান কাছারী যেতে চান তাহলে তিনি রাজ কাছারী বাড়ীর সুউচ্চে অবস্থিত "টাওয়ার ক্লক" অর্থাৎ চতুর্মুখী ঘড়ির দিকে লক্ষ্য রেখে পথ চললেই সহজে পৌঁছে যাবেন। সোনাপটী পার হয়ে একটি সুউচ্চ তোরণ দ্বার। এই তোরণ দ্বার অতিক্রম করে শ্রীশ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ জীউর মন্দিরে প্রবেশ করা যায়। এই মন্দির মহারাজা মহাতাব চাঁদ রাজবাড়ীর সীমানার মধ্যেই নির্মাণ করে সেখানে প্রতিষ্ঠা করেন রাজবাড়ীর গৃহ দেবতা শ্রীশ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ জীউ শিলা মূর্ত্তি, শ্রীশ্রী আনন্দ বল্লভ জীউ, শ্রীশ্রী কেশব রায় এবং রাজ বাড়ীরকূলদেবী চণ্ডিকা মাতার শিলামূর্ত্তি, প্যারী বল্লভ জীউ, শ্রীশ্রী রামচন্দ্র জীউ এবং রাজমাতার রাধাদুলাল গোপাল জীউ প্রভৃতি আরো অনেক বিগ্রহ। পরে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত অলোচনা করছি।

রাজা চিত্রসেনের প্রধানা মহিষী ছন্দ কুমারী যে দেবমূর্ত্তি কালনা থেকে বর্ধমানে তাঁর আগমন কালে নিয়ে আসেন তা প্রতিষ্ঠা করেন কাঞ্চননগরের বারোদুয়ারী প্রাসাদে। কারণ তখন রাজবাড়ী ছিল ঐ কাঞ্চননগরের বারোদুয়ারীতে। তারপর রাজবাড়ী কাঞ্চননগর থেকে বর্তমান রাজবাড়ীতে স্থানান্তরিত হলে ঐ শ্রীশ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ জীউও বর্তমান রাজবাড়ীতে চলে আসেন। মহারাজ মহাতাবচাঁদ মন্দির ভিত্তি ব্রাহ্মণ পদধূলির দ্বারা পবিত্র করিবার জন্য সচেষ্ট হন। এই উপলক্ষ্যে প্রায় তিন লক্ষাধিক ব্রাহ্মণকে আমন্ত্রণ জানান হয়। ব্রাহ্মণের পদধূলির দ্বারা পবিত্রীকৃত স্থানে এক কারুকার্য্যময় বিশাল মন্দির, তৎসংলগ্ন সুউচ্চ স্তম্ভ বিধৃত নাট মন্দির, সম্মুখে নহবৎ খানা, এবং সুন্দর কারুকার্য্য মণ্ডিত রাসমঞ্চ প্রভৃতি দর্শনার্থীদের মুগ্ধ

করে। ব্রাহ্মণ পদধূলির দ্বরা পবিত্র স্থানের সংগৃহীত সেই ধূলি এখনও জনসাধারণকে দেওয়া হয়।

শ্রীশ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ জীউ মন্দিরের প্রবেশ পথের সামনে ধবংসপ্রাপ্ত রাসমঞ্চটি এখন অতীতের শিল্প কলার নিদর্শন বহন করে আসছে। অতীতে এই রাসমঞ্চে রাস উৎসব খুব সমারোহে পালিত হতো। শ্রীশ্রী আনন্দ বল্লভ, শ্রীশ্রী প্যারী বল্লভ, শ্রীশ্রী কেশব রায় প্রভৃতি বিগ্রহ এই রাস মঞ্চে নিয়ে আসা হতো। সুন্দরভাবে এই রাসমঞ্চ সাজানো হতো। বহু জন সমাগম ঐ রাস উৎসবের দিন হতো। দর্শনার্থীরা ঐ রাস উৎসব আনন্দের সাথে উপভোগ করত। রাস মঞ্চের সামনে বিশাল চত্বর। এই চত্বরে আষাঢ় মাসে শ্রীশ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ জীউর রথযাত্রা উৎসব মহা সমারোহে উদ্‌যাপিত হতো। রূপোর রথ এবং পিতলের রথ দুটিকে সুন্দর করে, পরিষ্কার করে সাজিয়ে গুছিয়ে দেবমূর্ত্তিগুলি রথোপরি স্থাপিত হতো। রথ প্রস্তুত, টানা হবে, শঙ্খ ঘন্টা ধবনি আরম্ভ হলো। রূপোর রথ প্রথমে রাজকর্তৃপক্ষ স্পর্শ করে সামান্য টান দেবার পর জনসাধারণ শঙ্খ ঘন্টা ধবনির সঙ্গে আনন্দে জয়ধবনি করে রথ টানতো। আবার বিকালে বর্ধমানের রথতলায় দুটি বিরাট রথ টানা হতো। একটি রাজার রথ এবং অপরটি রাণীর রথ। শ্রীশ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ জীউ এবং শ্রীশ্রী শ্যামসুন্দর জীউ নিয়ে গিয়ে ঐ দুটি রথে চড়ানো হতো। এক রথে শ্রীশ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ জীউ এবং অপর রথে শ্রীশ্রী শ্যামসুন্দর জীউকে চড়ানো হতো। এখন শ্রীশ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ জীউ বাড়ীতে পেতলের এবং কাঠের ছোট রথ টানা হয়—মেলাও বসে। তবে সে সমারোহ আর নেই।

শ্রাবণ মাসে শ্রীশ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ জীউর বাড়ীতে মহা সমারোহে ঝুলন উৎসব পালিত হতো। মূল মন্দিরে প্রবেশ করে সামনেই সুউচ্চ স্তম্ভ বিধৃত বিশাল নাট মঞ্চ। তারই সামনে ঝুলন কাটরা। এই ঝুলন কাটরাতেই খুব সুন্দরভাবে ঝুলন সাজানো হতো। ঝুলন কাটরার সামনে দুদিকে বিশাল দুটি স্তম্ভে দুটি ডিম্বাকৃতি কাঁচের শো-কেসে দুটি সুন্দর ছোট মূর্ত্তি আজও বিদ্যমান। একটি শো-কেসে রক্ষিত আছে চতুর্ভূজা সরস্বতী মূর্ত্তি ময়ূর বাহনের উপর। অপর দিকের শো-কেসে রক্ষিত আছে নারায়ণ মূর্ত্তি। এরকম সরস্বতী মূর্ত্তি খুবই দুর্লভ। ঝুলনের ক-দিন ঝুলন কাটরার সামনে বিশাল নাট-মন্দিরে কৃষ্ণযাত্রা থেকে আরম্ভ করে বহু ভক্তিমূলক অনুষ্ঠান হতো। কলকাতার বহু নামী দল এই উৎসবে অংশ গ্রহণ করত। বর্ধমানবাসীরা বিনা দর্শনীতে এই সমস্ত উৎসব দেখার সুযোগ লাভ করত। ঝুলনের ক-দিন মন্দির প্রাঙ্গণ একেবারে উৎসব মুখরিত হয়ে থাকত। দু-একটি উৎসবের কথা আমি তুলে ধরছি। বিখ্যাত কৃষ্ণযাত্রা পালাকার এবং গায়ক নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় প্রতি বছর ঝুলন উৎসবের অংশ গ্রহণ করতেন। শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণদেব ওঁনার গান শুনে মুগ্ধ

হতেন। এই নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের খ্যাতি সম্বন্ধে আমি রাধা বল্লভ জীউর বিষয়ে লেখার সময় উল্লেখ করেছি। পুনরায় আমি ওঁনার একটি ঘটনা পাঠকদের কাছে তুলে ধরছি ঃ "কণ্ঠ কবি ছিলেন সে যুগের বিখ্যাত যাত্রাপালার স্রষ্টা গোবিন্দ অধিকারীর শিষ্য এবং বর্ধমান রাজবাড়ীতেই নীল কণ্ঠ গোবিন্দ অধিকারীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। সে বছর ছিল শ্রাবণ মাস। ঝুলন পর্ব উপলক্ষ্যে গোবিন্দ অধিকারী বর্ধমান রাজবাড়ীতে এসেছেন গাহনা করতে। কারণ বর্ধমান রাজ মহাতাব চাঁদ সেই সব গুণী গায়কদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। এখানে সীতারাম ঘোষাল নামক এক ভদ্রলোকের সহায়তায় নীলকণ্ঠ অধিকারী মহাশয়ের শরণাপন্ন হলে গোবিন্দ অধিকারী এই যুবকের সুরেলা কণ্ঠের পরিচয় পান ও মুগ্ধ হয়ে ষোল টাকা মাস মাহিনায় নিজ দলে অন্তর্ভুক্ত করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য পালা গায়ক হিসাবে নীল কণ্ঠ উল্লেখযোগ্য স্বীকৃতি ও খ্যাতি লাভ করেছিলেন এই বর্ধমান রাজবাড়ীতেই। বর্ধমান রাজের সুপ্রসিদ্ধ শ্রীশ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ জীউ ঠাকুর বাড়ীতে প্রথম একদিন গাহনা করে নীলকণ্ঠ উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ও শত অভিনন্দন লাভ করেছিলেন। তারপর থেকে এই আসর তাঁর বাঁধা হয়ে যায়।"

কথিত আছে একবার নীলকণ্ঠ বর্ধমান রাজের এই শ্রীশ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ জীউ ঠাকুর বাড়ীতে গান গাইছেন পালাগানের আসরে, বেহালায় সুর দিচ্ছেন তাঁর গুরু গোবিন্দ অধিকারী স্বয়ং। বর্ধমান রাজ সেদিন কোন কারণবশতঃ আসতে পারেন নি আসরে, কিন্তু অলিন্দ থেকে গায়কের কণ্ঠনিঃসৃত অপূর্ব সুরলহরী শুনে মহারাজ মহাতাব চাঁদ মুগ্ধ হয়ে দূরবীন দিয়ে দেখতে লাগলেন গায়ককে। তখন গুরু গোবিন্দ অধিকারী সেদিকে দৃষ্টি দিয়ে নীলকণ্ঠকে বললেন, ঐ দেখ তোমার গানের সুরমাধুর্যে পুলকিত মহারাজ তোমাকে দূরবীন দিয়ে দেখছেন। মহারাজের কৃপায় তোমার আর কোন দুঃখ থাকবে না। এরপর থেকে প্রতি বছরই তাঁর আসর বাঁধা হয়ে যায়। মহাতাব চাঁদ গুণীর এত সমাদর করতেন যে তিনি মাত্র বত্রিশ টাকা জমায় দুই শত বত্রিশ বিঘা জমি নীলকণ্ঠকে দান করেছিলেন। এ ছাড়াও বহু খ্যাতিমান ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের ভক্তিমূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এই শ্রীশ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ জীউ ঠাকুর বাড়ীতে অনুষ্ঠিত হতো। ঝুলন পুর্ণিমার পূর্ব দিন অর্থাৎ চতুর্দশী তিথিতে চণ্ডিকা মাতার মহেচ্ছা পূজায় বর্ধমানের ক্ষত্রিয়গণ অংশ গ্রহণ করতেন।

এ ছাড়াও জন্মাষ্টমী উৎসব খুব ধূমধাম করে উদ্‌যাপিত হতো এবং নন্দোৎসব ও খুব জাঁকজমক ভাবে পালিত হতো। এর প্রমাণ পাওয়া যায় ডঃ হংস নারায়ণ ভট্টাচার্য্য কৃত উল্লখযোগ্য গবেষণা গ্রন্থ "যাত্রা গানে মতিলাল রায় ও তাঁহার সম্প্রদায়" (১ম সং ১৩৭৪) পুস্তকে দেখা যায় যে বর্ধমান রাজ মহাতাব চাঁদ যাত্রা গানের জন্য মতিলালকে পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। মতিলাল রায়ের জন্ম ১৮৪৩

খৃষ্টাব্দে বাংলা সন ১১৪৯ সনে ২১শে মাঘ বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী ব্লকের অন্তর্গত ভাতশালা গ্রামে। নবদ্বীপে পোড়ামাতার সম্মুখে তাঁর দলের প্রথম গাওনা হয়। প্রতি বৎসর নন্দোৎসবের দিন মহারাজ শ্রীশ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ জীউ ঠাকুর বাড়ীতে মতিলাল রায়ের যাত্রা পালাগান শুনতেন। ঐ দিন বিভিন্ন দলের শ্রেষ্ঠ পালার কয়েকটি নির্ব্বাচিত দৃশ্য অভিনীত হতো। মহারাজ মহাতাব চাঁদ বিচার করে শ্রেষ্ঠ দলকে পুরস্কৃত করতেন। বর্ধমানে একে বলতো "নন্দোৎসবের বাঁধাই গান"। কয়েকবারই মতিলাল শ্রেষ্ঠ গাহনাকার হিসাবে মহারাজ কর্তৃক পুরস্কৃত হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে এই বর্ধমান রাজবাড়ীতে গাহনা উপলক্ষ্যে নীলকণ্ঠের সঙ্গে মতিলাল রায়ের সাক্ষাৎ হয় এবং এই দুই গায়কের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হয়। নীলকণ্ঠের গান ও বর্ধমান মহারাজার অত্যন্ত প্রিয় ছিল। মতি রায়ের পুত্র ধর্মদাস রায় পিতার 'কৃষ্ণযাত্রা' দল পরিচালনা করেন পরবর্তীকালে। তিনিও বর্ধমান রাজ পরিবারের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। ধর্মদাস তাঁর রচিত 'কুন্তির শিবসাধনা' গীতাভিনয় খানি বর্ধমান মহারাজকে উৎসর্গ করেন।

শ্রাবণ মাসে ঝুলন ও তারপর জন্মাষ্টমী এবং নন্দোৎসব। তারপর আশ্বিন মাসে দুর্গোৎসব। এই দুর্গোৎসব রাজবাড়ীতে খুব জাঁক-জমকভাবে পালিত হতো। এই দুর্গোৎসবের বিশেষত্ব হচ্ছে এখানে পটেশ্বরী দুর্গাপূজো হতো। এই পটেশ্বরী দুর্গাপূজো এখনও শ্রীশ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ জীউ বাড়ীতে অনুষ্ঠিত হয়। তবে সে জৌলুস আর নেই। তখনকার দিনে বর্ধমান শহরে বাড়ীর পৈতৃক পূজো ছিল চার-পাঁচটি। তাঁরা নিজেরাই পূজা পাবর্বন চালাতেন। তখন সাবর্বজনীন বা বারোয়ারী পূজার চল ছিল না। এখনকার মত তখন পূজো দেখার জন্যে ভীড় হতো না বা পূজো দেখতে যাবার এত রেওয়াজও ছিল না। ছেলেরা ভিড়জমাতো পূজো দেখার জন্য। তখন অনেকেই দেশের পৈতৃক পূজোয় যোগদানের জন্য দেশের বাড়ীতে যেতেন। কারণ দেশের পৈতৃক পূজোয় যোগদানটাই সামাজিক রীতিনীতি ছিল।

বর্ধমানের পূজোর তাই শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ ছিল শ্রীশ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ জীউর বাড়ীতে পাটেশ্বরী পূজো। তখন বর্ধমানের জনসাধারণ অন্ততঃ কোথাও না গেলেও শ্রীশ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ জীউর বাড়ীতে পটেশ্বরী প্রতিমা দর্শন করতে যেতো। বাড়ীর মহিলারা যাঁরা বর্ধমান শহরে থাকতেন, তাঁরা অন্য কোন প্রতিমা দর্শন না করলেও শ্রীশ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ জীউর ঠাকুর বাড়ীর পটেশ্বরী প্রতিমা দর্শন করতেন। সোনাপটীতে প্রধান ফটক পার হয়ে শ্রীশ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ জীউর রাসমঞ্চ, তারপর নহবৎ খানা। এরপর সামনেই অপূর্ব শোভাময় পটেশ্বরীর পূজার স্থান নাটমন্দির। বৃত্তাকার সুউচ্চ স্তম্ভবিধৃত সুবিশাল নাটমন্দির প্রাঙ্গন। অভ্যন্তর প্রাচীর গাত্রের চতুর্দিকে পৌরাণিক কাহিনী বিধৃত বৃহৎ বৃহৎ তৈলচিত্র, শ্রেণীবদ্ধ লম্বমান ঝাড় বাতি আলোক মালা

সমুজ্জ্বল আলোরাশি শ্বেত-প্রস্তর-খচিত ভূমিতলে প্রতিফলিত হয়ে চতুর্দিক উদ্ভাসিত করে দিত। আলোক বিচ্ছুরনে উদ্ভাসিত উৎসব আকুলিত মন্দির, শঙ্খ-ঘন্টা ধ্বনি সহ মুখরিত আরতি, নরনারীর ভক্তি নম্র, মাতৃঅঞ্চল সংলগ্ন সন্তানগুলি সব মিলে এক আনন্দময় স্বর্গীয় জগতের রূপ পরিগ্রহ করতো। ক্রমে রাত্রি নেমে আসত। আরতির শঙ্খ ঘন্টা ধ্বনি থেমে যেতো। তখন ঘরে ফেরার পালা। কিন্তু মন পড়ে থাকতো সেই উৎসব মুখর মন্দিরের দিকে।

আশ্বিন মাসের প্রতিপদ থেকে কার্তিক পূর্ণিমা পর্যন্ত শ্রীশ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ জীউ বাড়ীতে ভাগবত কথা হতো। বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব এই ভাগবত পাঠ করতে আসতেন। সারা কার্তিক মাস অন্নকুট হতো। পৌষমাসের প্রতিপদ থেকে মাঘ মাসের দ্বিতীয়া পর্যন্ত প্রায় একমাস খিচুড়ি ভোগ হতো। তারপর রামায়ণ গান প্রায় একমাস ধরে হতো। দোল যাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হতো। বর্ধমান শহরে দোল যাত্রার একটা বিশেষত্ব হলো যে, যেদিন দোল যাত্রা সেদিন বর্ধমান রাজার দেবদেবীদের দোলখেলা হতো। তাই সেদিন রাজাদের দোল উৎসব বলা হতো। পরের দিন বর্ধমান শহরে হোলী খেলা হতো। এখনও সেই রেওয়াজ চলে আসছে। অর্থাৎ বর্ধমানে দোলের পরদিন হোলী উৎসব পালিত হয়। এটা অন্যান্য জায়গা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক।

চৈত্র মাসে প্রতি পদ থেকে দশমী পর্যন্ত নবরাত্রী পূজা, বাসন্তী পূজা, রাম নবমী, চণ্ডীকা মাতার পূজা, কুমারী পূজা, চণ্ডীপাঠ খুব ধূমধামের সাথে অনুষ্ঠিত হতো। এখনও এই সমস্ত অনুষ্ঠান হয়। এখনও ঐ সময় প্রচুর লোক খায়। ঐ সময় ডঃ প্রণয় চাঁদ মহাতাব বর্ধমানে শ্রীশ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ জীউ বাড়ীতে আসেন, থাকেন এবং অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন।

বিংশ শতকের পাঁচ দশক পর্যন্ত বর্ধমান শহরে প্রাণ প্রবাহ সজীব ছিল। সেই প্রাণ ছিল বর্ধমান রাজ। এই ধারা সুপ্রাচীনকাল থেকে জমিদারী উচ্ছেদ হওয়ার আগে পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। বর্ধমান শহরে রাজবাড়ীকে ঘিরে তখনও সেই ধারা আবর্ত্তিত হত। রাজবাড়ীর লাগাও সোনাপটি, জহুরী পটি, কাপড়ের চক্, পুরাতন চক্, একটু দুরে চাউল পটি, ডাল পটি, মশলা পটি, কাঁসারী পটি প্রভৃতি। এদের কাজ কারবার ছিল সবই রাজবাড়ীকে ঘিরে। এছাড়া বর্ধমানের অপর বাসিন্দা প্রায় অনেকেই ছিলেন রাজকর্মচারী। শ্রীশ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ জীউর অন্নভোগ প্রসাদ সমগ্র রাজবাড়ী, বড় বাজারের অঞ্চলবাসী দোকানদাররা গ্রহণ করতেন। বেশ বড় এক চার কোণওলা (অর্থাৎ দোনা বলা হত) শালপাতার ঠোঙ্গা ভর্ত্তি অন্ন, সেই পরিমাণে তরকারী, পরমান্ন মাত্র চার পয়সায় পাওয়া যেত। এখন এ সমস্ত ঘটনা কাল্পনিক বলে মনে হবে।

বর্তমানে শ্রীশ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ জীউর মন্দিরে প্রবেশ করলেই মন চলে যাবে অতীতের স্মৃতি বিড়রিত উৎসব মুখর দিনগুলিতে। মনে হবে কি রমরমা ছিল এই সমস্ত দেবশালা। এখন সেগুলি ক্ষীণ, ম্রিয়মান, শুধু অতীতের স্মৃতিটুকু জড়িয়ে আছে। বর্তমানে মন্দিরে ঢোকার প্রবেশ পথে ঢুকেই দেখা যাবে ধ্বংস প্রাপ্ত রাসমঞ্চ টি। কি সুন্দর ছিল এই রাসমঞ্চ। তারপর মূল মন্দিরে প্রবেশ করে সামনেই উপর নীচে দুটি প্রকোষ্ঠ আছে উপরের প্রকোষ্ঠে অধিষ্ঠিত আছেন কালো পাথরের শ্রীশ্রী গরুড় জীউ। তলার প্রকোষ্ঠাটিতে স্থিত আছেন সাদা পাথরের শ্রীশ্রী মহা মৃত্যুঞ্জয় মূর্ত্তি। এরপর বাঁদিকে গেলে প্রথমেই একটি ক্ষুদ্র কক্ষে রাজ পরিবারের কুলদেবী চণ্ডিকা মাতার মূর্ত্তি। পরের ক্ষুদ্র কক্ষে রক্ষিত আছেন শ্বেত পাথরের সুন্দর হর-পার্বতী মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তিটি খুব সুন্দর। এরপর মুল মন্দির। এই মুল মন্দিরের সিংহাসনে শ্রীশ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ জীউর শিলা মূর্ত্তি। এই সিংহাসনেই স্থিত অষ্ট ধাতুর তৈরী রাধা কৃষ্ণের বিগ্রহ অর্থাৎ শ্রীশ্রী আনন্দ বল্লভ জীউ। অষ্টসখী পরিবৃত্ত। পাশেই আছেন শ্রীশ্রী কেশব রায় জীউর দারু মূর্ত্তি। এই শ্রীশ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ জীউ এবং শ্রীশ্রী কেশব রায় হলেন রাজ পরিবারের গৃহ দেবতা। এখানেই আছেন রাজ মাতার শ্রীশ্রী রাধাদুলাল গোপাল জীউ।

এরপর ঝুলন কাটরা। সামনেই সুন্দর নাট মন্দির। এই ঝুলন কাটরাতেই ঝুলন সাজান হয় এবং সামনের সুন্দর নাটমন্দিরেই পূর্ব্বে ভক্তিমূলক এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হতো। এরপর আর একটি গৃহের মধ্যে সিংহাসনে আছেন রাধা কৃষ্ণের বিগ্রহ। কৃষ্ণের মূর্ত্তি কষ্টিপাথরের এবং রাধার মূর্ত্তি পিতলের। ইনিই হচ্ছেন শ্রীশ্রী প্যারীবল্লব জীউ। একটি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত আছেন শ্রীশ্রী রামচন্দ্র জীউ, সাথে সীতাদেবী, লক্ষ্মণ, পরিবারের সমস্ত সদস্য এবং মহাবীর হনুমান জাম্বুবান প্রভৃতি। এগুলি সবই দারুণ মূর্ত্তি। এছাড়াও মোট গোপাল মূর্ত্তি আছে এগারো বারোটি। তার মধ্যে দুটি বৃহদাকার কষ্টি পাথরের গোপাল মূর্ত্তি এবং বাকিগুলি অষ্ট ধাতুর এবং পিতলের। মূল মন্দির দক্ষিণমুখী। এইখানেই এখন পটেশ্বরী দুর্গা পূজা হয়। পূর্ব্ব দিকে একটি ছোট কক্ষে আছেন বেশ বড় আকারের শ্বেত পাথরের শ্রীশ্রী গণেশ জীউ।

মূল মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রাজা ত্রিলোক চাঁদ। এই কালো পাথরের শিবলিঙ্গটি স্বয়ম্ভু শিবলিঙ্গ। এই মন্দিরটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো মন্দিরের নিম্নভাগ ভূগর্ভে অবস্থিত এবং সিঁড়ি দিয়ে নেমে শিবলিঙ্গ দর্শন করতে হয়। এই মন্দিরের শ্বেত পাথরের মেঝের শিলালিপিটি হচ্ছেঃ

"অভয় শিব চরণার্থিনঃ শিবভক্ত শ্রী মহারাজাত্মজস্য।
শ্রী মদভয়চন্দ্ মহাতাব ভ্রাতৃবর্ম্মণঃ শিশুরূপস্য

উপলান্তরোয়মম্বুধি রাম গিরি কুমশাকেই বিসংক্রান্ত্যাম্
শৈশব ভক্ত্যুপহারঃ শ্রী ভুবনেশ্বর পাদাব্জয়ো।।"

এই মন্দিরে নিত্য অন্নভোগ এবং রাত্রে লুচি মিষ্টি ভোগ হয়। বর্তমান মুখ্য অধিকারী হলেন শ্রী শিবপ্রসাদ চোংদার। সরকার বাহাদুর জমিদারী অধিগ্রহণ করার ফলে সমগ্র জমিদারী বর্ধমান রাজের হাত ছাড়া হয়ে যায়। তাঁর নিজস্ব প্রাসাদ বর্ধমান বিশ্ব বিদ্যালয়কে দান করেন। বসবাসের জন্য বাড়ীতো দূরের কথা ভূমি পর্যন্ত রাখেন নি। ছোট রাজ কুমার ডঃ প্রণয় চাঁদ মহাতাবের উপরই সমস্ত দেব সেবার পরিচালনার ভার আছে। তিনি সেবাইত হিসাবে বর্ধমানে সময় সময় আসেন দেবসেবা উপলক্ষ্যে। শ্রীশ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ জীউর ঠাকুর বাড়ীতে একাংশে তিনি থাকেন। এখানেই মহাতাব ট্রাষ্টের অফিস পরিচালনা করেন। শ্রীশ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ জীউ, রাধা বল্লভ জীউ, সোনার কালী, শ্রীশ্রী ভুবনেশ্বরী দেবীর নিত্যসেবা হয়। এই সব দেবসেবায় পূর্ব্বের জাঁকজমক না থাকলেও আগেকার ধারাকে রক্ষা করার চেষ্টায় আছেন ডঃ প্রণয় চাঁদ মহাতাব। দেবসেবা অফিস এবং দেবসেবার তত্ত্বাবধান উনিই করেন। তা ছাড়া তিনি সব বিষয়ে লক্ষ্য রাখেন যাতে সুষ্ঠভাবে দেবসেবা, পূজা-আর্চা সম্পন্ন হয়।

দুর্লভা কালী

প্রায় দু'শো বছর পূর্ব্বে বর্ধমানের লাকুর্ডি মৌজায় বেহুলা নদীর তীরে শ্রী মৎ গোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী নামে এক তন্ত্র সাধক আসেন এবং তন্ত্র সাধনা আরম্ভ করেন। বর্ধমান শহরটি ছিল লাকুরডিহি কাঞ্চননগরকে কেন্দ্র করে। বর্ধমান রাজসভা পণ্ডিত অঘোর নাথ তত্ত্বনিধি 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রিকার গদ্যে পদ্যে 'বর্ধমান বর্ণন' শিরোনামে একটি দীর্ঘ রচনা প্রকাশ করেন। তাতেও দুর্লভা কালীর কথা উল্লেখ আছে।

"পূবের্ব সবর্ব মঙ্গলার সৌধ নিকেতন। উত্তরাংশে দেলকোষা নামে রম্যবন।।

পশ্চি মে দুর্লভা নামে দেবীর আলয়। মধ্য ভাটা রাজ পুরী বর্ধমান ময়।।"

সংবাদ ভাস্কর ঃ— ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৮৫৬

কাঞ্চননগরের উত্তর-পশ্চিমে লাকুর্ডি। এখানেই বর্ধমানের উত্তর-মশান-স্থিত ছিল দুর্লভা কালীর মন্দির এবং দক্ষিণ-মশান-স্থিত ছিল তেজগঞ্জের কালীর মন্দির (অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন, বর্ধমান ৩রা এপ্রিল ১৯১৫) বেহুলা নদীর তখন অস্তিত্ব ছিল তারও উল্লেখ আছে। "বর্ধমান শহর দামোদরের শাখা বাঁকা নদীর তীরবর্তী। একদা এই বাঁকা দিয়েই দামোদরের এক প্রধান এবং বারোমাস স্থায়ী স্রোত বইত। সুতরাং প্রাচীন বর্ধমান বাঁকার অথবা তার শাখা বেহুলা অথবা সমান্তরাল শাখা খড়ি নদীর তীরে অবস্থিত ছিল বলে অনুমান করতে হয়। সব মনসা মঙ্গল কাব্যেই বেহুলার ভাসানের যে যাত্রাপথ বলা হয়েছে তা দামোদরেরই পুরানো খাত অনুসারে। স্থানে স্থানে এই খাত পরম্পরার বিভিন্ন নাম খড়ি, বাঁকা, বেহুলা, বলুকা ইত্যাদি। গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ও রেলপথ নির্মাণের ফলে বেহুলা ও গাঙ্গুরের খাতে দামোদরের জল আসা বন্ধ হয়ে যায় এবং কালক্রমে ঐ খাত দুটি শুকিয়ে যায়"। (বর্ধমানের ইতিহাস - ডঃ সুকুমার সেন) সুতরাং বেহুলা নদীর এখন আর কোন চিহ্নই নাই। বর্তমান বর্ধমান শহর ও নবাবহাটের মধ্যবর্তী অঞ্চলে বেহুলা নদী প্রবাহিত ছিল। যার শুষ্ক খাত গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের উত্তরে আজও বর্তমান (বর্ধমানঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি যোজ্ঞেশ্বর চৌধুরী) "বর্ধমান শহরের পশ্চি ম ভাগে লাকুর্ডিয়া নামক এক পল্লী আছে। জনশ্রুতি যে, লক্ষ ঘর অর্থাৎ তৎকালে লক্ষটাকার অধিকারী না হলে লাকুর্ডিয়া পল্লীতে কেহ বসবাসের অনুমিত পেত না।" (বর্ধমানঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি, যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী)

যে অঞ্চলে এখন মায়ের মন্দির রয়েছে তার প্রাকৃতিক শোভা অতি মনোরমা।

বেশ শান্ত পরিবেশ। কিছুক্ষণের জন্যে অন্ততঃ মানুষের মনকে শান্তি দেবে। মায়ের মন্দিরের বর্তমান চতুঃসীমা হচ্ছে পূর্ব্বদিকে বর্ধমান শহর (অর্থাৎ পৌর এলাকা) পশ্চিম দিকে রয়েছে কাঁটরাপোতা এবং বিরিটিকুরি গ্রাম। উত্তরে গোদা গ্রাম। দক্ষিণে বাঁকা নদী। মায়ের মন্দিরে পশ্চিম পাশে জি. টি. রোড বাইপাশ এবং জি. টি. রোড মিশেছে। একদিকে মাদার ডেয়ারী। অর্থাৎ সরকারী দুগ্ধকেন্দ্র। পাশে টি. ভি. রিলে কেন্দ্র। একটু এগিয়ে জি. টি. রোডের ওপারে ১০৮ শিবমন্দির, এধারে মহন্তঅস্থল। বর্তমানে যা বর্ধমান হোমিওপ্যাথি মেডিকেল কলেজও হাসপাতাল। কাঞ্চননগর, রথতলা এবং চারপাশে সবুজ ধান ক্ষেত। এখন এক মনোরম প্রাকৃতিক শোভা। শহরের কোলাহল থেকে গিয়ে বেশ কিছুক্ষণ নির্জনে মনকে হালকা করে নেওয়া যায়। এই অর্থে বলতে গেলে এটা বনভোজনের একটা জায়গা বা পিক্‌নিক্ স্পট্। অনেকে এখানে পিকনিক করতেও আসেন।

গোকুলানন্দ ব্রহ্মচারীর চার পুত্র ছিলেন। তারাপদ ভট্টাচার্য্য, মহেশ ভট্টাচার্য্য, গণেশ ভট্টাচার্য্য ও কার্তিক ভট্টাচার্য্য। আবার তারাপদ ভট্টাচার্য্যের পুত্র ছিলেন দুর্লভ ভট্টাচার্য্য (ভোলানাথ ভট্টাচার্য্যের পুরাতন নথি) অনেকে বলেন ঐ দূর্লভ ভট্টাচার্য্য দাদুর পঞ্চমুণ্ডির আসনে সাধনা করতেন। ওঁনারই নাম অনুসারে মায়ের নাম হয়েছে দুর্লভা মা। আবার অনেকের মতে ঐ গোকুলানন্দ ব্রহ্মচারীই মায়ের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। কথিত আছে সাধক গোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী একদিন পঞ্চমুণ্ডির আসনে বসে সাধনা করতে করতে মায়ের আদেশ পান যে "আমি এই পাশের ডোবায় রয়েছি, আমায় ঐ ডোবা থেকে তুলে প্রতিষ্ঠা কর এবং আমার পূজা কর"। তাঁরই আদেশমত ঐ সাধক মাকে ডোবা থেকে তুলে মায়ের প্রতিষ্ঠা করেন, এবং মায়ের পূজা করেন। "দুর্লভা" কথার অর্থ হলো মাকে সহজে পাওয়া যায় না। তিনি সহজলভ্যা নন। বহুদিন যাবৎ সাধনা করে যা পাওয়া যায় তাহাই দুর্লভ। তাই সাধক বহু সাধনা করে মাকে পেয়েছিলেন বলে তিনিই মাকে প্রতিষ্ঠা করে মায়ের নাম দেন, দুর্লভা মা। এখন চলতি ভাষায় 'দুল বালা' কালী নামে পরিচিত। সাধক 'কর্ত্তা বাবা' নামে পরিচিত। মায়ের মূর্ত্তির পিছনে আসল মূর্ত্তি আছে। আসল মূর্ত্তি শিলা বা পাথরের। একটি ছোট পিতলের সিংহাসনে মায়ের মাথার পিছনে স্থিত আছে। প্রত্যহ পূজার সময় ঐ মূর্ত্তি নামিয়ে পূজা করা হয়। ঐ মূর্ত্তিরএক খণ্ডকৃষ্ণ পাথরের গায়ে মায়ের চোখ, মুখ ও কান অল্প খোদাই করা। কাছ থেকে চোখ, মুখ ও নাক বেশ বোঝা যায়। বাকী অংশ অমসৃন পাথরের একটি তাল। যে মূর্ত্তি সবর্বসাধারণ দেখতে পান, তা ঢালাইয়ের মূর্ত্তি। পিতলের রঙে রঙ করা। আগে অষ্ট ধাতুর মূর্ত্তি ছিল। অনেক দিন আগেই চুরি হয়ে গেছে। বাউণ্ডারির ভিতরে দুটি শিব মন্দির, নারায়ণ বা বিষ্ণু মন্দির, মনসা মন্দির, তুলসি মঞ্চ , নাটমঞ্চ এবং

জিনিস পত্র রাখার একটি ঘরও আছে। বাউণ্ডারির পিছন দিকে অর্থাৎ মন্দিরের উত্তর পূর্ব্ব কোণে পঞ্চমুণ্ডির আসন আছে। সাধক গোকুলানন্দ ব্রহ্মচারীর সমাধি আছে। তার উপর একটি বেল গাছ আছে। পাশেই শিবা ভোগ দেবার জন্য একটি বাঁধানো জায়গা আছে। প্রতিদিন পূজা শেষে ঐ বেদীতে ভোগও প্রসাদ রাখা হয়। স্থানীয় শিয়ালরা প্রতিদিন ঐ ভোগ খেয়ে যায়। এখানে মায়ের পূজা ছাড়াও প্রায় তেত্রিশ কোটি দেব-দেবীর পূজা হয়। বৈশাখ মাসের সংক্রান্তির দিন যোগাদ্যা মায়ের পূজা হয় এবং ছাগ বলি হয়। প্রতি অমাবস্যা এবং পূর্ণিমায় আগে ছাগ বলি হতো। এখন দুর্গা পূজার অষ্টমী এবং নবমীতে ছাগ বলি হয়। কালি পূজার দিন খুব ধূমধাম করে মায়ের পূজা হয়। ছাগ বলি হয়। প্রতিদিন মায়ের ভোগ হয়। গোকুলানন্দ ব্রহ্মচারীর ভোগ হয় এবং আর একটি ভোগ হয় তার নাম 'শিবা ভোগ'। কথিত আছে মায়ের কাছে মানত করলে মা তার মনোস্কামনা পূর্ণ করতেন। যে সমস্ত মেয়েদের সন্তান হোতো না তারা নাকি মায়ের কাছে মানত করলে মা তাদের মনস্কামনা পূর্ণ করতেন। আরো কথিত আছে পাশের ডোবায় মেয়েরা এক ডুবে শামুক তুললে, পুত্র সন্তান জন্মাতো। তাই অনেকেই মায়ের কাছে সন্তানের জন্য মানত করত। "বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর" এই উক্তিটি ভালোভাবেই প্রযোজ্য এ প্রসঙ্গে।

একবার বর্ধমানের মহারাজা তেজচাঁদ বাহাদুর ১০৮ শিব মন্দির থেকে আসার পথে গোকুলানন্দ ব্রহ্মচারীর ওখানে নামেন এবং ওখানে দেখেন ব্রহ্মচারী সাধনায় মগ্ন। তখন রাজা প্রশ্ন করেন সাধক আজ কি তিথি বলতে পারেন, সাধকের মুখ থেকে উচ্চারিত হয়, আজ পূর্ণিমা তিথি। তখন রাজা বলেন, আজ অমাবস্যা তিথি, তখন সাধক সন্ধ্যায় মহারাজাকে অমাবস্যার দিন পূর্ণ চন্দ্র দেখান। এই পরিপ্রেক্ষিতে বর্ধমানের মহারাজা খুবই মুগ্ধ হন। তিনি মায়ের সুন্দর মন্দির প্রতিষ্ঠা করে দেন। ভোগের পূজা ও আর্চার জন্য একশত বিঘা জমি দেন। কিন্তু যে কোন কারণেই হউক মায়ের সে সম্পত্তি এখন আর নেই। মহারাজার তৈরী মন্দিরও জীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। বর্তমানে এক সেবাইত ভক্ত শ্রী ভোলানাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রায় এক লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করে এবং মায়ের মন্দিরে ভিতরে কিছু গাছ বিক্রি করে সেই টাকায় মায়ের মন্দির সংস্কার করেছেন। বর্তমানে ভোলানাথ ভট্টাচার্য্য মশাই প্রত্যহ সকালে মায়ের ভোগ রান্না করে নিজের চাকরীতে যান। মন্দিরের পরিবেশ এখন ভাল। এটি একটি বর্ধমানের দর্শনীয় স্থান। "পরিব্রাজক ভোলানাথ চন্দ্র ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে বর্ধমান ভ্রমণের সময় দুর্লভাকালীকেই বিদ্যাসুন্দর কালী বলে উল্লেখ করেছেন।" (বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি-তৃতীয়খণ্ড যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী পৃঃ-৩৫৪)

শ্রীশ্রী রাধাবল্লভ জীউ ঠাকুর বাড়ী

বর্ধমান মহারাজারা ছিলেন বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী। তাঁদের প্রতিষ্ঠিত এই দেব মন্দির বৈষ্ণব ধর্মের খুবই বিখ্যাত মন্দির। এই মন্দিরের রাধাবল্লভের যুগল মূর্ত্তি দর্শনে যে কোন বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বীর হৃদয়ে রাধা কৃষ্ণের লীলা প্রসঙ্গ পুনঃ জাগরিত হইবে। কৃষ্ণের কষ্টি পাথরের বংশীধারী মূর্ত্তি। পাশে শ্বেতপাথরের শ্বেতশুভ্র রাধিকার মূর্ত্তি যেন রাধা কৃষ্ণের যুগল মিলনের প্রতীক। রাধা কৃষ্ণের প্রেমের প্রতীক। প্রেম সৎ। প্রেম কবির কল্পনা নয়, প্রেম নিত্য সত্য সনাতন। যাহা সৎ, যাহা বিদ্যমান, তাহাই প্রেম। যাহা অসৎ অবিদ্যমান, তাহাতে প্রেম নাই। স্থিতিতেই প্রেম—প্রেমেই স্থিতি। প্রেম পালনী শক্তি, প্রেম রক্ষনী শক্তি। প্রেম বিষ্ণু—প্রেম বৈষ্ণব। তাই রাধা কৃষ্ণের প্রেম ও ঠিক ঐ রূপেরই প্রতিচ্ছবি। কদমতলে, তমালমূলে, যমুনাসলিলে, কোথায় না শ্রী রাধিকার কৃষ্ণোদ্দীপক ভ্রম ঘটিয়াছে! এই ত প্রেম--এই ত প্রেমের আদর্শ! এই শ্রী রাধিকার প্রেমের মাধুর্য সম্যক্ উপলব্ধি করিবার জন্যই নাকি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যরূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হয়ে ছিলেন। "সত্যং শিবং সুন্দরম্" অর্থাৎ যাহা সৎ তাহাতে সত্য, যাহা চিৎ তাহাতে শিব, যাহাতে আনন্দ তাহাতেই সুন্দর। তাই রাধা কৃষ্ণের লীলাও এরই উপর প্রতিষ্ঠিত। কি ঝুলন উৎসব, কি রাস উৎসব, কি দোলউৎসব—সবই ঐ নিষ্কাম প্রেমের প্রতীক রূপেই প্রতিষ্ঠিত।

প্রায় চল্লিশ বছর আগেও এই রাধাবল্লভ জীউর মন্দিরে সবরকম বৈষ্ণব ধর্মের উৎসব পালিত হতো খুবই জাঁক জমকভাবে। ভক্তরা মোহিত হয়ে এই সব উৎসবের রস গ্রহণ করত। কিন্তু এখন আর সে জৌলুস নেই। এখন নিয়ম রক্ষা মাফিক সব উৎসবই হয়।

বর্ধমান মহারাজার প্রাসাদ যাহা বর্তমানে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের পশ্চিমের রাস্তা ধরে কিছুটা গেলেই বর্ধমানের নূতনগঞ্জ এলাকা। ঐখানেই ইটালিয়ান স্থাপত্যে নির্মিত "বর্ধমান রাজ কলেজিয়েট স্কুল"। ঐ স্কুলের সোজা পশ্চিমে রাস্তা ধরে একটু এগিয়ে দুটি পাশাপাশি বিশাল দেবশালা। একটি রাধা বল্লভ জীউর মন্দির। অপরটি অন্নপূর্ণা এবং রাজরাজেশ্বর শিবের মন্দির। এই মন্দির সংলগ্ন অতিথিশালা, মেওয়াখানা, রাসমঞ্চ, গোলাবাড়ী, প্রভৃতির অবস্থিতি। অতীতে কি জাঁকজমক পূর্ণ ছিল এই অঞ্চল এবং বৎসরের সব সময় উৎসব লেগে থাকত। শ্রীশ্রী রাধাবল্লভ জীউর ঠাকুর বাড়ীর বাইরে সামনের রাস্তার দক্ষিণে, পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা কতকগুলি পাশাপাশি ঘর—সাধুখানা। এখানে সাধুরা এসে থাকতেন নিজেদের

খুশিমতো, আর প্রসাদ পেতেন দু'-বেলা। সকালে অন্ন-ভোগ রাত্রে গব্য ঘৃতের পুরী, হালুয়া মালপোয়া। কলকাতার টেরিটি বাজার, রাজা কাটরা এবং নতুন চীনা বাজার—এই তিন সমগ্র এলাকার যা কিছু সব এককালে শ্রীশ্রী রাধাবল্লভ জীউর সম্পত্তি ছিল। বেশ বড় এক চারকোণওলা শালপাতার ঠোঙ্গাভর্ত্তি অন্ন, সেই পরিমাণ তরকারি পরমান্ন—চার পয়সায় লভ্য ছিল।

রাধাবল্লভ জীউর মন্দিরের প্রবেশ পথের উপরে শ্বেত পাথরে খোদিত আছেঃ

"পঞ্চ বেদান্তৌধচন্দ্র—বিমিতে শাক-হায়নে।
কমলাদি—কুমারিতি শ্রুতয়া ভার্য্যায়াহন্বিতঃ।।
শ্রী মদ্ ভগবতঃ প্রীত্যৈ তেজচন্দ্র মহীপতি।
অস্তাপয়ৎ শক্তিসখং রাধা বল্লভ-বিগ্রহম।।"

"১৭৪২ শকাব্দে মহিষী কমল কুমারীর সহিত মহীপতি তেজচন্দ্র শ্রী মদ্-ভগবত-প্রীত্যর্থে সশক্তি রাধা বল্লভ-মূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন।" সুতরাং এখান থেকে স্পষ্ট যে, মহারাজ তেজচাঁদ বাহাদুর ১৭৪২ শকাব্দে রাণী কমল কুমারীর ইচ্ছায় এই রাধা বল্লভ বিগ্রহ মন্দিবের স্থাপন করিয়া প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

প্রথমেই সদর, সদরের উপরে খুব সুন্দর নহবৎ খানা। এরই উপরের অংশ হচ্ছে জগমোহন। সামনে ঢুকেই কোকিল ঘর। আগে এই ঘরে অনেক কোকিল থাকত। সদরে ঢুকে ঠিক পাশে আর একটি প্রবেশ পথ। এইটি মন্দিরে প্রবেশের পথ। বাঁদিকেই বর্ধমান মহাতাব ট্রাষ্ট কমিটির এ্যাড্‌মিনিষ্ট্রেটরের অফিস। এই ট্রাষ্ট কমিটির এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর হচ্ছেন মহারাজ কুমার ডঃ প্রণয় চাঁদ মহাতাব। উনি প্রত্যেক উৎসবেই উপস্থিত থেকে উৎসব পরিচালনা করেন। পাশেই মন্দিরের নিয়ম কানুন লিখিত দর্শনার্থীদের জন্য নির্দেশাবলি। তার পাশেই আর একটি ঘর। এই ঘরেই এই মন্দিরের অধিকারী শ্রী ব্রজকিশোর চট্টোপাধ্যায়ের অফিস। বিশাল মন্দির চত্বরের চারিদিকে চকমেলান দালান। বাঁ দিকের ঘরগুলিতে পূজারী এবং অন্যান্য মন্দিরের কাজে নিযুক্ত লোকেদের বাসস্থান এবং ডান দিকের ঘরগুলি দ্বিতল। দ্বিতলের ঘরগুলির জানালা কাঠের জাল দিয়ে ঢাকা। এর কারণ আগে মন্দিরে নানা রকমের সুন্দর সুন্দর অনুষ্ঠান হতো। ঐ রাজবাড়ীর অন্দর মহলের মহিলাদের ঐ সমস্ত অনুষ্ঠান দেখার জন্য ঐ রূপ ব্যবস্থা ছিল অর্থাৎ মহিলাদের দর্শনগৃহ ছিল। কারণ আগেকার দিনের মহিলারা পর্দানশিন ছিলেন। তখন এইটাই রীতি নীতি ছিল। বাঁ দিকের ভিতরে ভোগ ঘর এবং তৎসংলগ্ন প্রতিষ্ঠিত ইঁদারা। অফিস ঘরের ঠিক উত্তরে মন্দির চত্বর। তার দক্ষিণে সুন্দর নাটমঞ্চ এবং শ্বেত পাথরের চাতাল। এই নাট মন্দিরেই সমস্ত কিছু অনুষ্ঠান হতো এবং এখনও নামগান হয়। এই নাটমন্দির সংলগ্ন মূল মন্দির অর্থাৎ গর্ভগৃহ। একপাশে ভান্ডার অপর পাশে শয়ন কক্ষ।

সমস্ত মেঝের অংশ সুন্দর শ্বেত পাথর দিয়ে বাঁধান। এই গর্ভগৃহের সামনেই সুন্দর জলের ফোয়ারা ছিল। বর্তমানে উহা অকেজো অবস্থায় আছে। মন্দির পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সব সময় নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। গর্ভগৃহের ভিতরে সুন্দর সাজে সজ্জিত আছে বিগ্রহগুলি।

চাঁদির সিংহাসনে সুন্দরভাবে সাজান কালো কষ্টি পাথরের শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি। বংশীধারী মূর্ত্তি। শ্বেতপাথরের শ্বেত শুভ্র রাধিকা মূর্ত্তি। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সাজে সজ্জিত হয়। অষ্টধাতুর নির্মিত ষোড়শ গোপিনী দুই ধারে সুন্দর সাজ-সজ্জায় পরিবেষ্টিত। অষ্টধাতুর নির্মিত প্যারীমোহন যুগল মূর্ত্তি পাশে শোভা পাচ্ছেন। এই প্যারীমোহন মূর্ত্তি কৃষ্ণের অপর মূর্ত্তি নামে অভিহিত। এছাড়াও আছেন শ্বেত পাথরের বলরাম রেবতী মূর্ত্তি। অষ্টধাতুর তৈরী অষ্টসখী বিরাজমান। এছাড়া আছে তিনটি শালগ্রাম শিলা তিনটি ছোট ছোট রূপার সিংহাসনে মাথায় ছত্র লাগান, এবং গরুড় মূর্ত্তি। এছাড়াও আরো নানা বিগ্রহ রয়েছে এই গর্ভগৃহে।

রাধা বল্লভ বিগ্রহ দুটির গাত্রে তলদেশে দুটি নাম খোদিত। সেই দুটি নাম হচ্ছে "দাস তেজচন্দ্র", "দাসী হেম কুমারী"। একটি প্রবাদ আছে রাধাবল্লভ নাম দেওয়া কেন হলো। সাধারণত আমরা দেখি শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ চরণ অগ্রে থাকে এবং শ্রী রাধার বাম চরণ অগ্রে থাকে। কিন্তু এই মূর্ত্তির বৈশিষ্ট্য হলো শ্রীকৃষ্ণের ও দক্ষিণ চরণ অগ্রে এবং শ্রীরাধার ও দক্ষিণ চরণ ও অগ্রে। এটা হলো কেন না, যে শিল্পী ঐ মূর্ত্তি তৈরী করছিলেন তিনি প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি যথারীতি তৈরী করে ফেলার পর যখন শ্রীরাধার মূর্ত্তি তৈরী করছিলেন সেই সময় অসাবধানতা বশতঃ বা যে কোন কারণেই হোক শিল্পী মূর্ত্তির পদযুগল থেকে তৈরী করার সময় শ্রীকৃষ্ণের মত চরণ যুগল তৈরী করে ফেলেন। কারণ বিগ্রহের পদতল থেকে নির্মাণ করাই বোধ হয় বিধেয়। তারপর যখন সম্বিত ফিরে পান তখন আর পরিবর্তন করা সম্ভব নয় বিবেচনা করে বাকি অংশ শ্রীরাধিকা মূর্ত্তির করেন। এই রকম যুগল মূর্ত্তি খুবই কম দেখা যায় এবং নাম দেওয়া হয় "রাধা-বল্লভ"। এই রকম আর একটি রাধাবল্লভ মূর্ত্তি আছে এই মন্দির থেকে একটু পূর্ব দিকে বর্তমান রাজ কলেজিয়েট স্কুলের দক্ষিণে গোয়াল বাড়ীর বা শ্যাম সুন্দর জীউ মন্দিরের রাধাবল্লভ মূর্ত্তি।

রাধাবল্লভ বাড়ীতে কত অনুষ্ঠান যে হতো এবং সারা বছর উৎসব মুখর হয়ে থাকত। তবে সবচেয়ে বড় উৎসব হতো ঝুলন উৎসব। রাধাবল্লভ বাড়ীর ঝুলন ছিল অতি বিখ্যাত এবং আকর্ষণীয়। শ্রাবণী পূর্ণিমায় এই ঝুলন উৎসব। প্রথম দশদিন ঠাকুর বাড়ী খুব আকর্ষণীয় করে সাজান হতো না। কিন্তু শেষ পাঁচদিন— অর্থাৎ একাদশী থেকে পূর্ণিমার দিন পর্য্যন্ত মন্দির চত্বর আকর্ষণীয়ভাবে সাজান হতো এবং লোকে লোকারণ্য। কাছাকাছি গ্রাম থেকে আসতো নির্ভয়ে—কোনদিন

কোন গোলমালের আশঙ্কা তাদের মনে জাগেনি। কারণ তখনকার দিনে পরিবেশ ছিল শান্ত এবং ভদ্র। এই পাঁচ দিন ধরে কৃষ্ণযাত্রা থেকে আরম্ভ করে বহু ধর্মীয় অনুষ্ঠান এখানে হতো। বর্ধমানের জনসাধারণ বিনা দর্শনীতে এই সব উৎসব দেখার সুযোগ পেত। বিখ্যাত পালাকার বা গায়কের দর্শন লাভ হতো এবং তাঁদের অনুষ্ঠান দেখা বা শোনার সুযোগ হতো। এই রকম একজন বিখ্যাত কৃষ্ণযাত্রার গায়ক ও পালাকারের নাম নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়। তিনি প্রতি বৎসর এই রাধাবল্লভ বাড়ীতে পালাগান গাইতে আসতেন। এই নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধে একটু না বললে লেখা অসমাপ্ত থেকে যায়। বাংলা সন ১২৪৮ সালে ইংরাজী ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ৬ই মাঘ বর্ধমান জেলার দুর্গাপুরের নিকট ধবনী বা ধোয়াবনী গ্রামে তাঁর জন্ম। পিতা বামাচরণ, মাতা সরস্বতী। তাঁর এই পালাগানের খ্যাতির জন্য নীলকণ্ঠকেই "কণ্ঠ মশায়" বা কণ্ঠ কবি বলা হত। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব তাঁর গান শুনে মুগ্ধ হয়ে যেতেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব, হাটখোলার বারোয়ারী তলায় প্রথম নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের গান শোনেন এবং মুগ্ধ হয়ে যান। কাশীপুরের রাণী মা নীলকণ্ঠকে পুত্রবৎ স্নেহ করতেন। তিনি কাশীপুরের রাজার আর্থিক সাহায্যে নিজে যাত্রার দল গড়েন। তিনি কৃষ্ণযাত্রার জগতে এক যুগান্তর সৃষ্টি করেন। গান রচনায় তিনি যে সুর প্রবর্তন করেন তা নীলকণ্ঠের সুর নামে খ্যাত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎ চন্দ্র বসু, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, সাধক প্রবর শ্রীশ্রী বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, কেশব চন্দ্র সেন প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব ওঁনার গান শুনে মুগ্ধ হয়ে যেতেন। শান্তি নিকেতনের পৌষ মেলাতেও নীলকণ্ঠ যাত্রা গান করেছেন। এই কণ্ঠ কবি ছিলেন সে যুগের বিখ্যাত যাত্রা পালার স্রষ্টা গোবিন্দ অধিকারীর শিষ্য এবং বর্ধমান রাজবাড়ীতেই নীলকণ্ঠ গোবিন্দ অধিকারীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। সে বছর ছিল শ্রাবণ মাস। ঝুলন পর্ব উপলক্ষ্যে গোবিন্দ অধিকারী বর্ধমান রাজবাড়ীতে এসেছেন গাহনা করতে, তখন বর্ধমানের মহারাজা ছিলেন, মহাতাব চাঁদ। উনি গুণী ব্যক্তিদের খুব সমাদর করতেন। সীতারাম ঘোষাল নামক এক ব্যক্তির সহায়তায় গোবিন্দ অধিকারীর সহিত তাঁর পরিচয় হয়। অধিকারী মশাই নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের গান শুনে খুব মুগ্ধ হন এবং নীলকণ্ঠ মশাইকে মাসিক ১৬ টাকা মাস মাহিনায় নিজ দলে নিয়োগ করেন। এই রাজবাড়ী থেকেই নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের খ্যাতি সারা দেশে ছড়িয়ে পরে। বর্ধমানের শ্রীশ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ জীউ ঠাকুর বাড়ীতে একদিন গাহনা করার পর শ্রোতাদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় তার খ্যাতি আরো ছড়িয়ে পরে। তারপর থেকে এই আসর বাঁধা হয়ে যায়।

কথিত আছে একবার নীলকণ্ঠ বর্ধমান লক্ষ্মীনারায়ণ জীউ ঠাকুর বাড়ীতে গান গাইছেন পালাগানের আসরে, বেহালায় সুর দিচ্ছেন তাঁর গুরু গোবিন্দ অধিকারী।

স্বয়ং বর্ধমান রাজ সেদিন কোন কারণ বশতঃ আসতে পারেন নি আসরে, কিন্তু অলিন্দ থেকে গায়কের কণ্ঠ নিঃসৃত অপূর্ব সুর লহরী শুনে মহারাজ মহাতাব চাঁদ মুগ্ধ হয়ে দূরবীন দিয়ে দেখতে লাগলেন গায়ককে। তখন গুরু গোবিন্দ অধিকারী সেদিকে দৃষ্টি দিয়ে নীলকণ্ঠকে বললেন, ঐ দেখ তোমার গানের সুর মাধুর্যে পুলকিত মহারাজ তোমাকে দূরবীন দিয়ে দেখছেন। মহারাজার কৃপায় তোমার আর কোন দুঃখ থাকবে না। কৃষ্ণযাত্রা ও নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়—ডঃ যোগেশ চন্দ্র দত্ত। ১৯৭৬ (পৃষ্ঠাঃ—১০৬-১০৭)

বস্তুতঃপক্ষে এরপর থেকে রাধাবল্লব জীউ ঠাকুর বাড়ীতে নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের আসর বাঁধা হয়ে যায়। মহাতাব চাঁদ প্রতিবারেই তাকে নগদ ফুরান ছাড়াও সন্তোষজনক নগদ দক্ষিণা দিয়ে বিদায় করতেন। মহারাজ নীলকণ্ঠকে মাত্র ৩২ টাকা জমায় ২৩২ বিঘা জমি দান করেছিলেন। ফলে নীলকণ্ঠকে সংসারের কথা আর ভাবতে হয়নি। পুরোপুরিভাবে আত্মনিয়োগ করতে পেরেছিলেন কৃষ্ণযাত্রার পালাগানে। এরপর নীলকণ্ঠের পুত্র কমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় ও পিতার পালাগানের দলটি বজায় রেখেছিলেন এবং ওঁনার বর্ধমানের ঠাকুর বাড়ী বাঁধা ছিল। এ ছাড়াও বহু নাম করা যাত্রার দল আসত ঠাকুর বাড়ীতে ঝুলন উৎসবে গান শোনাতে।

জন্মাষ্টমীব্রত ও খুব ধুমধাম করে পালিত হতো। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম এবং কারাগার থেকে কৃষ্ণকে নিয়ে গোকুলে গমন প্রভৃতি সাজান হতো দর্শনার্থীদের জন্য। এছাড়া রাধা অষ্টমী ব্রত পালিত হতো। বিজয়া দশমীতে রাধা বল্লভ জীউর বিজয়যাত্রা। আশ্বিন মাসের পূর্ণিমাতে শ্রীশ্রী জীউদিকের প্রথম শরৎ যাত্রা উৎসব, প্রতিপদ থেকে কার্ত্তিক পূর্ণিমা পর্যন্ত কার্ত্তিক কৃত্য। ঐ প্রায় এক মাস যাবৎ শ্রীশ্রী রাধাবল্লভ জীউর ঠাকুর বাড়ীতে রামায়ণ গান হতো। কত নাম করা রামায়ণ গায়ক যে এই ঠাকুর বাড়ীতে আসতেন এবং রামায়ণ গান গাইতেন। তাঁদের মধ্যে দুই-একজনের কথা আমি উল্লেখ করছি। যেমন বিখ্যাত রামায়ণ গায়ক ফকির চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় আসতেন। তাঁরও আসর বাঁধা ছিল। উনি একবারে দাঁড়িয়ে নেচে নেচে, লাফিয়ে লাফিয়ে রামায়ণ গাইতেন। ঐ সমস্ত অনুষ্ঠানের বৈশিষ্ট্যই আলাদা ধরণের ছিল। এছাড়াও আর একজনের আসর বাঁধা ছিল। তাঁর নাম ফেলারাম বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি খুব ভাল রামায়ণ গান গাইতেন। তারপর রামায়ণের আসর জমিয়ে রাখতেন ফকির চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রীবিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ে—বেতার শিল্পী ও দূরদর্শন শিল্পী। তাঁর সুরেলা গলায় রামায়ণের আসর একেবারে জমিয়ে রাখতেন এবং দর্শকেরা মুগ্ধ হয়ে তাঁর গান শুনতেন। কার্ত্তিক কৃষ্ণা দ্বিতীয়াতে শ্রীশ্রী জীউদিগের দ্বিতীয় শরৎ যাত্রা পালিত হতো। শ্রীশ্রী শ্যামা পূজার পরদিন প্রতিপদে গোবর্দ্ধন পূজা হয় এবং অন্নকূট হয়। রাধাবল্লভ এবং প্যারীমোহনের বনবিহার বিবাহোৎসব

হতো পৌষ মাসের প্রতিপদ থেকে মাঘ মাসের দ্বিতীয়া অবধি খিচুড়ি ভোগ হতো। প্রতিপদ থেকে মাঘী পূর্ণিমা পর্য্যন্ত মাঘ কৃত্য। ঐ একমাস রাধাবল্লভ জীউর বাড়ীতে ভাগবত কথা হতো। জীতেন্দ্র নাথ গোস্বামীর মতো প্রথিতযশা ব্যক্তিত্ব এই ভাগবত পাঠে অংশ গ্রহণ করতেন। ফাল্গুনি পূর্ণিমায় শ্রীশ্রী রাধাবল্লভ জীউর দোলযাত্রা উৎসব ধুম-ধামের সাথে পালিত হতো। চৈত্র মাসের প্রতিপদ থেকে বৈশাখী পূর্ণিমা পর্য্যন্ত বৈশাখ কৃত্য অনুষ্ঠিত হতো। এছাড়াও রাস পূর্ণিমায় রাসযাত্রাও খুব ধুম-ধামের সাথে পালিত হতো এবং এখন ও হয়। রাস উৎসবের জন্য রাধাবল্লভ বাড়ীর ঠিক রাস্তার উল্টোদিকে প্রায় মন্দির সংলগ্ন সুন্দর রাসমঞ্চ। সামনে নাটমঞ্চ। ঐ ঠাকুর বাড়ীটি রাসবাড়ী নামে খ্যাত। রাস-পূর্ণিমার দিন রাধাবল্লভ বাড়ী থেকে রাধাবল্লভ জীউ এবং প্যারীমোহন জীউের বিগ্রহ ঐ রাসমঞ্চে নিয়ে যাওয়া হয় এবং রাস উৎসব পালিত হয়। তাছাড়াও ঐ রাসমঞ্চে তরুন মুখার্জী নামে এক শিল্পীর তৈরী রাধা-কৃষ্ণ মূর্ত্তি আছে এবং প্রত্যহ তাঁর পূজা হয়।

এই রাধাবল্লভ বাড়ীতে এখনও প্রায় বৈষ্ণব ধর্মের সব উৎসবই অনুষ্ঠিত হয়। বর্ধমানের মহারাজারা তাদের জমিদারী অঞ্চল, কি শহর, কি গ্রামগঞ্জে, দেবতা প্রতিষ্ঠা করে সাধারণ মানুষকে দেব সেবার মাধ্যমে মানব সেবায় উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। জমিদারী উচ্ছেদের ফলে সেই ধারা প্রায় স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তবুও মহারাজাধিরাজ উদয় চাঁদ তাঁর কনিষ্ট পুত্র ডঃ প্রণয় চাঁদ মহাতাবকে দেব সেবার ভার দিয়েছেন। সকলে ডঃ প্রণয় চাঁদ মহাতাবকে "বর্ধমান মহাতাব ট্রাষ্ট" গঠন করে এ্যাডমিনিষ্ট্রেটারের পদে নিয়োগ করেছেন যাতে বর্ধমানরাজের অতীতের দেব সেবার হৃত গৌরব ফিরে আসে। ডঃ প্রণয় চাঁদ মহাতাব ও চেষ্টা করছেন বর্ধমানরাজের দেব সেবার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন সময়ের অনুষ্ঠান যেন সারা বৎসর ব্যাপী চলে এবং বর্ধমান শহরকে অতীতের ন্যায় উৎসব মুখর করে রাখে। ডঃ প্রণয় চাঁদ মহাতাব ও বর্ধমান ঠাকুর বাড়ীর ঝুলন, জন্মাষ্ঠমী, রাসলীলা, শিবরাত্রি দিন বিজয়নন্দ বিহারে উৎসবে এবং চৈত্রমাসে লক্ষ্মী নারায়ণজীর বাড়ীতে দুর্গাপূজা, বাসন্তী পূজা, রাম নবমী প্রভৃতি অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে ঐ সমস্ত উৎসবগুলি পরিচালনা করেন। তিনি চেষ্টা করছেন বর্ধমান রাজের দেব সেবার অতীত গৌরব যেন পুনরায় ফিরে আসে।

কলকাতার রাজা কাটরা, টেরিটি বাজার এবং নূতন চীনা বাজার মহারাজ তেজচাঁদ ক্রয় করেছিলেন। এই তিন সম্পদ এবং আরো অনেক সম্পত্তি মহারাজ তেজচাঁদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রী রাধাবল্লভ জীউর নামে দেবোত্তর করা ছিল। শ্রীশ্রী রাধাবল্লভ জীউ প্রতিষ্ঠা করে তেজচাঁদ বাঁকা নদীর উপর পুল তৈরী করেছেন। ঐ পুলটি রাধাগঞ্জের পুল নামে খ্যাত। বাঁকা নদীর অপর পাড় হতে যাতে জনসাধারণের রাধাবল্লভ দর্শন এবং পূজা দেওয়া সহজ হয়।

কঙ্কালেশ্বরী কালী

বর্ধমান রেল-স্টেশন হতে প্রায় আট কিলোমিটার পশ্চিমে কাঞ্চননগরের এক প্রান্তে রয়েছে কঙ্কালেশ্বরী কালী বাড়ী। অর্থাৎ বর্ধমান মহন্তঅস্থল, বাঁকা নদীর ব্রীজ পার হয়ে রথতলা। এই রথতলা থেকে আরো দক্ষিণ পশ্চিমে দামোদর নদীর ক্যানেলের ব্রীজ পার হয়ে কাঞ্চ ননগর। কাঞ্চননগর পল্লীই পুরাতন বর্ধমানের বাণিজ্যের স্থান ছিল। এই কাঞ্চনগরের ছুরী, কাঁচি প্রসিদ্ধ ছিল। এখন বর্ধমান রেলস্টেশন থেকে সোজা টাউন সার্ভিস বাসে যাওয়া যায়। মন্দিরের কাছে আগে গভীর জঙ্গল ছিল এবং তখন ঐ জঙ্গলে বাঘ থাকত। এখনও মন্দিরের চারপাশ বেশ ফাঁকা। কাঞ্চ ননগরের ঐতিহ্যের সাথে দেবী কঙ্কালেশ্বরীর সম্পর্ক দীর্ঘকালের। কঙ্কালেশ্বরীর দেবীমূর্ত্তি খুব প্রাচীন। এই দেবী মূর্ত্তির প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। মন্দিরেরও যেটুকু টেরাকোটার কাজ আছে তা দেখে বোঝা যায় বহু প্রাচীন এই মন্দিরও। কঙ্কালেশ্বরী মন্দিরে জোড়বাংলো পদ্ধতির অলংকরণ ও কারুকার্য মন্দিরের প্রাচীনত্বের দিকটিকে তুলে ধরে।

অদ্ভুত এই কালীমূর্ত্তি। এখানে মা কঙ্কালরূপিনী। এটি একটি অষ্ট ভুজা চামুণ্ডা মূর্ত্তি। মূর্ত্তিটি উচ্চতায় প্রায় ৬ ফুট। কালীর এই চামুণ্ডা রূপটি অনেকেই বৌদ্ধ চামুণ্ডা রূপ বলেন। আবার অনেকের মতে এই মূর্ত্তি বৌদ্ধ আমলে তৈরী। এই মূর্ত্তি দেখলে মনে হবে যেন পাথরের উপরে মানুষের দেহের কঙ্কালের মতন। কঙ্কাল সার মূর্ত্তি মানব দেহের শিরা, উপশিরা, ধমনীর প্রত্যেকটি বেশ নিখুঁতভাবে খোদাই করা। ভয়ঙ্কর এই রূপ। এই রূপ দেখে ভক্তরা ভয়ার্ত চিত্তে ভক্তি জানাতে ভোলে না। যে শিল্পী এই মূর্ত্তি পাথরের উপর খোদাই করেছিলেন তাঁর মানব দেহ সম্বন্ধে কি গভীর জ্ঞান ছিল। নতুবা এই মূর্ত্তি খোদাই করা সম্ভব নয়। একটি কালো পাথরের খোদাই করা এই মূর্ত্তির পদতলে শায়িত অবস্থায় আছেন মহেশ্বর। মায়ের চরণের দুই ধারে দণ্ডায়মান দুটি মূর্ত্তি। মায়ের দক্ষিণ দিকে উলঙ্গ নারী মূর্ত্তি এবং বাম দিকে পুরুষ মূর্ত্তি কাঁধে মৃত দেহ নিয়ে। মায়ের মস্তকের উপর ভাগে একটি হস্তি, গলায় ঝুলছে নরমুণ্ডের মালা। এরকম ভাস্কর্যশিল্পের নিদর্শন খুব কমই দেখা যায়। মন্দিরের ভিতরে মায়ের মূর্ত্তির পাশে আর একটি খোদাই করা মূর্ত্তি আছে। এটি হচ্ছে রাধা কৃষ্ণের মূর্ত্তি। এছাড়াও একটি সূর্য্য মূর্ত্তি এবং একটি নারায়ণ শিলা ছিল। মূল মন্দিরের পাশে একটি ঘর আছে। বর্তমানে ঐ ঘরটিতে বর্তমান মিশনের অফিস ঘর এবং বর্তমান স্বামিজী থাকেন। স্থাপত্য শিল্পের দিক থেকে মা কঙ্কালেশ্বরী

মূর্তিও মন্দির দর্শনার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কালো পাথরের উপর ভাস্কর্য্য শিল্পের জীবন্তরূপ কঙ্কালেশ্বরী মূর্তিটিতে খুব ভালভাবেই প্রতিফলিত হয়েছে।

মন্দির দক্ষিণমুখী এবং তারই উত্তরে আটচালা বা নাট-মন্দির। এখানে ভক্তরা এলে নামগান করেন। মন্দিরের পশ্চিমে একটি বেলগাছ এবং তার তলায় একটি কালো পাথরের শিবলিঙ্গ। শোনা যায় আর একটি শিবলিঙ্গ ছিল। কারণ ঐ বেল গাছের পাশে আছে তন্ত্র সাধনার ও পঞ্চমুণ্ডির আসন। তার পাশেই দুটি ছোট ছোট শিব মন্দির। ঐ দুটি মন্দিরেই দুটি শিবলিঙ্গ ছিল। বহু তান্ত্রিক সাধক এখানে তন্ত্র সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে আসতেন। মায়ের মন্দির ও প্রায় আড়াইশ বছরের প্রাচীন। এটি একটি নবরত্ন মন্দির এবং এই নবরত্ন মন্দিরেই মা অধিষ্টতা আছেন। মন্দিরের উপরে একটি ছোট পাথরে খোদিত আছে "শ্রীশ্রী সর্ব্ববিদ্যা মন্দির", উত্তম আশ্রম। আমার মনে হয় উত্তম আশ্রমের স্বামিজীরা মন্দির সংস্কার করে ঐ নাম দিয়েছেন। কারণ বাংলার ১৩২৪-২৫ সালে কমলানন্দ স্বামী নামে একজন স্বামিজী এসেছিলেনে উত্তম আশ্রম থেকে। তিনি বর্ধমান শহরের বেশ কিছু ব্যক্তির নিকট হতে সাহায্য নিয়ে মন্দিরের সংস্কার করেন এবং আরো অনেক কিছু সেবা মূলক কাজ করেন। বাংলার ১৩৩০ সালে তিনি হরিসভা প্রতিষ্ঠার জন্য বর্ধমানে বাস করেন এবং খুব সম্ভবত তিনি বাংলার ১৩৩৩ সালে দেহত্যাগ করেন।

কঙ্কালেশ্বরী সম্বন্ধে প্রবাদ আছে যে, বাংলার ১৩২০ সালে বর্ধমানে ভয়ঙ্কর বন্যা হয়। এই ১৩২০ সালের বন্যায় দামোদর নদে প্রচন্ড প্লাবন হয়। এত প্রকট এই বন্যা হয় যে জনসাধারণের কাছে একটা বিভীষিকার রূপ নেয় এবং এই বন্যা বিশ সালের বন্যা নামে খ্যাত। এই বন্যায় মায়ের মূর্ত্তি ভেসে এসে মুসলমান অধ্যুষিত চৌধুরী দহে বর্তমান নাম কালীদহে এসে উল্টোভাবে পড়েছিল। তারপর রজকেরা ঐ পাথরের উপর কাপড় কাচার জন্য ব্যবহার করে। এইভাবে ঐ মূর্ত্তির উপর কাপড় কাচা চলতে থাকে। বাংলা সনে ১৩২৩ সালে আষাঢ় মাসে ভূমিকম্পে তালবোনার পাশে ঐ দহেতে ফাটল ধ্বসে পরে ঐ পাথর উল্টে গিয়ে মায়ের মূর্ত্তি বার হয়। তখন মুসলমান পাড়া, তেলিপাড়া, মালিপাড়া, তালবোনার বাসিন্দাগণ এই সংবাদ বর্ধমান মহারাজার গোচরে আনেন। বর্ধমান মহারাজা সপারিষদ ঐ স্থানে উপস্থিত হন এবং মায়ের ঐ ভয়ঙ্কর রূপ দেখে আশ্চর্য্য হয়ে যান। তারপর বর্ধমান মহারাজাই মায়ের ঐ ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি আষাঢ় মাসের উল্টো রথের দিন ঐ মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন। খুব সম্ভব ঐ মন্দিরটি বিষ্ণু মন্দির ছিল। তারপর মহারাজা ঐ অঞ্চলের কিছু জমি, বাগান প্রভৃতি স্থানীয় বাসিন্দাদের দিয়ে তাঁদেরই মায়ের সেবাইত করে দেন। এইভাবে মায়ের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

মায়ের প্রথম পূজক গোকুল চক্রবর্তী এবং কিছুদিনের মধ্যেই পূজারী নিযুক্ত

হন ভূষণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়। তারপর পূজারী হন সবের্বশ্বর ভট্টাচার্য্য। এর পরই স্বামী কমলানন্দ আসেন উত্তম আশ্রম থেকে এবং তিনিই বর্তমান মন্দিরের সংস্কার করেন। ঐ স্বামীজির আমলে বহু ভক্ত এবং লোক জন মায়ের মন্দিরে আসত। উনিই অনাদি ভট্টাচার্য্যকে পূজারী হিসাবে নিযুক্ত করেন। এই মন্দিরের সব খরচা বহন করতেন। তিনি বর্ধমান হরিসভা প্রতিষ্ঠা করেন। স্বামী কমলানন্দের পর আসেন স্বামী বিরাজানন্দ এবং তিনিই দেখাশুনা করতেন। বর্তমান স্বামীজির নাম মাধবানন্দ মহারাজ। ইনি পরমানন্দ মিশনের স্বামীজি। মায়ের নিত্য পূজা হয়। প্রতি অমাবস্যার আগে ছাগ বলি হতো। প্রতি অমাবশ্যায় মায়ের পূজা হয় এবং বাৎসরিক কালী পূজার দিন মায়ের ধুম-ধাম করে পূজা হয়। বহু ভক্ত মায়ের কাছে আসেন। বহু সাধক মায়ের কাছে আসেন মায়ের দর্শন লাভের জন্য।

শক্তিবিবি ঠাকুর বাড়ী

বর্ধমান রাজবাড়ীর অর্থাৎ বর্তমান বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণে পায়রাখানা গলির দক্ষিণ ভাগে এবং বর্ধমান রাজ কলেজিয়েট স্কুলের পূর্ব্বে শক্তিবিবি ঠাকুর বাড়ী অবস্থিত। মহারাজ বিজয়চাঁদ মহাতাবের পিতা বনবিহারী কাপুরের কনিষ্ঠা কন্যা শক্তি দেবী ১৩৩৭ সালে এই বিশাল মন্দির নির্মাণ করে শ্রীশ্রী রাধারমণ জীউ ও শক্তি দুলাল গোপাল জীউ প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রধান প্রবেশ পথ উত্তরমুখী। ঐ প্রবেশ পথের ঠিক উপরে ছিল শ্বেত পাথরের শ্রীশ্রী সিদ্ধি দাতা গণেশ মুর্ত্তি। কিন্তু এখন সেই মূর্ত্তি বিলুপ্ত। প্রবেশ পথের বাঁ দিক এবং ডান দিকে নিম্ন লিখিত শিলা লিপি খোদিত আছে। ডান দিকের মাথায় খোদিত আছেঃ—

বর্ধমানের লোক পূজিত স্বর্গগত মহামান্য
রাজা বনবিহারী কপূর
ও তদীয় স্বাধবী স্ত্রী প্রণবদেয়ী দেবী কনিষ্ঠাত্মজা
স্বর্গীয় গুরান্ দিত্বা মেহেরা বাবুর সহ-ধর্ম্মিনী শ্রীমতি শক্তিদেয়ী
এই সংসার অসার বিবেচনায় নিজ পিতা-মাতার শ্রী চরণাশীর্ব্বাদে
পুত্র তুল্য শ্রী "শক্তি দুলাল" গোপাল জীউ ও শ্রী রাধারমন জীউ
বিগ্রহ দ্বয় প্রতিষ্ঠিত করিলেন।
ইতি সন ১৩৩৭—২২শে বৈশাখ।

বাঁ দিকের মাথায় খোদিত আছেঃ—

ওঁ তৎসৎ
শ্রী রাধারমন জীউ ও শক্তিদুলাল গোপাল জীউ প্রতিষ্ঠা
রাজশ্রী বর্ধমানৌ নৃপকুল মাহিতৌ বর্ধমানে পুরেহস্মিন্
অত্তৌ স্বর্গৎ গভৌ মে "প্রণব—বনবিহারী" তি নম্নো প্রসিদ্ধৌ।
কন্যাহং তৎ স্বরসহ সকলখবরজ শক্তিদেয়ীতি সঙ্গ।
বীক্ষা সারং বিরক্তা ধনজন ভবনে "শ্রী: গুরান্ দিত্বা" ভার্য্যা।।
শাকে পক্ষশনষ্ট সোম বিমিতে রাধে দ্বি পক্ষ প্রমে
শ্রী রাধারমনং সু বিগ্রহ বরং সর্বৈব্ব কমোক্ষপ্রদম্।
শ্রী রাধা সহিতং প্রতিষ্ঠিত তবতী পিত্রা প্রদত্তৈ ধনে।।
গোপালঞ্চ তথা সুতো প্রমনক "শক্তিদুলালাভিধম"।। ।।

শক্তি দেয়ী দেবীর আষাঢ় মাসের ষষ্ঠী তিথিতে জন্ম এবং ১৩ই আষাঢ় জন্ম দিন। জহ্নু সপ্তমীতে শ্রীশ্রী রাধারমন জীউ ও শ্রীশ্রী শক্তিদুলাল জীউর সালগেরা হতো। বনবিহারী কাপুরের এবং প্রণব দেয়ী দেবীর এক পুত্র এবং দুই কন্যা ছিলেন। পুত্র-হলেন রাজা বিজয়চাঁদ মহাতাব এবং দুই কন্যা হলেন জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রী শ্রীদেয়ী দেবী এবং কনিষ্ঠা কন্যা শক্তিদেয়ী দেবী। বিজয়চাঁদের পূর্বনাম ছিল বিজনবিহারী কাপুর। সুজনবিহারী কাপুর নামে বনবিহারীর এক পুত্র ছিল। তাঁকেই দত্তক নেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু দত্তক নেওয়ার আগেই সুজনবিহারী মারা যায়। যেহেতু বিজনবিহারী বনবিহারী কাপুরের একমাত্র ছেলে তাই তিনি পুত্রকে দত্তক দানের আগে কতকগুলি শর্ত আরোপ করেছিলেন। যেমন, পুত্র সাবালক না হওয়া পর্যন্ত বনবিহারী পুত্রের অভিভাবক থাকবেন। তারপর আর একটি শর্ত হলো পুত্র সাবালক না হওয়া পর্যন্ত নব মাতার সাথে যতদিন না সহজ হতে পারেন ততদিন তিন ঘন্টা থাকবেন নব মাতার কাছে এবং বাকী সময় থাকবে পিতার কাছে। আর একটি প্রধান শর্ত হলো বিজনবিহারী তার ভগিনীদের সাথে যোগাযোগ রাখতে পারবেন—তাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করা চলবে না। অর্থাৎ ভাই বোনের মতই থাকবে। এই দৃষ্টান্ত তুলে ধরার কারণ হলো বিজয়চাঁদ রাজা হবার পরও বোনেদের সাথে মধুর সম্পর্ক ছিল। স্ত্রী বিয়োগের পর রাজা বনবিহারী আর বিবাহ করেন নাই। পুত্র মহারাজা বিজয়চাঁদ মহাতাব এবং কন্যাদ্বয় শ্রীদেয়ী দেবী এবং শক্তিদেয়ী দেবীকে নিয়ে সুখে জীবন যাপন করেন। কলিকাতা নিবাসী শালগ্রাম খান্নার পুত্র লালা শ্যামল দাস খান্নার সহিত জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীদেয়ী দেবীর এবং অমৃতসর নিবাসী বাসুমল মেহারার পুত্র গুরাঁনদিত্তামল মেহেরার সহিত কনিষ্ঠা কন্যা শক্তিদেয়ী দেবীর বিবাহ দেন। খোদিত শিলালিপি থেকে বুঝতে পারা যায় শক্তিদেয়ী দেবীর সাথে বাবা মার তো বটেই এমন কি মহারাজার ও সম্পর্ক খুবই ভাল ছিল। এও বুঝতে পারা যায় যে শক্তিদেয়ী দেবী এবং গুরান্ দিত্বা মেহেরার কোন সন্তান না থাকায় পুত্রতুল্য শ্রী "শক্তিদুলাল" গোপাল জীউ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অর্থাৎ যে গোপাল জীউ প্রতিষ্ঠা করেছেন তাঁকে তাঁর পুত্র হিসাবেই প্রতিষ্ঠা করেছেন।

প্রবেশ পথের পর মন্দির চত্বর। দক্ষিণমুখী মূল মন্দির বা গর্ভগৃহ, সুন্দর মন্দির। মন্দিরের মেঝেতে শ্বেত পাথরের টালি বসান। মূল মন্দিরের সামনে শ্বেত পাথরের টালি বসান টানা বারান্দা। মূল মন্দিরে এই কথা কটি "শ্রীশ্রী রাধারমন জীউ" সেবক-সেবিকা—

গুরান্ দিত্বা মেহেরা ও শ্রীমতি
শক্তিদেয়ী দেবী—পাথরের উপর লেখা আছে।

তার সামনে বিরাট নাটমঞ্চ ।এই নাটমঞ্চে অতীতে ভাল ভাল সব অনুষ্ঠান হতো। কৃষ্ণযাত্রা থেকে শুরু করে রামায়ণ, ভাগবত, প্রভৃতি অনুষ্ঠান বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠিত হতো। নাটমঞ্চে র পশ্চিমে প্রতিষ্ঠিত ইঁদারা এবং সুন্দর একটি ছোট রাসমঞ্চ ।ভারী সুন্দর এই রাসমঞ্চ ।রাসের সময় এই মঞ্চেই রাস উৎসব পালিত হতো। সামনে বসত্ বাড়ী। এই বাড়ীতেই থাকেন বর্তমান সেবাইতেরা অর্থাৎ শক্তিদেয়ী দেবীর জ্যেষ্ঠা ভগিনী শ্রীদেয়ী দেবীর বংশধরেরা। খুব সুন্দর এই মন্দির।

মন্দিরের ভিতরে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত আছেন শক্তিদেয়ী দেবী প্রতিষ্ঠিত শ্রী রাধারমন জীউ অর্থাৎ রাধা কৃষ্ণের বিগ্রহ। এই বিগ্রহ অষ্টধাতুর তৈরী। অষ্টধাতুর তৈরী অষ্ট সখী ঐ বিগ্রহ পরিবৃত্ত করে আছে। পাশের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত শক্তিদেয়ী দেবীর প্রতিষ্ঠিত পুত্রতুল্য বেশ বড় আকারের গোপাল জীউ। এটিও অষ্টধাতুর তৈরী। এছাড়াও মন্দিরের আর একটি সিংহাসনে অপর একটি রাধা কৃষ্ণের বিগ্রহ এবং পাশে আর একটি গোপাল সিংহাসনে স্থিত আছে। এছাড়াও অষ্টধাতুর গৌর নিতাই, গরুড়বিগ্রহ, বড়াই বুড়ি, বলরাম এবং অন্যান্য আরো অষ্টধাতুর বিগ্রহ এই মন্দিরে পূজিত হন। ছোট একটি সংহাসনে স্থিত আছেন নারায়ণ শিলা। নিত্য পূজা হয় বেশ নিষ্ঠা সহকারে। তবে আগেকার সেই জৌলুস আর নেই। বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে খুব জাঁক জমক ভাবে অনুষ্ঠিত হয়। যেমন, ঝুলন উৎসব, জন্মাষ্টমী উৎসব, রাস উৎসব, দোল উৎসব—অর্থাৎ বৈষ্ণব ধর্মের সমস্ত প্রকার উৎসবই এখানে অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রীশ্রী ফৌজদারী কালী

বর্তমান বর্ধমান শহরের কেন্দ্র বিন্দু বিখ্যাত খোসবাগান অঞ্চলে ফৌজদারী কালী মায়ের মন্দির এবং রাজ রাজেশ্বর শিব মন্দির। রাজ বংশানুচরিতে রাখাল দাস মুখোপাধ্যায় ৩৩ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত আছে রাণীসায়রের পশ্চিম পার্শ্বে কীর্তিচাঁদের বনিতা রাজরাজেশ্বরী, রাজরাজেশ্বর শিব প্রতিষ্ঠা করেন। খোসবাগান সম্বন্ধে পরিচয়ের কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। বর্তমান খোসবাগান অঞ্চলে বাস করেন বর্ধমানের বিত্তশালী এবং বিখ্যাত সমস্ত ডাক্তার, নার্সিং হোমের মালিক এবং ওষুধের ব্যবসাদার। সুতরাং এ অঞ্চল বর্ধমান শহরের একবারে প্রাণকেন্দ্র। এই অঞ্চলে এত বেশী ডাক্তার কেন্দ্রীভূত, বোধ হয় আর কোথাও এক জায়গায় এত ডাক্তার কেন্দ্রীভূত হয় নাই। সেই দিক থেকেও খোসবাগান অঞ্চলের প্রসিদ্ধি। বিশাল বিশাল ডিগ্রীদারী সমস্ত ডাক্তারের চেম্বার, বিশাল বিশাল নাসিং হোম, স্ক্যান সেন্টার, প্যাথলজিক্যাল লেবরেটরি, এক্স-রে-ক্লিনিক ইত্যাদি ইত্যাদি মাকে পরিবেষ্টিত করে রয়েছে। এই অঞ্চল সব সময় প্রাণচঞ্চল। কয়েক বছর পূবের্বও এই অঞ্চলের এত প্রতিপত্তি ছিল না। আমরা ছোটবেলায় দেখেছি খোসবাগানের মোড় থেকে সোজা রাস্তা ধরে একবারে মোরাদপুরের মোড় পর্যন্ত ফাঁকা ছিল। বছর তিরিশ পঁয়তিরিশের আগেকার খোসবাগান এবং বর্তমান খোসবাগান অঞ্চল সম্পূর্ণ ভিন্ন।

মায়ের মন্দির ছোট হলে কি হবে বহু ভক্তে সমাগম এখানে হয়। বর্তমানে মায়ের মন্দির মোজাইক করা এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। পাশেই রয়েছে রাজ রাজেশ্বর শিবের মন্দির। মায়ের নিত্য পূজা হয়। বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে যেমন, বাৎসরিক কালীপূজা, শিব রাত্রি, নীল ষষ্ঠী ইত্যাদি ইত্যাদি অত্যন্ত ধুম-ধাম করে মায়ের পূজা হয়। বহু ভক্তের সমাগম হয়। আধুনিক বৈদ্যুতিক আলোয় ঐ অঞ্চল সাজান হয় এবং ভাল ভাল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। ঐ অঞ্চল সব সময় জম-জমাট থাকে। মা খুবই জাগ্রতা। অনেকেই মায়ের কাছে নিজেদের মনস্কামনার কথা নিবেদন করেন। মাও তাদের মনস্কামনা পূর্ণ করেন।

রাজরাজেশ্বর শিবতলা ও তার চারি পাশের অঞ্চল অতীতে "বাগদী পাড়া" নামে খ্যাত ছিল। তারও কিছু ইতিহাস আছে। তখন বর্ধমানের মহারাজা রাজবাড়ীর প্রয়োজনে মাসে অন্ততঃ একবার কালনার গঙ্গা থেকে গরুর গাড়ীর মারফৎ গঙ্গা জল আনতেন। সেইসব গাড়ীর মালিকেরা এই অঞ্চলে বর্ধমান রাজ প্রদত্ত ভূখণ্ডে

নামমাত্র খাজনায় বসবাস করতো। এছাড়াও অনেক রাজকর্মচারী রাজ দপ্তরের বিভিন্ন বিভাগে যেমন, পূর্ত, চিড়িয়াখানা, হাতিশালা, গোশালা প্রভৃতিতে কাজ করতো। তারাও রাজার অনুমতিতে এখানে বসবাস করতো। তখন বর্ধমান পৌরসভার অধিকারের বাহিরেও বর্ধমান মহারাজার নিজেদের ব্যবহারের জন্য বর্ধমান শহরের কতকগুলি রাস্তা নিজেদের তত্ত্বাবধানে রাখতেন। খোসবাগানের বর্তমান রামকৃষ্ণ রোড্ তখন গাবতলার রাস্তা বলেই পরিচিত ছিল। ঐ রাস্তার দুই-ধারে ঐ সমস্ত বর্গক্ষত্রীয় প্রজারা বাস করত।

১৩৪৫ সালের পূর্বে ফৌজদারী কালীমা বাগদী পাড়ার কালী রূপে পূজিতা হতেন। সে সময় খোসবাগানের যে কয়েক ঘর অধিবাসী ছিলেন তাঁরা সকলেই স্বেচ্ছায় চাঁদা দিতেন। চাঁদার পরিমাণ ছিল চার আনার মধ্যে। এই পূজার পথিকৃৎ ছিলেন গৌরী ঠাকুর, নরেন ঠাকুর, অবিনাশ মাঝি, সনাতন মাঝি ও দুখীরাম পরামানিক প্রভৃতি। তাঁরাই প্রতিমা আনয়ন থেকে শুরু করে পূজা পরিচালনা, মার নিরঞ্জনের ব্যবস্থা করতেন। তখন তথাকথিত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় এতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতেন না। যেস্থানে এখন মায়ের পূজা হয় ঐ স্থানে একটি কুল গাছের নীচে তাল পাতার অস্থায়ী ছাউনী তৈরী করে পূজা সম্পন্ন হত। কারণ, রাজ রাজেশ্বর শিব মন্দির সংলগ্ন স্থানে রাজ অনুমতি ব্যতীত কোনরূপ মণ্ডপ স্থাপন করা সম্ভব ছিল না। বর্ধমান মহারাজা রাজ রাজেশ্বর শিবের নিত্যসেবার জন্য আর্থিক সাহায্য দিতেন। তাদের নিযুক্ত একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন নিত্যসেবার জন্য। নারায়ণ চন্দ্র ঘোষের উপর দেখাশুনার ভার ছিল। একবার ঐ নারায়ণ বাবুর সম্মতি না থাকায় শিবতলার পিছনে এক বেল গাছের তলায় কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। পরের বার ঐ নির্দিষ্ট স্থানেই আবার মায়ের পূজা হয়। নারায়ণ বাবুর পুত্র শম্ভু ঘোষ মহাশয় প্রথমে ঐ মন্দির বেদীটি পাকা করে দেন। তখন মা ফৌজদারী কালীতে রূপান্তরিত হয়েছেন, তবে ঐ বাগদীপাড়ার পূজা যদিও তৎকালে খোসবাগানের একমাত্র পূজা তবুও বিশেষ কোন আড়ম্বর ছিল না।

তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার শাসক ছিলেন লীগ মন্ত্রীসভা। প্রশাসন সম্পূর্ণরূপে ধর্মনিরপেক্ষতা বজায় রাখতে অসমর্থ ছিল। সেই কারণে তখনকার বিশেষ একটি সম্প্রদায়ের ধর্মাবলম্বীরা কতকগুলি বিশেষ অধিকার ভোগ করতেন বা করতে চাইতেন। তাদের উপাসনা গৃহের সম্মুখে কোন বিধর্মীর দেবতাকে শোভাযাত্রা ও বাজনা বাজিয়ে যেতে দেওয়া হবে না, এই ছিল তাদের নির্দেশ, অথচ তখন বর্ধমানের যেকোন রাস্তা দিয়ে যেতে গেলেই শোভাযাত্রাকে কোন না কোন উপাসনা গৃহের সামনে দিয়ে যেতেই হবে। সকল প্রতিমাই কৃষ্ণসায়র, শ্যামসায়র ও রাণীসায়েরেই

নিরঞ্জন করা হতো। ঐ সমস্ত জায়গায় যেতে হলে কোন না কোন উপসনা গৃহের সামনে দিয়ে যেতেই হবে। ঐ বছর দুর্গা প্রতিমা নিরঞ্জনের সময় থেকে ঐ নির্দেশ আরোপিত হয় এবং যার ফলস্বরূপ বর্ধমানের বেশ কয়েকটি দুর্গা প্রতিমা মাসাধিকাল বিনার্চ্চনায় ভেড়িখানার রাস্তায় পড়ে থাকে। পরে পুলিশ প্রহরায় সবকটি প্রতিমার নিরঞ্জনই সম্পন্ন হয়। লীগ মন্ত্রীসভা তখন আইন প্রণয়ণ করেন, কোন হিন্দু দেব-দেবীর নিরঞ্জন শোভাযাত্রা করে ও বাজনা বাজিয়ে প্রকাশ্যে নিরঞ্জন করতে দেওয়া হবে না। তদানীন্তন হিন্দু মহাসভার নেতারা বহু আবেদন নিবেদন করা সত্ত্বেও বিশেষ সম্প্রদায়ের ঐ সকল উপাসনা গৃহের একশত গজের মধ্যে কোন বাজনা না বাজিয়ে নীরবে পেরিয়ে যাওয়ার আবেদনও নিস্ফল হয়ে য়ায়। তখন বর্ধমান তথা সমগ্র বাংলাদেশের হিন্দু সমাজ ক্ষোভে অপমানে স্তব্ধ হয়ে যায়।

তখন এই অপমানের প্রতিবাদ করতে বর্ধমানের বিশিষ্ট ব্যবহারজীবী গিরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের গৃহে একটি গোপন বৈঠক হয়। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন তখনকার দিনের উল্লেখ্যযোগ্য ব্যক্তিত্ব। গিরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ছাড়াও বলাই মুখোপাধ্যায়, শ্রীকুমার মিত্র, রাজকৃষ্ণ দত্ত, তারাপদ পাল, প্রাণদা মুখোপাধ্যায়, প্রণবেশ্বর সরকার প্রভৃতি। ঐ বৈঠকে স্থির হয় এরা যেকোন একটি প্রতিমা নিয়ে আইন অমান্য করে নিরঞ্জন সমাপন করবেন। তখনকার দিনে বারোয়ারী পূজা বা সার্ব্বজনীন পূজার চল ছিল না। সমস্ত প্রতিমাই বাড়ীর প্রতিমা হিসাবেই পূজিত হতো। সেহেতু বাড়ীর প্রতিমা নিয়ে আইন অমান্য করলে বাড়ীর মালিকের উপর সমস্ত দায় বর্তাবে এই চিন্তায় ঐ প্রচেষ্টায় সাড়া দতে কেউ সাহস পায় নাই।

কিন্তু ঐ প্রস্তাব যখন খোসবাগান সরস্বতীতলার প্রবীণ ব্যক্তিদের কাছে আসে তখন যতীন্দ্র নাথ বিষ্ণু মহাশয়ের মাধ্যমে ঐ বাগদি পাড়ার কুল গাছ তলার কালী প্রতিমা পাওয়া যাবে বলে জানানো হয়। সেই মোতাবেক ১৩৪৫ সনের ৩০শে কার্তিক রাত্রি ৮ ঘটিকায় স্থানীয় যুবকেরা একটি ঢোল ও একটি কাঁসি নিযে, তাদেরই মধ্যে তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় নামক একটি যুবকের মাথায় প্রতিমাটি চাপিয়ে শহর পরিক্রমায় বের হয়। লীগ মন্ত্রীসভার একদলীয় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তাদের এই পদক্ষেপ বর্ধমান তথা সারা বাংলার মানুষের কাছে দৃষ্টান্ত স্বরূপ। তখন বর্ধমান থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার ছিলেন মহম্মদ বাবর আলি সাহেব। তিনি ঐ যুব গোষ্ঠির দৃঢ় পদক্ষেপে কেঁপে উঠেছিলেন। সেই সময় তিনি ঐ শোভাযাত্রাকে বাধা না দিয়ে কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে শোভাযাত্রা নিয়ে গিয়ে বিসর্জন করার পর ঐ সমস্ত যুবকদের গ্রেপ্তার করেন এবং তাদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেন। বর্ধমান আদালতে আইন অমান্য ও অন্যান্য মিথ্যা অপরাধে তাদের ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ড

ও জরিমানা হয়। তখনকার ব্যারিষ্টার মহল বিনা পারিশ্রমিকে মহামান্য হাইর্কোটে আপিল করে সকলকে মুক্ত করে আনেন এবং তখন থেকে শোভাযাত্রা করার আইন সম্মত অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন। যেহেতু মা, ফৌজদারী মামলা জয় করে প্রিয় সন্তানদের মুক্ত করে আনেন তাই মা আজও ফৌজদারী কালী রূপে সর্ব্বজন বিদিতা। যেহেতু মাকে কাঁধে এবং মস্তকে বহন করে শোভাযাত্রা করা হয়েছিল তাই মা অদ্যাবধি চর্তুদোলাতেই শোভাযাত্রা সহকারে শহর প্রদক্ষিণ করেন।

· সংগৃহীত ১) শ্রীশ্রী ফৌজদারী কালীমাতা নামকরণ ও ইতিবৃত্ত (স্মৃতি চারণা)
শ্রী সুধীর ভট্টাচার্য্য

উইল বাড়ী

উইল বাড়ীও একটি ঠাকুর বাড়ী বলে পরিগণিত হতো। উইল বাড়ীকে ঠাকুর বাড়ী বললাম এই কারণে যে এখানেও প্রতিষ্ঠিত আনন্দবল্লভ জীউ বিগ্রহ এবং আনন্দ গোপাল জীউ বিগ্রহের নিত্য পূজা হতো। তবে উইল বাড়ীর প্রসিদ্ধি উইল বাড়ীর ছবির জন্য। বর্ধমানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সর্বমঙ্গলা মন্দিরের পাশে এই উইল বাড়ীর অবস্থান। প্রায় দশ বারো বিঘা জায়গা নিয়ে উইল বাড়ী অঞ্চল ছিল। মহাতাব চাঁদের পিতা ছিলেন পরান চাঁদ কাপুর। তিনি ছিলেন আবার মহারাজ তেজচাঁদের একাধারে দেওয়ান, শ্যালক এবং শ্বশুর। এই পরান চাঁদ কাপুরের দ্বিতীয় পুত্র তারা চাঁদ কাপুরের একটি বিশাল সুদৃশ্য অট্টালিকা ছিল। তারাচাঁদ বাবুর কোন পুত্র সন্তান ছিল না। তিনি ঐ অট্টালিকা সহ তাঁর যাবতীয় সম্পত্তি তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহারাজ মহাতাব চাঁদের নামে উইল করে দেন। এই কারণেই তারাচাঁদ কাপুরের ঐ সুদৃশ্য বিশাল বাড়ী উইল বাড়ী নামে খ্যাত।

অতীতে শীতকালে বর্ধমান শহরের সবচেয়ে বড় আর্কষণ ছিল—উইল বাড়ীর ছবি। আমি আগেই বলেছি এই উইল বাড়ীর বিস্তৃতি প্রায় দশ বারো বিঘা ছিল। এক এক অংশে মানুষপ্রমাণ উচ্চতায় অনেক মাটির পুতুল তৈরী হতো। প্রত্যেক বছর শীতকালে সরস্বতী পূজোর দিন থেকে এক মাস সেগুলি দর্শকদের দেখার জন্য খুলে দেওয়া হতো। পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে এই পুতুলগুলি তৈরী করে পৌরাণিক কাহিনী জনসাধারণের মধ্যে তুলে ধরা হতো। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল জনসাধারণের মধ্যে লোক শিক্ষার প্রচার। রামায়ণ, মহাভারত, কৃষ্ণলীলা প্রভৃতি থেকে ঘটনা নিয়ে ঐ পুতুলগুলির মাধ্যমে লোকশিক্ষা প্রচার হতো। কোন দৃশ্যে দেখান হচ্ছে পিতৃ সত্য পালনের জন্য রামের বনগমন সীতা ও লক্ষণের সাথে। কোথাও দেখা যায় রাবণ কর্তৃক সীতা হরণের দৃশ্য এবং সীতাকে হরণ করে নিয়ে যাওয়ার সময় জটায়ু কর্তৃক বাধা দান। কোথাও লক্ষ্মণগণ্ডি দিয়ে সীতাকে ঐ গণ্ডির বাহিরে যেতে বারণ করছে কোথাও সীতার অগ্নিপরীক্ষা প্রভৃতি। এছাড়াও মহাভারতে কাহিনী অবলম্বনে অর্জুনের লক্ষ্যভেদ, পুতানা রাক্ষসী বধ, দ্রোপদীর বস্ত্র হরণ, শ্রী কৃষ্ণের কংস বধ। কোথাও কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ, বকাসুর বধ, গদাযুদ্ধে ভীম কর্তৃক দুর্যোধনের উরু ভঙ্গ ইত্যাদি ইত্যাদি আরো কত কাহিনী তুলে ধরা

হতো, তা বলে শেষ করা যায় না। এভাবে ভাগ ভাগ করে পুতুল সাজিয়ে এক একটি দৃশ্য দেখান হতো। প্রত্যেক জায়গায় কাগজে ঐ পুতুলের দৃশ্যের কাহিনীর ব্যাখ্যা লিখে এঁটে দেওয়া হতো। শিক্ষিত, অশিক্ষিত সমস্ত দর্শকেরাই নিজেদের মধ্যে আলোচনার ভিত্তিতে ঐ সমস্ত জিনিসের রস উপলব্ধি করত। বহু দূর-দূরান্ত থেকে জনসাধারণ এই উইল বাড়ীর ছবি দেখতে আসত এবং আনন্দ উপভোগ করত। এটাই ছিল লোক শিক্ষার সবচেয়ে সহজ উপায়। প্রতি বৎসর পুতুলগুলিকে নষ্ট করে দেওয়া হতো। তবে পুতুলগুলি নষ্ট হয়েও যেত। প্রতি বৎসর নতুন নতুন পুতুল তৈরী করে দেখাবার ব্যবস্থা করা হতো। আমরা দেখেছি একটি পুতুল নষ্ট করা হতো না। সেই পুতুলটি হচ্ছে একটি সাধু ধুনি জালিয়ে সেই একই জায়গায় বসে বছরের পর বছর গাঁজা খাচ্ছে। আর একটি জিনিস না থাকলে সে বছরের ছবি মূল্য হীন বলে মনে হতো।সেটি হচ্ছে শিবের চেলা নন্দী-ভৃঙ্গী। দক্ষযজ্ঞ পণ্ড করে শিব সতীকে নিয়ে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করছেন তার সঙ্গে আছে তাঁর অনুচরগণ—সাত-আট হাত লম্বা লিকলিকে দেহ, সেই অনুপাতে হাত-পা। পায়ের পাতা উল্টোদিকে। নাক দিয়ে বিরাট পোঁটা ঝুলছে। বালকেরা এ সমস্ত দেখে আনন্দও পেতো আবার ভয়ও পেতো। এই লোক শিক্ষারমূলে যাঁর অবদান ছিল তিনি হচ্ছেন পরান চাঁদ কাপুরের মধ্যম পুত্র তারা চাঁদ কাপুর। মহারাজা মহাতাব চাঁদ ছিলেন তারা চাঁদ বাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। মস্ত বড় ধনী হওয়া সত্ত্বেও তারাচাঁদ বাবুর কোন বিলাসিতা ছিল না এবং তিনি ছিলেন একজন সংস্কৃতি পরায়ণ ব্যাক্তিত্ব। তারাচাঁদ বাবুর কোন সন্তানাদিও ছিল না। তিনি সবসময় নানা রকম সেবা মূলক কাজে নিজেকে নিয়োজিত করে রাখতেন। এই উইল বাড়ীর মাঝে ছিল এক মন্দির তাতেই ছিল রাধা কৃষ্ণ বিগ্রহ অর্থাৎ আনন্দবল্লভ জীউ এবং আনন্দ গোপাল জীউ। মন্দিরের সংলগ্ন বৃত্তাকার কারুকার্যময় সু-উচ্চ স্তম্ভ বিধৃত নাটমন্দির। সীমানার মধ্যে চার পাঁচটি বাড়ী নানা উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতো। তার মধ্যে একটি বাড়ী ছিল রাজ কলেজের ছাত্রদের মেস বাড়ী। আর একটি বাড়ী ছিল, সেটি কাহারও বিবাহ উপলক্ষে বিনা ভাড়ায় দেওয়া হতো। বিবাহ উৎসব উপলক্ষে এই বাড়ী বিনা পয়সায় পাওয়া জনসাধারণের খুবই উপকার হতো। কারণ এখনকার মতো তখন বাড়ি ভাড়া পাওয়াও যেত না এবং বাড়ীভাড়ার রেওয়াজও ছিল না। ফলে বর্ধমানবাসীদের খুবই উপকার হতো বিনা খরচে ঐ রকম বাড়ী পাওয়ার জন্য। তারাচাঁদ বাবু এক উইল সম্পাদন করে ঐ সমগ্র এলাকা মায় সব বাড়ী ঘর, অঞ্চলস্থ দেবসেবা প্রভৃতি এবং ঐ লোক শিক্ষা সংক্রান্ত খরচের জন্য জমিদারীসহ অনেক ভূ-সম্পত্তি

বর্ধমান রাজ মহাতাবচাঁদ বাহাদুরের হস্তে সমর্পণ করেন। সে কারণে শ্রীশ্রী সর্ব্বমঙ্গলা মায়ের মন্দিরের সামনের ঐ অঞ্চল তারাচাঁদ বাবুর সময় থেকেই উইল বাড়ী নামে পরিচিত। অতীতে ঐ উইল বাড়ীতে বর্ধমান মহারাজার অতিথিশালা ছিল। প্রতি বছর জন্মাষ্টমীর সময় আনন্দবল্লভ এবং আনন্দ গোপাল জীউর জন্মাষ্টমী উৎসব পালিত হতো। এই উইল বাড়ীতে ১৩৭১ সালের ২৮শে চৈত্র ভারত সেবাশ্রম সংঘের অনুমোদিত 'বর্ধমান হিন্দু মিলন মন্দির' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং প্রতি বছর জন্মাষ্টমী উৎসব পালিত হচ্ছে। তখনকার দিনে উইল বাড়ীর ছবি ছিল বর্ধমানবাসীর অবসর বিনোদন এবং মনে আনন্দ উপভোগ করার প্রকৃষ্ট জায়গা। অতীতের ঐ ঐশ্চর্য মণ্ডিত উইল বাড়ীর ভগ্নদশা বর্ধমানবাসীদের কাছে খুবই দুঃখের।

কমলাকান্ত কালীবাড়ী

বর্ধমান মহারাজাধিরা তেজচাঁদ বাহাদুর বর্দমান শহরে অনেক দেব-দেউল প্রতিষ্ঠা করেন। তার মধ্যে সাধক কবি কমলাকান্ত পূজিতা শ্রীশ্রী কমলাকান্ত কালীমাতার দেউল অন্যতম। সিদ্ধপীঠ হিসাবে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ এই কালীবাড়ী। বর্ধমান মহারাজাধিরাজ তেজচাঁদ বাহাদুর বৈষ্ণব ধর্মের অনুরাগী হলেও, শেষ বয়সে তিনি শাক্ত ধর্মের প্রতি আসক্ত হন। তিনিই সাধক কমলাকান্তকে গুরুপদে অধিষ্ঠিত করে বর্ধমান কোটালহাটে নিয়ে আসেন। মন্দির প্রতিষ্ঠা করে দেন। রাখালদাস মুখোপাধ্যায়ের রাজ বংশানুচরিত পৃষ্ঠা ১৩২ হইতে জানা যায়। সাধক প্রবর কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে মহারাজ প্রতাপচাঁদ অত্যন্ত ভক্তি করতেন এবং সময়ে সময়ে রাজবাটিতে আমন্ত্রণ করে নির্জ্জনে তাঁহার সদুপদেশ শ্রবণ করতেন। মহারাজা তেজচাঁদ বাহাদুর পরম বৈষ্ণব ছিলেন, তিনি শাক্ত কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়েকে আদৌ শ্রদ্ধা করতেন না। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের উপদেশানুসারেই, একমাত্র পুত্র প্রতাপচাঁদ মদ্যপায়ী হয়েছে। তাহার মনে এই ধারণা বলবতী হওয়ায়, তিনি ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে অতিশয় অশ্রদ্ধাই করতেন। কালক্রমে সাধক প্রবরের কোন অলৌকিক ক্ষমতা সন্দর্শন করে মহারাজা তাঁহার প্রতি অত্যন্ত ভক্তিমান্ ও শ্রদ্ধাবান হয়েছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত কালী পূজার ব্যয় নির্ব্বাহার্থে বার্ষিক বৃত্তি নির্দ্ধারিত করে দিয়েছিলেন। প্রতি বৎসর কালী পূজার সময় রাজসরকার হতে বৃত্তি প্রদত্ত হতো। সাধক প্রবর কমলাকান্ত মহারাজা তেজচাঁদের মনোভাব পরিবর্তন দৃষ্টে বংশহানির অভিশাপ দেন। ফলে পিতা তেজচাঁদ জীবিত থাকতেই পুত্র প্রতাপ চাঁদের মৃত্যু হয় এবং মহারাজাকে দত্তক গ্রহণ করতে হয়। দত্তক গ্রহণ তিন পুরুষ চলেছিল। তারপর বংশ স্বাভাবিক হয় বিজয়চাঁদের সময় থেকে।

সাধক প্রবর কমলাকান্তের প্রতিষ্ঠিত কোটাল হাটের এই কালী বাড়ী, 'কমলাকান্তের 'কালীবাড়ী নামেই খ্যাত। এই কোটাল হাট বর্ধমানের খুব প্রাচীন জায়গা। ভারত চন্দ্রের কাব্যে "আট হাট ষোল গলি বত্রিশ বাজার" এর মধ্যে বলা আছে পাঁচটি হাটই বর্তমান বর্ধমানের পশ্চিম অংশে অবস্থিত। এই পাঁচটি হাটের মধ্যে কোটাল হাট অন্যতম। মহারাজা তেজচাঁদ সাধক প্রবর কমলাকান্তকে চান্না থেকে বর্ধমানে নিয়ে এসে বারশো ষোল (১২১৬) সালে তার সভা পণ্ডিত করেছিলেন। তখন থেকেই সাধক বর্ধমানে তাঁর সাধনার ক্ষেত্র খুঁজে পেলেন। তিনি লাকুর্ডিতে বসবাস আরম্ভ করলেন। তখন লাকুর্ডি ছিল বন জঙ্গলে ভর্ত্তি। ঐ

লাকুর্ডিতেই ছিল বর্ধমানের উত্তর মশান অর্থাৎ যেখানে এখন দুর্লভা কালী মন্দির। মহারাজা তেজচাঁদ কোটাল হাটে বার কাঠা জমির উপর মায়ের মন্দির এবং সাধকের থাকার বাসস্থান করে দিলেন। এরপর সাধক মন্দিরে কালী প্রতিষ্ঠা করে আদ্যাশক্তি মহামায়ার সাধনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে ফেললেন। আদ্যাশক্তি মহামায়ার সাধনার সমস্ত ব্যবস্থাই সম্পন্ন করে ফেললেন। মন্দিরের পাশেই পঞ্চমুণ্ডির আসন প্রতিষ্ঠা করলেন। মন্দিরের পিছনে বেল গাছ প্রতিষ্ঠা করে স্থাপন করলেন ভৈরবকে। এরপর শুরু হলো সাধকের বিশ্বশক্তি স্বরূপিনী মহাবিদ্যার দর্শন লাভ।

শক্তি সাধকেরা সাধারণতঃ মা কালী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করে ধ্যানস্থ হন। তন্ত্র শাস্ত্রে এই শক্তিকে কালী, বিশ্বনিয়তি, অদৃষ্টরূপিনী, পরিণাম প্রদায়িনী বলে অভিহিত করা হয়েছে, শব শিবের উপর কালী মূর্ত্তির এইভাবে অর্থ করা হয়েছে। অতীত ভবিষ্যৎব্যাপী মহাকাল, তৎসন্নিহিত পুরুষ অবশ শবের ন্যায় মায়ের চরণতলে অবস্থিত। মায়ের গল দেশে দোদুল্যমান মুণ্ডমালা অতীতের অগণিত অবস্থা প্রকাশ করেছে। বাম হাতের খড়্গ জগতের নিকৃষ্ট জিনিসগুলি বলিদান দিয়ে উৎকৃষ্ট জিনিসের অভিব্যক্তির প্রকাশ। ডান দিকে দুই হাতের, এক হাতে ভবিষ্যতের সার্থকতার দিক্ নির্দ্দেশ করে। অপর হাতে ভয়াকুল জীব সকলকে আশ্বাস প্রদান করে। এই মা-ই কল্পতরু। সাধক যখন সাধনার বলে সর্ব্ব সার্থকতা লাভ করেন তখন তিনি মহাবিদ্যা, জ্ঞান স্বরূপিনীর রাজ্যে উপনীত হন। সাধকের ইচ্ছা শক্তি তখন অপরিসীম ঐশী ইচ্ছার সহিত মিলিত হয়ে যায়। সাধক তখন সর্ব্বজ্ঞত্ব, সত্যসঙ্কল্প গুণ লাভ করেন এবং পূর্ণকাম হয়ে গিয়ে অপরিসীম আনন্দসত্ত্বায় বিলীন হয়ে যান। সাধক তখন সাধন বলে আদ্যাশক্তি মহামায়ার নিকট যাহা চাইবেন তাহাই পাইবেন।

সাধক কমলাকান্ত পঞ্চমুণ্ডির আসনে বসে দিনের পর দিন সাধনা করতে লাগলেন। পিছনে বেলগাছের তলায় চলতে থাকে ভৈরবের পূজা। কারণ শক্তিকে জাগ্রত করতে হলে শিবকেও চাই। শিব শক্তির মিলনেই তো হবে সৃষ্টি। কমলাকান্ত কালী বাড়ীর পূর্বদিকে যে রাস্তাটি গেছে, সেটি দক্ষিণমুখে যাবার পর ঐ রাস্তার উপর একটি নিমগাছের তলায় তিনি চণ্ডাল, শৃগাল ও বানরের মুণ্ড দিয়ে পেতে ছিলেন ত্রিমুমণ্ডীর আসন। পঞ্চ 'ম' কারের সাধনা করলে মহানির্বান হয়। কমলাকান্ত একে একে সবেরই সাধনা করলেন। সাধক কমলাকান্ত ও সাধন বলে সব শক্তিকে জয় করার ফলে যখন খুশী তখনই তিনি সমস্ত কিছু অলৌকিক ব্যাপারকে লৌকিকে পরিণত করেছেন। তাই তার অলৌকিক শক্তির কিছু দৃষ্টান্ত তুলে না ধরলে সমস্ত কিছুই অসমাপ্ত থেকে যাবে।

একটি ঘটনা, মহারাজ তেজচাঁদ তার পুত্র মদ্যপ প্রতাপ চাঁদকে ভাল করার

জন্য কমলাকান্তকে গুরু পদে অধিষ্ঠিত করে প্রতাপ চাঁদকে তার কাছে পাঠিয়ে ছিলেন। একদিন দেখলেন, সাধক নিজেই সুরাপান করে উন্মত্ত। তখন তার মনে হল সাধক নিজেই যখন মদ্যপ তাহলে সাধক প্রতাপ চাঁদকে কি করে ভাল করবেন। রাজা মনে মনে বিরক্ত হলেন, একদিন কমলাকান্ত যখন কমণ্ডলু নিয়ে রাজ প্রাসাদে এসেছেন, রাজার ধারণা কমণ্ডলুর মধ্যে সুরা আছে। মহারাজা সাধককে শাস্তি দেবার জন্যে বিরক্ত হয়ে সাধককে বললেন, ঠাকুর তোমার কমণ্ডলুতে কি আছে? ভাবের ঘোরে সাধক উত্তর দিলেন দুধ আছে। তারপর সাধক কমণ্ডলু থেকে মাটিতে দুধ ঢেলে রাজাকে দেখিয়ে দিলেন। রাজা লজ্জিত হয়ে সাধকের পায়ের ধুলো নিলেন।

আর একদিনের ঘটনা—সাধক কমলাকান্ত মদ্যপ অবস্থায় রাজবাটীতে এসেছেন মহারাজ তেজচাঁদের কাছে। সাধক প্রকৃতিস্থ কিনা পরীক্ষা করার জন্য মহারাজ গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করলেন,'গুরুদেব—আজ কি তিথি ?' সাধক ভাবাবেগে উত্তর দিলেন,'আজ পূর্ণিমা তিথি'। মহারাজ অত্যন্ত বিরক্ত হলেন। আজ ঘোর অমাবস্যা আর সাধক বলছেন পূর্ণিমা। তিনি ভেবেই নিয়েছেন সাধক অধিক মাত্রায় সুরাপান করায় এই ঘটনা ঘটিয়েছেন। রাজা বিরক্ত হয়ে সাধককে বলেন, আজ পূর্ণিমার চাঁদ দেখাতে পারবেন ? সাধক অক্লেশে রাজাকে অমাবস্যার দিন আকাশে পূর্ণ চন্দ্র দেখান। সেদিনও রাজা মাথা নামিয়ে সাধককে প্রণাম করেন।

সাধক দামোদরের ধারে কাঠগোলার ঘাটে বসে আছেন। এদিকে অমাবস্যার কালী পূজা মায়ের ষোড়শোপচারে পূজা করবেন সাধক। অথচ পূজার কোন যোগাড় নেই। আর সামর্থও নেই। কিছুক্ষণ বাদে দেখা গেল রাজবাড়ী থেকে রাজা স্বয়ং সমস্ত কিছু পাঠিয়ে দিলেন এবং সাধক মনের সাধে মায়ের ষোড়শোপচারে পূজা করে তৃপ্তি পেলেন।

এ রকম কত অলৌকিক ঘটনা সাধকের জীবনী থেকে পাওয়া যায়। কত বিস্ময়কর ঘটনাই লেখকের লেখনীতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত অলৌকিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আগে আমি যা বলেছি তার পুনরুক্তি করছি ঃ সাধক সাধনার বলে যখন সর্ব্ব সার্থকথা লাভ করেন তখন সাধকের ইচ্ছাশক্তি অপরিসীম ঐশী ইচ্ছার সহিত মিলিত হয়ে যায়। তখন তিনি মহামায়ার নিকট যাহা চাইবেন তাহাই পাইবেন। সাধক সমস্ত সাধানায় উত্তীর্ণ হয়েই এই অপরিসীম শক্তির অধিকারী হয়ে ছিলেন। সাধক তাঁর নিজের রচিত 'সাধক রঞ্জন'এ কিছু আত্ম পরিচয় দিয়েছেন ঃ—

"অতঃপর কহি শুন আত্ম নিবেদন।
ব্রহ্ম কুলে উপনীত স্বামী নারায়ণ।।
জন্মভূমি অম্বিকা নিবাস বর্ধমান।

শ্রী পাঠ গোবিন্দমঠ গোপালের স্থান।।
প্রভু চন্দ্রশেখর গোস্বামী মহাধন।
তাঁর পদ রেণু যার মস্তক ভূষণ।।
নামেতে কমলাকান্ত ভাবি ত্রিলোচন।
ভাব পুঞ্জে বিরচিল সাধক রঞ্জন।।"

এই আত্ম পরিচয় থেকে বোঝা যায় মামা নারায়ণ ভট্টাচার্য্য কমলাকান্তের পৈতে দিয়েছিলেন। কবির গুরু ছিলেন শ্রীপাঠ গোবিন্দ মঠের চন্দ্রশেখর গোস্বামী। বিধাতার কৌতুকে বৈষ্ণব গুরুর শিষ্য উত্তর কালে ঘোরতর শাক্ত হয়েছিলেন। উপনয়ণের পর থেকেই পার্থিব বিষয়ে তাঁর বৈরাগ্য দেখা দেয়। ভাব গতিক দেখে মা বর্ধমান লাকুর্ডীতে ভট্টাচার্য্য পরিবারে তাঁর বিয়ে দিয়ে দেন।

প্রচলিত প্রবাদ এই যে, চান্নায় বিশালাক্ষী মন্দিরের সাধকপ্রবর সিদ্ধি লাভ করেন। সিদ্ধ সাধক হিসাবে কমলাকান্তের খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লে দেওয়ান রঘুনাথ রায় মহাশয়ের পরামর্শে রাজা তেজচাঁদ বাহাদুর সাধককে রাজসভায় পণ্ডিত হিসাবে নিয়ে আসেন এবং সাধককে গুরু পদে অধিষ্ঠিত করে কোটাল হাটে সাধকের সাধনার জন্য মন্দির তৈরী করে দেন। প্রতি বছর মহা সমারোহে মায়ের পূজার ব্যবস্থা করে দেন। সাধক প্রতিষ্ঠিত কালী পূজার বর্ণাঢ্য সমারোহ সেকালে দর্শনীয় বস্তু ছিল। স্বয়ং রাজা তেজচাঁদ বাহাদুর শ্যামা পূজার রাত্রে পূজা দেখতে আসতেন। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে সাধক প্রবরের দেহান্ত ঘটে। জনশ্রুতি এই যে মৃত্যুকালে মহারাজ সাধককে গঙ্গাতীরে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। সাধক ঐ প্রস্তাবে রাজি হন নি। এতে মহারাজ সাধকের গঙ্গাপ্রাপ্তি হল না ভেবে একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। রাজার মনোভাব বুঝতে পেরে তাঁকে সাধক এই গানটি শুনিয়েছিলেন।

"কী গরজ কেন গঙ্গাতীরে যাবো—
আমি কেলে মায়ের ছেলে হয়ে—
বিমাতার কি শরণ লব?"

দেখা গেল কুশ শয্যায় শুয়ে আছেন, সাধক কমলাকান্ত কি ইচ্ছা করলেন মনে মনে মাটি থেকে জলের উৎস এসে পড়ল সাধকের মুখে। ভক্তের ইচ্ছা পূর্ণ হলো। মা গঙ্গা অন্তিমে দিলেন ছেলের মুখে শেষ স্নেহ অমৃত। মহারাজ এই দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে গেলেন। এই সমস্ত ঘটনা থেকেই বোঝা যায় সাধক সাধনার বলে ইচ্ছাশক্তিকে কিভাবে জয় করেছিলেন। তিনি মায়ের কাছে যখন

যা চেয়েছেন তাই তিনি পেয়েছেন।

এই রকম এক সিদ্ধ সাধকের সাধনা ক্ষেত্রে বাস করে আমরা ধন্য। বর্তমানে মন্দির সংস্কার করা হচ্ছে। সুন্দরভাবে ত্রি-স্তর মন্দির নির্মিত হচ্ছে। প্রায় সমাপ্তির পথে। মূল মন্দিরের প্রবেশ পথে প্রবেশ করে ঠিক উত্তরে ঘেরা জায়গায় ভৈরব স্থিত আছেন। ঠিক বেলগাছের তলায়। এখন জায়গাটি ঢালাই হয়ে গেছে। বেলগাছটিকে অক্ষত রেখে। ঐ জায়গায় ছোট ছোট তিন চারটি শিব লিঙ্গ আছে। বেলগাছের চারিধার বাঁধানো। প্রবেশ পথের ঠিক সোজা পশ্চিমে গিয়েই নাট মন্দির। নাট মন্দিরটি খুব সুন্দর। এখানে ভক্তরা এসে পূজা দিয়ে বিশ্রাম করেন। খুব বড় নাট মন্দির। অনেকেই এসে এই নাট মন্দিরে জপ-তপ করেন। এখানে সব সময় নিস্তব্ধতা বিরাজমান। সব সময় ভক্তদের ভিড়। অনেকেই এখানে বসে মায়ের নাম গান করেন, হরিনাম করেন। এখানে প্রায় নাম গান হয়। এই নাট মন্দিরটি তৈরী করে দিয়েছিলেন বৈদ্যনাথ দে মহাশয়। তিনি এই নাট মন্দিরটি তৈরী করে একটি পাথরে খোদিত করে দিয়েছেন।

"পিতৃদেব স্বর্গীয় হরিভূষণ দে মহাশয়ের স্মৃতি রক্ষার্থে
সাধক প্রবর কমলাকান্ত প্রতিষ্ঠিত "কমলাকান্ত কালী মন্দিরের
নাটমঞ্চ আমার শ্রদ্ধার্থ স্বরূপ নিবেদিত হইল।

শ্রাবণ -- ১৩৭৫ । বৈদ্যনাথ দে। নূতনগঞ্জ, বর্ধমান। জুলাই , ১৯৬৮ ।

নাটমঞ্চের ঠিক উত্তরে লাগোয়া দক্ষিণমুখী মায়ের মূল মন্দির। বারো মাস মায়ের ঐ মূর্ত্তি থাকে। কিন্তু আশ্বিন মাসের দ্বাদশী অথবা ত্রয়োদশীতে ঐ মূর্ত্তি নিরঞ্জন হয়। পুনরায় সে বছরের নূতন মূর্ত্তি তৈরী হয়। নিত্য পূজা হয় বেশ শুদ্ধাচারে। নিত্য মায়ের ভোগ হয় এবং ভক্তরা আগের দিন নির্দিষ্ট মূল্য দিয়ে নাম লিখিয়ে গেলে মায়ের ভোগের প্রসাদ পাবেন। ঠিক মধ্যাহ্নে মায়ের অন্ন ভোগ হয়। সন্ধ্যায় মায়ের লুচি-মিষ্টি ভোগ হয়। ত্রি-সন্ধ্যা মায়ের আরতি হয় এবং পূজা হয়। প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় বারের পূজা হয়। বহু ভক্ত সমাগম হয়। প্রতি অমাবস্যায় মায়ের হোম হয়। আগে ছাগবলি হতো--- এখনও শ্যামা পূজায় এবং মানসিক থাকলে ছাগ বলি হয়। বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে ভক্তেরা পূজার ডালি সাজিয়ে মায়ের পূজা নিয়ে আসেন। এত ভিড় হয় যে ভিড় সামাল দেওয়া মুস্কিল হয়ে পড়ে। যেমন নববর্ষ, বিজয়াদশমী, মঙ্গলচণ্ডী পূজা, বিপদতারিনী পূজা আরও কত অনুষ্ঠন। আর শ্যামাপূজার ক-দিন তো সারাদিন ভক্তদের আনাগোনা। মহানিশায় মায়ের পূজা হয়।

ষোড়শোপচারে বেশ শুদ্ধাচারে মায়ের পূজা হয়। পূজা শেষ হতে প্রায় ভোর হয়ে যায়। পরের দিন সকাল থেকেই মায়ের প্রসাদ বিতরণ করা হয় ভক্তদের মধ্যে। কত পূজা, কত কাপড়, কত আলতা-সিন্দুর এবং মান্‌সিকের অন্যান্য জিনিস পত্র মায়ের কাছে আসে তা-না দেখলে কল্পনা করা যাবে না। দ্বি -প্রহরে অন্নকূট হয় এবং বেশী রাত অবধি ভক্তরা মায়ের অন্নকূটের প্রসাদ গ্রহণ করেন। ঐ কদিন মন্দিরে একবারে জম-জমাটি ভাব। কার্ত্তিক মাসের ভ্রাতৃ দ্বিতীয়ার দিন কমলাকান্ত মন্দিরে প্রতি বৎসর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ বর্ধমান শাখা, বর্ধমান সংস্কৃতি পরিষদ ও কমলাকান্ত কালী সমিতি কমলাকান্ত দিবস পালন করেন। অনেক ভক্তিমূলক অনুষ্ঠান এখানে হয়ে থাকে। প্রতি বছর মাঘ মাসে ক-দিন ১০৮ শ্রীশ্রী দণ্ডীস্বামী এখানে আসেন এবং সনাতন ধর্মানুষ্ঠান করেন। পৌষ মাসে দুঃস্থদের মধ্যে কম্বল বিতরণ করেন। অন্নকূট করেন। অখণ্ড হরিনাম সংকীর্ত্তন হয়। পিছনের বিশাল ফাঁকা জায়গাতেই অন্নকূট হয়।

মূল মন্দিরে তিনটি ঘর। মূল মন্দিরের পশ্চিমে ভোগ রান্নার ঘর। মন্দিরের মায়ের মূর্ত্তির ঠিক বাম হাতের ঘরটিতেই আছে সাধকের পঞ্চমুণ্ডির আসন। এই পঞ্চ মুণ্ডির আসন যে ঘরে আছে ঐ ঘরে জনসাধরণের প্রবেশ নিষেধ। ঐ ঘরেতেই একটি কষ্টি পাথরের ছোট মায়ের বিগ্রহ আছে। ত্রি-সন্ধ্যা মায়ের পূজা হয়। শ্রী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং শ্রী মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য মায়ের পূজার কার্য্যে নিয়োজিত আছেন। বর্ধমান মহারাজধিরাজ উদয় চাঁদ মহাতাব কমলাকান্ত মন্দিরের সকল কার্য্য পরিচালনার জন্য স্থানীয় ভক্তদের সহযোগিতায় একটি ট্রাষ্ট-কমিটি গঠন করে দিয়েছেন। এই কমিটি 'কমলাকান্ত সমিতি' মন্দিরের পূজা ইত্যাদির যাবতীয় কার্য্যের তত্ত্বাবধান করেন। পরিশেষে ১৯১৩ সালের অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র রচিত এবং পঠিত "মাতৃদর্শন" কবিতার কয়েকটি ছত্র উদ্ধৃত করছি।

"কমলাকান্তের কান্তার উজলি
তরল কান্ত আভাতে,
অমল ধবল ফুটেছে কমল
উজ্জল শান্ত প্রভাতে,"

"কমলাকান্তের অজির উজলি
দাঁড়ায়ে আজি কি প্রতিমা,
আঁখি হতে তার আলোক-সঞ্চার,

দেখাতে ত্রিলোক মহিমা.”

“সাধকের দীপে দীপিত মণ্ডপে
বাসনার সাজে সেজেছে.”

“এসেছে জননী এ পুরাণ পুরে
সে পুরা কাহিনী বহিয়া,
এসেছে জননী পুরাতন পুরে
নূতন জীবন লইয়া।
কমলাকান্তের কুটীর অবধি
অধিপ প্রাসাদ জুড়িয়া,
স্নেহ-সচঞ্চল মায়ের অঞ্চল
অনিলে যেতেছে উড়িয়া,
কীর্ত্তি চন্দ্রের কীর্ত্তি মণ্ডিত
বংশ আছে যে উজ্জলি,
সে বিজয় চাঁদ মায়ের প্রসাদ
দিতেছে ভড়িয়া অঞ্জলি,
আজি সে প্রসাদ পূরাইয়া সাধ
এস তুলে লই সকলে,
ঝেড়ে দেবে ধূলা মরমের মলা
জননী অমল-অঞ্চলে।”

শ্রীশ্রী ঈশানেশ্বর শিব মন্দির

বর্ধমান শহরের বিখ্যাত শ্যামসায়রের উত্তর-পূর্ব কোণে এই ঈশানেশ্বর শিব মন্দির অবস্থিত। হয়ত ঈশান কোণে শিব প্রতিষ্ঠা করে শিবের নাম দেওয়া হয়েছিল ঈশানেশ্বর শিব। শ্যাম সায়র একেবারে শহর বর্ধমানের মধ্যস্থলে অবস্থিত। এই শ্যাম সায়রের উত্তর পশ্চি ম কোণে বর্ধমান রাজ কলেজ অবস্থিত। বাবু রায়ের পুত্র ঘনশ্যাম রায় অবিবাহিত ছিলেন। তিনি খুব কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে অল্প বয়সে মারা যান। তিনি জীবনে একমাত্র কাজ বর্ধমান শহরের মাঝে এক সুবৃহৎ জলাশয় খনন করেছিলেন। এই জলাশয়টি তাঁরই নামের সাথে নামাঙ্কিত করে নাম দিয়েছিলেন শ্যাম সায়র। উদ্দেশ্য ছিল পানীয় জলও চারিপাশের ধান জমি সেচের জন্য। কারণ তখন ঐসব অঞ্চল অর্থাৎ রাজ কলেজের পিছনে ছিল চাষের জমি। শ্যাম সায়েরের সন্নিকটে রক্ষিত এক প্রস্তর ফলক থেকে জানা যায় জলাশয়ের খনন কাজ শেষ হয় ইং ১৬৭৪-৭৫ সালে।

এই ঈশানেশ্বর শিব লিঙ্গ খুব বিখ্যাত শিব লিঙ্গ। প্রত্যহ বহু ভক্ত সমাগম হয় এবং বাবার মাথায় জল ঢালে। মন্দির বেশ ভাল। মন্দিরে প্রবেশ করে ঠিক বাম দিকে একটি বড় কুলুঙ্গিতে রক্ষিত আছে সাদা পাথরের বেশ বড় সিদ্ধি দাতা গণেশ মূর্ত্তি। তারপরই মূল মন্দির শিব মন্দির যে রকম ছোট হয় এই মন্দিরও সেই রূপ ছোট মন্দির। এই মূল মন্দিরেই ঈশানেশ্বর শিবলিঙ্গ আছেন। মন্দির খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ঐ মূল মন্দিরের ঠিক পূবর্বদিকে তিনটি প্রকোষ্ঠে তিনটি প্রধান বিগ্রহের পূজা হয়। যেমন মাঝের প্রকোষ্ঠে আছেন মাতা পার্বতী শ্বেত পাথরের। ঐ প্রকোষ্ঠের ঠিক ডান দিকে প্রকোষ্ঠে রক্ষিত আছেন পিতলের নারায়ণ মূর্ত্তি এবং বাম দিকের প্রকোষ্ঠে আছেন পিতলের রাধা কৃষ্ণ মূর্ত্তি। এছাড়াও নারায়ণ শিলা আছেন। এখানে নিত্য পূজা হয়। প্রত্যহ বহু ভক্ত আসেন পূজা দিতে। তবে সবচেয়ে প্রধান উৎসব শিবরাত্রি উপলক্ষে এবং নীলষষ্ঠীর দিন ঐ উৎসবে প্রচুর ভক্ত সমাগম হয়। তবে আগেকার মতো সেই ভক্তি নম্র পরিবেশ আর দৃষ্ট হয় না। এই মন্দির সংলগ্ন অনেকগুলি প্রকোষ্ঠ ছিল সাধুদের আবাসন। তাঁরা দু-চার দিন থাকতেন আবার চলে যেতেন। এখনও প্রায় প্রত্যহ ভক্ত সমাগম হয় কিন্তু সাধু সমাগম হয় না। এখন তাদের প্রকোষ্ঠগুলিতে অপরে থাকে। এখানকার পরিবেশ খুব ভাল। সংলগ্ন বর্ধমান রামকৃষ্ণ আশ্রম, হরিসভা অবস্থিত। এই রামকৃষ্ণ আশ্রম এবং বর্ধমান হরিসভারও পরিবেশ খুব শান্ত এবং গাম্ভীর্যপূর্ণ।

অন্নপূর্ণা এবং রাজ রাজেশ্বর মন্দির

রাধাবল্লভ জীউর মন্দির সংলগ্ন এই মন্দিরের অবস্থান। ঠিক একই রকম এই মন্দির এবং একই ধাঁচের তৈরী এই দুটি মন্দির। তবে রাধাবল্লভ বাড়ীর ভিতর দিক থেকেও এই মন্দিরের প্রবেশের পথ আছে। অর্থাৎ যে কোন মন্দিরে প্রবেশ করে আবার অপর মন্দিরের বিগ্রহ দর্শন করে সেই মন্দিরের প্রবেশ পথে বার হওয়া যাবে। অন্নপূর্ণা মন্দিরের প্রবেশ পথে উপরে পাথরে খোদিত আছে এই কথাগুলি। "১৭৪১ শকাব্দে মহিষী কমল কুমারীর সহিত নৃপতি কুলমান্য বর্ধমানধিরাজ দানবীর শিব ভক্ত ভুপতি তেজচন্দ্র মহাদেব প্রীত্যর্থে সশক্তি রাজ রাজেশ্বর নামক শিব স্থাপন করিয়া ১৭৪২ শকাব্দে সর্ব্বশুভবিধাত্রী অন্নদাত্রী অন্নপূর্ণা স্থাপন করিয়াছেন।"

এই লেখা থেকে বোঝা যাচ্ছে মহারাজ তেজচাঁদ ১৭৪১ শকাব্দে মন্দির নির্মাণ করে রাজ রাজেশ্বর শিব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তারপরের বছর অর্থাৎ ১৭৪২ শকাব্দে তিনি অন্নদাত্রী অন্নপূর্ণার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন।

এই মন্দিরের প্রথমেই সদর, সদরের উপরে খুব সুন্দর নহবৎ খানা এবং তার উপরের অংশ জগমোহন। প্রবেশ পথ ধরে মন্দিরে প্রবেশ করে মন্দির চত্বর। চারিধারে চক মেলান দ্বিতল প্রসাদ। চত্বর পার হয়েই সুন্দর নাট মন্দির। তারপর দক্ষিণমুখী গর্ভগৃহ এবং তৎসংলগ্ন শ্বেত পাথরের টালি বসান সুন্দর বারান্দা।

মূল মন্দিরে তিনটি প্রকোষ্ঠ। ঠিক মাঝখানের প্রকোষ্ঠটিতে স্থিত আছেন রাজ রাজেশ্বর শিব। সাদা শ্বেত পাথরের শিবলিঙ্গ এবং ঐ শিবলিঙ্গের উপরের দিকে রূপার অর্দ্ধচন্দ্র বেষ্টিত। কি অপরূপ এই রাজ রাজেশ্বরের শিব লিঙ্গ। শিল্পীর নিখুঁত ভাস্কর্য্যের নিদর্শন। রাজ রাজেশ্বর শিবের ডান দিকের প্রকোষ্ঠে আছেন শ্বেত পাথরের দুর্গা মূর্ত্তি। একটি শ্বেত পাথরকে খোদিত করে ভাস্কর একই পাথরের এক চালের মধ্যে তৈরী করেছেন লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক, গণেশ, অসুব, সিংহ প্রভৃতির মূর্ত্তি। কি অপরূপ এই বিগ্রহ তা চোখে না দেখলে চিন্তাই করা যাবে না। রাজ রাজেশ্বর শিবের বাম দিকের প্রকোষ্ঠে বিরাজ করছেন স্বয়ং সর্ব্বশুভ বিধাত্রী অন্নদাত্রী অন্নপূর্ণা।

এই মূর্ত্তিও একটি পাথরকে খোদাই করে এবং ঐ পাথরেই খোদাই করা দক্ষিণে মহাদেব স্বয়ং ও বামে ভৈরব বিরাজমান। অর্থাৎ একটি শ্বেত পাথরের উপর খোদাই করা শ্বেত-শুভ্র সর্ব্বশুভ বিধাত্রী অন্নদাত্রী অন্নপূর্ণা, মহাদেব এবং কালভৈরব। মহারাজ তেজচাঁদ প্রতিষ্ঠিত এই মন্দিরে মহারাজ বিজয়চাঁদ প্রতিষ্ঠা করেছেন কষ্টি

পাথরের কালিকা মূর্ত্তি। এরপর নাট মন্দিরে একটি ফোয়ারা আছে। এটি কিন্তু আসলে ফোয়ারা নয়। এখানে শ্বেত পাথরের সুন্দর কারুকার্য্য করা এক অপরূপ মূর্ত্তি। এটি হচ্ছে মহাদেবের জটা থেকে ভগীরথের গঙ্গা আনয়নের দৃষ্টান্ত। এই স্তম্ভের মধ্যে আছেন দক্ষিণে সিদ্ধি দাতা গণেশ, মাঝে ভগীরথ এবং সম্মুখে শিবের মূর্ত্তি। জটা থেকে ঐ ফোয়ারার জল গঙ্গার উৎপত্তির নিদর্শন। এই মূর্ত্তিটির ভাস্কর্য্য ও অতি অপূর্ব। এই নাট মন্দিরের ঠিক আগে অর্থাৎ মন্দিরের প্রবেশ পথের ঠিক বাম দিকে একটি ছোট মন্দিরে উত্তরমুখী ঠিক রাজ রাজেশ্বর শিব লিঙ্গের একেবারে সোজাসুজি কুমারী যোগমায়া মহাদেবের ধ্যানে মগ্ন। এই মূর্ত্তিটি ও একটি শ্বেত পাথরের মূর্ত্তি। হাত জোড় করে একেবারে ধ্যানের ভঙ্গিতে পদ্মাসনে বসা এই উত্তরমুখী যোগমায়া মূর্ত্তি এবং দক্ষিণমুখী রাজরাজেশ্বরের মূর্ত্তি একবারে এক সরলরেখায়ে অবস্থিত।

অতীতে এই মন্দির কি জাঁক-জমক পূর্ণ ছিল। সব রকম পূজা-আর্চাই এ মন্দিরে শুদ্ধাচারে পালিত হতো। বিশেষ করে নীল উৎসব, অন্নকূট, শিবচতুর্দ্দশী এবং এছাড়াও বৈষ্ণব ধর্মের ও সব উৎসব খুব জাঁক-জমক করে পালিত হতো। ভক্তদের ভিড় খুব বেশী হতো। এখনও বিশেষ বিশেষ উৎসবে ভক্তদের সমাগমও খুব বেশী হয়। তবে এখন আর সেই জৌলুস নেই।

শ্রীশ্রী ভূবনেশ্বরী দেবী মন্দির ও সোনার কালীবাড়ী

১৮২১ শকাব্দে বাংলার সন ১৩০৬ সালে ৩০শে ফাল্গুন তারিখে মহারাজ বিজয় চাঁদ মহাতাবের পিতামহী এবং মহারাজাধিরাজ মহাতাব চাঁদের দ্বিতীয়া পত্নী মহারাণী অধিরাণী নারায়ণ কুমারী দেবী বর্ধমান মিঠা-পুকুরে এই অতি সুন্দর দেবালয় নির্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে শ্রীশ্রী ভূবনেশ্বরী দেবী মূর্ত্তি ও সম্মুখস্থ মন্দির মধ্যে নারায়ণেশ্বর শিব প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার শিলা লিপিস্থ শ্লোক ঃ—

শ্রীশ্রী দুর্গা

হিজ্ হাইনেস্ মহাতাব নৃপতিসু মহিষী শ্রীল নারায়ণাদি—
শব্দা দেবী কুমারী বিজয়নরপতেঃ শ্রী মতস্বাতমাতা।
শাকে গ্লাবক্ষিবস্বিন্দুম ইহ জগতাং শক্তিমাদ্যাং ঘটান্তে
সংস্থাপ্যাসৈ সুহর্ম্মাং বিপুলগৃহমিমং প্রদদভক্তি-যুক্তা।।

"মহারাজ অধিরাজ হিজ হাইনেস,
স্বর্গীয় মহাতাব চন্দ্র বিখ্যাত নরেশ।
তাঁহার মহিষী হার হাইনেস যুতা,
শ্রী শ্রীমতী নারায়ণ কুমারী বিখ্যাতা।
শ্রীযুক্ত বিজয় চন্দ্র নৃপ-পিতামহী,
যাঁহার সু যশোগান সদা করে মহী।
শাকে অষ্টাদশ শত এক বিংশ মানে,
কুম্ভ ছাড়ি দিনেশের মীনে অধিষ্ঠানে।
স্থাপিয়া শ্রী আদ্যা শক্তি ভক্তি সহকারে,
এ বিপুল সুহর্ম্যটি অর্পিলেন তাঁরে।।
শকাব্দ ১৮২১ । বঙ্গাব্দ — ১৩০৬
৩০ ফাল্গুন"

শিব মন্দিরস্থ শিলালিপির শ্লোক ঃ—

শ্রী দুর্গা শরণম

"শাকে ভেশযুগাষ্ঠভূপরিমিতে শ্রীযুক্তনারায়ণ।

প্রাদ্যা শ্রীলযুতো ইষ্টদেহমু কুমারীশং মহাতাব প্রিয়া।
তাতাস্বা বিজয়াদিচন্দ্রনৃপতেরত্র প্রতিষ্ঠাপ্য সদ্
ধামাস্মৈ প্রদদাবিদং খভু বনোম্মাহে ঘটান্তে হরৌ।।
হিজ হাইনেস যুত বর্ধমানপতি।
মহ্তাব্ চন্দ্র নৃপমহিষী সুমতি,
অধুনা অধীনা যাঁর বর্ধমান-মহী,
শ্রী বিজয়চন্দ্রমহাতাব পিতামহী,
হার হাইনেস মহারাণী অধিরাণী
শ্রী শ্রীমতী নারায়ণ কুমারী সুরাণী,
শশি ভূজবসুভূমিপরিমিত শকে,
ঘট হানি মানে দিননাথের অংশকে,
নারায়ণেশ্বর শিব করিয়া স্থাপন,
নির্ম্মিয়া মন্দির তাঁরে করেন অর্পন।।
শকাব্দ ১৮২১ । বঙ্গাব্দ – ১৩০৬
৩০ ফাল্গুন"

"এই দেবদেবী প্রতিষ্ঠাকালে, বঙ্গের ও অন্যান্য স্থানের অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিমন্ত্রিত হইয়া উপযুক্ত বিদায় প্রাপ্তে পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন। বর্ধমানস্থ্ যাবতীয় ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া দক্ষিণাসহ পরিতোষরূপে ভোজন করান হইয়াছিল। মহারাজ বাহাদুর তদীয় পিতামহীর সহিত দেবমন্দিরে গমন করতঃ উক্ত কার্য্য সুসম্পন্ন করাইয়া দেন।" (রাজ বংশানুচরিত)

এই শিলালিপি থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে মহারাজাধিরাজ বিজয় চাঁদ মহাতাবের তত্ত্বাবধানে তাঁর পিতামহী অর্থাৎ মহারাজাধিরাজ মহাতাব চাঁদের দ্বিতীয়া পত্নী মহারাণী অধিরাণী নারায়ণ কুমারী দেবী ১৮২১ শকাব্দে অর্থাৎ বাংলা সন ১৩০৬ সালে ৩০শে ফাল্গুন এই বিশাল রাজপ্রাসাদোপম মন্দির তাঁদের বসত বাটীর নিকটে অর্থাৎ বিজয় চাঁদ রোডের অপর পাশে মিঠা পুকুরের গলির ভিতর প্রতিষ্ঠা করেন।

ইং ১৮৬৬ সালে মহারাজাধিরাজ মহাতাব চাঁদের বয়স হয় ছেচল্লিশ এবং মহিষী নারায়ণ কুমারীর বয়স তখন ছত্রিশ বছর। তাঁদের ধারণা হলো যে তাঁদের আর সন্তানের পিতামাতা হবার সম্ভাবনা নেই। তাছাড়া মহাতাব চাঁদ বহু বিবাহের ঘোর বিরোধী। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ২৮শে ফেব্রুয়ারী সন ১২৩৫ সালে ৮ই ফাল্গুন তারিখে, পাঞ্জাব প্রদেশস্থ্ সরহিন্দ নিবাসী জওলা নাথ কাপুরের পুত্র প্যারালাল

কাপুরের কন্যা নয়ন কুমারীর সহিত মহারাজা মহাতাব চাঁদ বাহাদুরের প্রথম বিবাহ হয়। কিন্তু ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ২৭শে জুন, সন ১২৪৭ সালের ৪ঠা আষাঢ় তারিখে একটি কন্যা প্রসব করিয়া সাত দিনের মধ্যেই পরলোক গমন করেন। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে ২৪শে জুন, সন ১২৫১ সালের ১২ই আষাঢ় তারিখে মহারাজাধিরাজ মহাতাব চাঁদ অযোধ্যা প্রদেশস্থ বেরুচ নিবাসী কেদার নাথ নন্দের কন্যা শ্রীমতি নারায়ণ কুমারী দেবীকে বিবাহ করেন। মহাতাব চাঁদ নারায়ণ কুমারীর শ্রদ্ধা ও গভীর অনুরাগে মুগ্ধ। সে কারণে মহাতাব চাঁদের কোন ইচ্ছা ছিল না তিনি পুনরায় বিবাহ করে নারায়ণ কুমারীর মনে আঘাত দেন। তাঁরা ঠিক করেন নারায়ণ কুমারীর ভ্রাতা বংশগোপাল নন্দের পুত্র ব্রহ্মপ্রসাদকে দত্তক নেবেন। সেই মতো ব্রহ্মপ্রসাদকে দত্তক নেওয়া হয় এবং দত্তক নেওয়ার পর তার নাম হয় আফতাব চাঁদ। মহাতাব চাঁদ সম্পাদিত দলিল পত্রে উল্লেখ আছে আফতাব চাঁদ পুত্র এবং তাঁর সমগ্র সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী, মহাতাব চাঁদ বাহাদুর লছমী নারায়ণ খান্নার কন্যা বিনোদেয়ী দেবীর সাথে আফতাব চাঁদের বিবাহ দেন। ৬নং মহাতাব রোড খান্নাজী ঠাকুর বাড়ী হচ্ছে লছমী নারায়ণ খান্না প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রী লছমী নারায়ণ জীউ এবং শ্রীশ্রী নর্ম্মদেশ্বর শিব ঠাকুরের মন্দির বর্তমান। আফতাব চাঁদের বিবাহের দুই বৎসর পর মহাতাব চাঁদের দেহাবসান হয়। ১৮৮১ সালে আফতাব চাঁদের একুশ বছর বয়সে সাবালকত্ব প্রাপ্তি হলে মহারাজাধিরাজ উপাধি দ্বারা সম্মানিত হন। আফতাব চাঁদ মাত্র পঁচিশ বছর জীবিত ছিলেন। ইং ১৮৮১ সালে তিনি রাজা হন এবং ১৮৮৫ সালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মাত্র পাঁচ বছর আফতাব চাঁদ রাজা ছিলেন। মহাতাব চাঁদের মৃত্যুর ছ-বছর পর আফতাব চাঁদের মৃত্যু হয়। আফতাব চাঁদের মৃত্যুর সময় আফতাব মহিষী বিনোদেয়ী দেবী নাবালিকা মাত্র চোদ্দ বছর বয়স। আফতাব চাঁদের মৃত্যুর পর দত্তক পুত্র গ্রহণ করা নিয়ে বিনোদেয়ী দেবীর সাথে তাঁর শাশুড়ী মাতার অর্থাৎ নারায়ণ কুমারী দেবীর ঘোরতর বিরোধ দেখা দেয়। অনেক টাল মাটালের পর বিনোদেয়ী দেবী বনবিহারী কাপুরের পুত্র বিজনবিহারী কাপুরকে দত্তক নেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করায় শাশুড়ী মাতা নারায়ণ কুমারী দেবীর ইচ্ছা মাফিক বংশ গোপাল বাবুর পুত্রকে দত্তক নেওয়ার ব্যাপারে অস্বীকার করায় উভয় মহারাণীর মধ্যে মনোমালিন্য চরম আকার ধারণ করে। এই সময় রাজ সংসারে দত্তক নেওয়ার ব্যাপারকে নিয়ে তিনটি পক্ষ সংগঠিত হয়। রাজমাতা নারায়ণ কুমারী ও তাঁর ভ্রাতা বংশগোপাল নন্দে এক পক্ষ, নাবালিকা মহারাণী ও তাঁহার পিতা লক্ষ্মী নারায়ণ খান্নারা এক পক্ষ, এবং রাজ আশ্রিত ও অনুগত কর্ম্মচারী গণের সহিত রাজা বনবিহারী কাপুর এক পক্ষ। যাই হোক্ শেষ মেষ মহারাণী বিনোদেয়ী দেবীর ইচ্ছামত রাজা বন বিহারী কাপুরের পুত্র শ্রীমান বিজনবিহারী কাপুরকে দত্তক পুত্র

হিসাবে গ্রহণ করা হয়। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ৩১শে জুলাই তারিখে মহারাণী অধিরাণী বিনোদেয়ী দেবী শাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে বিজনবিহারীকেই দত্তক-পুত্র গ্রহণ করে মহারাজ কুমার শ্রীমান বিজয়চাঁদ মহাতাব বাহাদুর নাম প্রদান করেন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে ১৩ই মে তারিখে মহারাণী অধিরাণী বিনোদেয়ী দেবী, পুত্রের চূড়াকরণ সম্পাদন করিবার পরেই ১৯ বৎসর বয়ঃক্রম কালে পরলোক গমন করেন। সন ১৩০৪ সালের ২৫ শে অগ্রহায়ণ ইং ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে লাহোর নিবাসী ঝাণ্ডামল মেহেরার কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী রাধারাণী দেবীর সহিত মহারাজ বাহাদুর বিজয় চাঁদের বিবাহ মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হয়। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ১৯শে অক্টোবর বর্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ শ্রী বিজয়চাঁদ মহাতাব সাবালকত্ব প্রাপ্ত হইয়া, কোর্ট অব্ ওয়ার্ডের নিকট হইতে বিশাল বর্ধমান রাজ্যের একাধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ মহাতাবের বিবাহের পর থেকেই রাজ-পিতামহী মহারাণী অধিরাণী নারায়ণ কুমারী দেবীর সমস্ত বিরোধ মিটে যায়। বিজয় চাঁদ মহাতাবের বিবাহ হয় বাংলার ১৩০৪ সালের ২৫শে অগ্রহায়ণ।

সময়ের পরিবর্তনের, সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যের ও পরিবর্তন ঘটে। নারায়ণ কুমারী দেবী সমস্ত বিবাদ ভুলে গিয়ে পুত্র সদৃশ রাজা বনবিহারী কাপুরকে আপন করে নেন। পৌত্র মহারাজ বিজয় চাঁদ মহাতাবকে এবং পৌত্রবধূ মহারাণী অধিরাণী শ্রীমতী রাধারাণী দেবীকে, স্বীয় অঙ্কে স্থাপন করে নারায়ণ কুমারী দেবী অতীতের সমস্ত বিদ্বেষভাব মন থেকে মুছে ফেলেন এবং পরম সুখে বর্ধমানের রাজলক্ষ্মী রূপে কাটিয়ে দেন। তারপরই পৌত্র বিজয়চাঁদ মহাতাবের তত্ত্বাবধানে বাংলা ১৩০৬ সালের ৩০শে ফাল্গুন তারিখে শ্রীশ্রী ভুবনেশ্বরী দেবীমূর্ত্তি ও নারায়ণেশ্বর শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

এই মন্দির রাজ প্রাসাদে মত বিশাল। মন্দিরের সামনে প্রবেশ পথে যে তোরণ আছে তারই উচ্চতা মনে হয় তিরিশ ফুটের উপর। সুদৃশ্য এই তোরণ দ্বারের পরই হচ্ছে বিশাল চত্বর বা উঠান। তারপর আর একটি প্রবেশ দ্বার অতিক্রম করে মূল মন্দিরের চত্বর। এই বিশাল মন্দির ইটালিয়ান স্থাপত্যে নির্মিত। চারিদিকে অসংখ্য ঘর। মুল মন্দিরে প্রবেশ করেই দেখা যাবে বিশাল নাট মন্দির। এখন পায়রার ত্যাজ্য পদার্থে একবারে অপরিষ্কার অবস্থায় ম্লান। নাট মন্দিরের সামনেই দক্ষিণমুখী বারান্দা সমেত মূল মন্দির। নাট মন্দিরের দক্ষিণ দিকে একটি প্রবেশ পথ। এই পথে প্রবেশ করেই দুইটি শিবমন্দির, সামনেই নারায়ণেশ্বর শিব মন্দির। সাদা পাথরের শিব লিঙ্গ। পাশের মন্দিরের শিব লিঙ্গটিও সাদা পাথরের। মূল মন্দিরের মাঝখানে রূপার সিংহাসনে আধিষ্ঠতা বেশ বড় আকারের অষ্ট ধাতুর নির্মিত শ্রীশ্রী ভুবনেশ্বরী দেবী মূর্ত্তি। মায়ের দক্ষিণ দিকে আর একটি সিংহাসনে সোনার কালী মূর্ত্তি। মায়ের

বাম দিকে স্থিতা আছেন চণ্ডীকা মূর্ত্তি। তার পাশের ঘরেই আছে পঞ্চ মুণ্ডির আসন। শোনা য়ায় নারায়ণ কুমারী দেবী যখন শ্রীশ্রী ভুবনেশ্বরী মায়ের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন তখন একটি অষ্টম বর্ষীয়া কুমারীকে ভুবনেশ্বীর দেবীর বেদী তলে জীবন্ত অবস্থায় পুঁতে মায়ের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হয়। আরও কথিত আছে, বর্ধমান রাজ প্রাসাদ থেকে একটি সুড়ঙ্গ পথ ছিল মন্দির পর্যন্ত। রাণী নারায়ণ কুমারী ঐ সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে প্রতিদিন মায়ের মন্দিরে দেবী দর্শনে যেতেন এবং মায়ের পূজা করতনে। মায়ের নিত্য পূজা হয় এবং অন্নভোগ এবং রাত্রে শীতল, ভোগ হয়। বৃহস্পতবিার বাদে অন্যান্য বারে মাছ সতি অন্নভোগ হয়। প্রতি অমাবস্যায় হোম যজ্ঞ হয়, চণ্ডীপাঠ হয়। আর প্রতি অমাবস্যায় ১০৮টি পাতি লেবুর মালা তৈরী করে মায়ের গলায় পরি য়ে দেওয়া হয় এবং প্রতিপদে ঐ মালা খুলে নেওয়া হয়। বাৎসরিক কালীপূজায় মায়ের খুব ধূম-ধাম করে পূজা হয়। আগে ছাগ বলি হতো। এখন আর হয় না। দুর্গা পূজার সময়ও খুব ধূম-ধামে মায়ের পূজা হয়। অতীতে বিশাল নাট মঞ্চে , বাউল গান, কৃষ্ণযাত্রা, ভগবৎ পাঠ, গীতা পাঠ, রামায়ণ গান প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হতো। এখন ওসমস্ত বন্ধ হয়ে গেছে। অতীতের সেই জৌলুস আর নেই। কোন রকমে নিজের অস্তিত্ত্ব বজায় আছে। বর্তমানে পূজা-আর্চা, মন্দিরের সব কিছুর ভার মহাতাব ট্রাষ্ট এর উপর ন্যস্ত। ডঃ প্রণয় চাঁদ মহাতাবই সেবাইত হিসাবে সমস্ত কিছু দেখাশুনা করেন।

খান্নাজী ঠাকুর বাড়ী

বর্ধমান রাজবাটীর উত্তর ফটকের সামনে দিয়ে উত্তর মুখে যে রাস্তাটি শূলি পুকুরের পাশ দিয়ে কৃষ্ণ সায়রের পূর্ব্বপার যাচ্ছে ঐ রাস্তাটির নাম মহাতাব্ রোড্। ঐ মহাতাব রোডের ৬নং বাড়ীটিই হচ্ছে খান্নাজী ঠাকুর বাড়ী। এই ঠাকুর বাড়ী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মহারাজা আফতাব চাঁদের শ্বশুর মশাই লছমী নারায়ণ খান্না। এই লছমী নারায়ণ খান্নার কন্যা বিনোদেয়ী দেবীর সঙ্গে মহারাজ আফতাব চাঁদ বাহাদুরের বিবাহ হয়। আফতাব চাঁদের বয়স যখন বার বছর তখন মহাতাব চাঁদ পুত্রের জন্য পাত্রীর সন্ধান করতে লাগলেন। মহাতাব চাঁদ, সুদূর পাঞ্জাবে দুই ঘটক নিযুক্ত করলেন পাত্রীর সন্ধানে। তাঁরা সম্ভ্রান্ত ক্ষেত্রী বাড়ীতে পাত্রীর সন্ধান দিলেন মহাতাব চাঁদকে। মহাতাব চাঁদ পাত্রীর অভিভাবকের সঙ্গে বেশ কথাবার্তা এগোবার পর হঠাৎ চুপচাপ হয়ে গেলেন। তিনি ভবিষ্যতে গোলমালের আশঙ্কায় যোগাযোগ ছেদ করে দেন। এর কিছুদিন পর দেখা গেল পাত্রীর সন্ধান আবার খুব জোর চলছে।

অবশেষে পাওয়া গেল লছমী নারায়ণ খান্না নামে দিল্লীর এক অধিবাসীকে। লছমী নারায়ণ বাবুর পরিচয় খুব ভাল। বংশ মর্যাদা রক্ষা কল্পে তিনি তাঁর সাত বছরের কন্যা বিনোদেয়ী দেবীকে আফতাব চাঁদের হাতে সঁপে দিতে মনস্থ করলেন। যখন এ বিবাহের কথা দিল্লীর প্রাচীন পন্থীরা জানতে পারলেন যে বিনোদেয়ী দেবীকে বর্ধমানে আধুনিক পন্থী কোন সমাজে বিবাহের ব্যবস্থা হচ্ছে, তখন খুবই বিরুদ্ধ তা দেখা দিল। লছমী নারায়ণ বাবুর স্ত্রী, পাত্রী-মাতার ওপর খুবই চাপ আসতে থাকে গোঁড়া ক্ষেত্রী মহল থেকে। তাঁরা বলেন, কন্যা বিনোদেয়ী দেবীর মাতা কোকা দেবী যেন অতি অবশ্য তাঁর কন্যা নিয়ে বাপের বাড়ী চলে যান। ক্ষেত্রী মহলের পরামর্শ অনুযায়ী লছমী নারায়ণের স্ত্রী কন্যা বিনোদেয়ী দেবীকে নিয়ে বাপের বাড়ী চলে গেলেন। এর ফলে লছমী নারায়ণ কোর্টে মামলা করলেন তিনি যেন কন্যাকে তাঁর কাছে রাখবার অধিকার পান। মামলায় লছমী নারায়ণ বাবু কন্যাকে তাঁর কাছে রাখবার অধিকার পেলেন বটে তবে কন্যার মাতাকে রাখার অধিকার পেলেন না। তার জন্য লছমী নারায়ণ বাবুকে পুনরায় মামলা করতে হয়। এবার কোকাদেবী তাঁর স্বামীর কাছে না থাকার নানা রকম অভিযোগ আনলেন স্বামীর বিরুদ্ধে। তবে সবচেয়ে বড় অভিযোগ আনলেন বর্ধমান শহরে মহারাজ আফতাব চাঁদের সাথে

আধুনিক পরিবারে কন্যার বিবাহ দিলে তিনি সমাজচ্যুত হবেন। কিন্তু কোকাদেবীর যুক্তি গ্রাহ্য হলো না। লছমী নারায়ণ বাবুর দ্বিতীয় মামলায় জিত হল। কোকাদেবী স্বামীর গৃহে ফিরে যেতে বাধ্য হলেন।

বিবাহ ব্যবস্থায় হাঙ্গামা হতে পারে যদি দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয়। এ কারণে বর্ধমানে পাত্রীকে নিয়ে এসে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করার জন্য ঠিক হলো। লছমী নারায়ণ বাবু সপরিবার, আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে বর্ধমানে উপস্থিত হলেন অতি গোপনে। কন্যাপক্ষের জন্য এক বাড়ী ঠিক রাখা ছিল। সেখানে তাঁরা উঠলেন। মাসিক খরচের ব্যবস্থা হয় প্রথমে একশ টাকা। পরে মাসিক খরচের ব্যবস্থা করা হয় দুশো টাকা। লছমী নারায়ণ বাবুর জন্য এক গৃহ নির্মাণ করা হলো। এরপর মহারাজ আফতাব চাঁদ বাহাদুরের সাথে লছমী নারায়ণ কন্যা বিনোদেয়ী দেবীর বিবাহ হয়। আফতাব চাঁদের বিবাহের দুই বছর বাদ মহাতাব চাঁদের দেহাবসান হয়।

কন্যার বিবাহ দেবার পর লছমী নারায়ণ বাবু দেব সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেন এবং তাঁরই প্রতিষ্ঠিত ঠাকুর বাড়ী খান্নাজী ঠাকুর বাড়ী নামে খ্যাত। মন্দিরের প্রবেশ দ্বারের উপরে মন্দির গাত্রে শ্বেত পাথরে খোদিত আছে নিম্নলিখিত শিলালিপি ঃ

"লছমী নারায়ণ খান্নাজীর প্রতিষ্ঠিত
শ্রীশ্রী লছমী নারায়ণ জীউ এবং শ্রীশ্রী নর্ম্মদেশ্বর
শিব ঠাকুরের মন্দির
বর্ধমানাধিপতি
মহারাজধিরাজ বাহাদুর স্যার বিজয়চাঁদ মহাতাব,
জি. সি. আই. ই. কে. এস. আই. আই. ও. এস.
কর্তৃক নির্মীত ও স্থাপিত।

ভিত্তিপত্তন—সন ১৩৩৮, ২৫শে চৈত্র, প্রতিষ্ঠিত—সন ১৩৪০—৩১শে শ্রাবণ।

মন্দিরের প্রথমেই সদর অর্থাৎ প্রবেশ পথ। তারপর মন্দির চত্বর বা উঠান এবং দক্ষিণমুখী মূল মন্দির। এই বিশাল চত্বরেই আগে বহু ভাল ভাল অনুষ্ঠান হতো এবং প্রচুর লোক সমাগম হতো।

মন্দিরের এই শিলালিপি থেকে বোঝা যায় মহারাজাধিরাজ স্যার বিজয়চাঁদ মহাতাবই এই মন্দির সুন্দরভাবে নির্মাণ করে দেন। রক্ষণা-বেক্ষণের জন্য, পূজা-আর্চার জন্য মানকরের নিকট ছয় হাজার বিঘা বনভূমি দেন। কিন্তু জমিদারী প্রথা বিলোপ আইনের ফলে ঐ সম্পত্তি আর নাই। কমপেন্‌সেশনের টাকা যা পাওয়া যায় সেই টাকা দিয়ে একটি ট্রাষ্ট কমিটি গঠন করে পূজা-আর্চা এবং মন্দির রক্ষণা-বেক্ষণের ভার ন্যস্ত।

এই মন্দিরের মূল বিগ্রহ হচ্ছে নারায়ণ শিলা এবং শ্রীশ্রীনর্ম্মদেশ্বর শিব। এছাড়াও আছে পিতলের রাধা-কৃষ্ণ মূর্ত্তি। শোনা যায় নর্মদা নদী থেকে এই নর্ম্মদেশ্বর শিবের শিলাটি সংগৃহীত। এটি অদ্ভুত দেখতে। একেবারে সাদা রঙের এবং ডিমের সাইজের ডিম্বাকৃতি। খুব সাদা এই শিলাটির মাঝখানে মনে হয় যেন সাদা পৈতে দিয়ে বেষ্টিত। এরকম শিলা সচরাচর দেখা যায় না। এই মন্দিরে নিত্য পূজা হয়। পূজার তত্ত্বাবধানে আছেন শ্রী বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়। বৈষ্ণব ধর্মের সমস্ত কিছু উৎসব এখানে হয়ে থাকে। যেমন জন্মাষ্টমী, রাধাকৃষ্ণের ঝুলন উৎসব, রাস উৎসব, দোল উৎসব, অন্নকূট প্রভৃতি হয়ে থাকে। আগে এখানে খুব ধূম-ধাম করে উৎসব হতো। যাত্রা গান, কৃষ্ণযাত্রা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হতো। এখন ঐ সমস্ত অনুষ্ঠান হয় না। তবে জন্মাষ্টমী ও ঝুলনে মন্দির ভালভাবে সাজান হয়। ধূম-ধাম করে পূজা হয়। এখন মন্দির পরিচালনার ভার 'ট্রাষ্ট কমিটি'র উপর ন্যস্ত।

খাজা আনোয়ার বেড়ের দেবী দক্ষিণা কালী

খাজা আনোয়ার বেড় উচ্চ বিদ্যালয়ের সামনেই এই দক্ষিণা কালী দেবীর মন্দির অবস্থিত। এই মন্দির সংলগ্ন দুটি শিব মন্দির আছে। একটি মন্দিরে শিব লিঙ্গ নেই। আর একটি মন্দিরে শিব লিঙ্গ বর্তমান এবং নিত্য পূজাও হয়। একটু এগিয়ে এলে আর একটি শিব মন্দির নাম সতীনাথ শিবের মন্দির।

এই কালী মন্দির কতদিন আগে নির্মিত হয়েছিল বা দেবী কালী মূর্ত্তি কার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সে বিষয়ে সঠিক কোন তথ্য পাওয়া যায় নাই। তবে এই দেবী মূর্ত্তি গ্রাম্য দেবী রূপে প্রায় দুশো বছর স্থানীয় অধিবাসীদের ভক্তি শ্রদ্ধায় অর্চিত ও পূজিত হয়ে আসছেন। এই মন্দিরের বর্তমান সেবাইত বর্ধমানের বিশিষ্ট সমাজ-সেবিকা, বর্ধমান ভারতী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাত্রী শ্রীমতী ভারতী দেবী। মায়ের নিত্য পূজার জন্য দায়িত্বে আছেন শ্রী অশোক চট্টোপাধ্যায়। উনি ঐ অঞ্চলেরই অধিবাসী। বাৎসরীক কালীপূজা, প্রতি অমাবস্যায় চণ্ডীপাঠ প্রভৃতি অনুষ্ঠানের দায়িত্বে আছেন শ্রী সুধীর ভট্টাচার্য্য স্মৃতি তীর্থ মহাশয়। এই দেবীর অধিষ্ঠান এবং প্রাণ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে শ্রদ্ধেয়া ভারতী দেবীর নিকট হতে যে তথ্য পেয়েছি তা হচ্ছেঃ প্রায় দুই শত বর্ষ পূর্ব্বে একদিন তৎকালিন মহারাজাধিরাজ বাহাদুর বেড়, কাঞ্চননগর প্রভৃতি অঞ্চলে মৃগয়ার ইচ্ছায় সপারিষদ ভ্রমণ করতে যান। ভ্রমণ করতে করতে হঠাৎ তাঁরা দেখতে পান এই স্থানে একটি বেল গাছের তলায় এক দিব্যকান্তি তরুণ সন্ন্যাসী ধ্যানরত। ধারে কাছে তখন কোন লোকালয় ছিল না, বা কোন গৃহস্থের বাড়ীও ছিল না। ঐ নির্জন স্থানে সন্ন্যাসী একা কিভাবে দিনাতিপাত করেন, বা তাঁহার আহার বাসস্থানের বিষয়ে রাজা বাহাদুর কৌতূহলী হয়ে উঠেন। তিনি তাঁর কর্মচারীদের এ বিষয়ে খোঁজ খবর নিতে বলেন। পরে মহারাজা কর্মচারীদের মারফৎ জানতে পারেন ঐ সন্ন্যাসী উত্তর প্রদেশ হতে আগত এবং হিন্দি ভাষী ও ফলাহারী। দিনান্তে যা ফলমূল পান তাই আহার করেন। যেদিন ফল না পান সেদিন শুধু বেলপাতা চিবিয়ে জল খেয়ে কাটিয়ে দেন। তিনি স্বপ্নাদেশ পেয়ে এই স্থানে দেবী কালিকার ধ্যান ও আরাধনায় দিন রাত্রি নিমগ্ন থাকেন। তাঁর কোন সংসারের প্রতি আসক্তি নেই, জীবিকার জন্য কোন চিন্তা নেই, বা কোন মানুষ জনের সঙ্গের প্রয়োজন ও অনুভব করেন না। মহারাজা ঐ তরুণ দিব্যকান্তি সন্ন্যাসীর সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিয়ে নিজে তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে উপযাচক হয়ে কিছু করতে চাইলেন। তখন ঐ সন্ন্যাসী রাজাকে শুধু একটি প্রার্থনাই জানালেন যে তিনি যে দেবী কালিকার

আরাধনা করছেন তাঁকে তিনি এই স্থানে প্রতিষ্ঠা করতে চান। আর তার কোন চাহিদা নাই। রাজা খুশী হয়ে তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন ও একটি ছোট কালীমন্দির, তৎসংলগ্ন বেলগাছের নিকট দুটি শিব মন্দির নির্মাণ করে দিলেন। সন্ন্যাসী সেই মন্দিরেই শিব ও কালিকার পূজা, আরধনায় নিজেকে নিয়োজিত করলেন। মহারাজা মাঝে মাঝে লোক জন পাঠিয়ে তাঁর খোঁজ খবর নেন অন্ততঃ তিনি যাতে উপবাসী না হন তাঁর ব্যবস্থাও তিনি করেন। তখন সন্ন্যাসীর বয়স আন্দাজ ২৪/২৫ বছর। বেশ কিছুদিন বাদে মহারাজা আবার একদিন মন্দিরে এসে দেখেন একটি অতি সুন্দরী বালিকা মন্দিরে তাঁর মায়ের সাথে পূজা দিতে এসেছে। উদাসীন সন্ন্যাসী সেই মেয়েটিকে অপলক সরল দৃষ্টিতে দেখছেন কিন্তু কোন কথা জিজ্ঞাসা করছেন না কারণ তিনি তো বাংলা ভাষা জানেনও না, বোঝেনও না। উৎসুক মহারাজ সন্ন্যাসীকে হিন্দিতে জিজ্ঞাসা করেন বালিকাটিকে তাঁর ভাল লেগেছে কিনা। ঐ সন্ন্যাসী তখন অকপটে জানান যে তিনি ঐ বালিকাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। পরে মহারাজা ঐ সন্ন্যাসীকে গৃহী করতে আগ্রহী হয়ে ঐ বালিকার সাথে সন্ন্যাসীর বিয়ে দিয়ে দেন। বেড়ের সংলগ্ন এলাকাতেই বালিকার বাবা-মায়ের বাড়ী ছিল। সে বাবা-মায়ের কাছেই থাকত। সন্ন্যাসী কালী মন্দিরেই থাকতেন। কয়েক বছর পরে সন্ন্যাসীর বালিকা পত্নী যখন যৌবন প্রাপ্তা হন তখন সন্ন্যাসী তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন এবং পত্নীর গর্ভে সন্তান আসে। তখন সন্ন্যাসীর নিজের এই অসংযমের জন্য অনুশোচনা হয় এবং তিনি বলেন যে তাঁর স্ত্রী গর্ভে যে সন্তান আসছে তার ভূমিষ্ট হবার আগেই যেন সন্ন্যাসীর মৃত্যু হয়।

সত্যই যখন তিনি প্রাণ ত্যাগ করেন তখনও তাঁর সন্তান জন্ম গ্রহণ করে নাই। সন্ন্যাসীর মৃত্যুর প্রায় দুই মাস পর একটি পরমা সুন্দরী কন্যাসন্তান জন্ম লাভ করে। মহারাজা এবং রাণীমা সন্ন্যাসীর স্ত্রী ও কন্যার সব ভার গ্রহণ করে তাঁদের রাজ বাড়ীতে নিয়ে আসেন এবং যথাযথ মর্যাদায় তাঁদের প্রতিপালন করেন। ঐ কন্যার নাম রাখেন চারুশীলা দেবী। মাতার নাম ছিল গৌরী দেবী। পরবর্তীকালে মহারাজা উত্তমলাল মিশ্র নামে উত্তর প্রদেশের এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সাথে চারুশীলার দেবীর বিবাহ দেন এবং উত্তমলাল মিশ্রকে তাঁর চতুষ্পাঠীর পণ্ডিত হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন। এই উত্তমলাল মিশ্র ও চারুশীলা দেবীই ঐ মন্দিরের সেবাইত রূপে পূজার যাবতীয় কাজ চালাতেন। উত্তমলাল মিশ্র ও চারুশীলা দেবীর পাঁচ সন্তান ছিলেন—দুই পুত্র ও তিন কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্র তারা কুমার মিশ্র (ইনি বর্ধমানের একজন সুযোগ্য সন্তান) এবং কনিষ্ঠ পুত্র কালীকুমার মিশ্র, ইনিও ব্যাকরণ তীর্থ ও সংস্কৃত পণ্ডিত ছিলেন। দুই ভাই বর্ধমানে শিক্ষকতা করেছেন। তাঁরা কেউই জীবিত নাই। ভারতী দেবী ওঁনাদেরই মেজ-দিদি। তিনিও শতবর্ষে পদার্পন করতে পারলেন

না। গত ১২ই বৈশাখ ১৪০৬ ইং ২৬শে এপ্রিল ১৯৯৯ তারিখে রাত্রি ৯-৩০ মিঃ ৯৮ বছর বয়সে দেহ রাখেন। ঐ ভারতী দেবীই বর্তমান কালী মন্দিরের সেবাইত ছিলেন। কালীমা ভারতী দেবীর কালী নামেই পরিচিতা।

ভারতী দেবী একজন শিক্ষিকা ছিলেন। তিনি অবসর নেবার পর তাঁর সঞ্চিত অর্থ দিয়ে একটি ট্রাষ্ট কমিটি নিযুক্ত করেছেন। এই ট্রাষ্ট কমিটির নাম দেওয়া হয়েছে "ভারতী সেবা সমিতি"। এই সমিতির উপরই মন্দির রক্ষণা বেক্ষণ, পূজা আর্চা প্রভৃতি সমস্ত কিছু পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত। তিন বছর আগে এই সমিতি মন্দির সংস্কার করেছে। মায়ের নিত্য পূজা হয়। বিশেষ বিশেষ বারে মায়ের ভক্তদের উপস্থিতি ভালই হয়। প্রতি মাসের অমাবস্যায় চণ্ডীপাঠ হয়। বাৎসরিক কালীপূজা খুবই ধূম-ধাম করে সম্পন্ন করা হয়। বহু পূর্ব্বে ছাগ বলি হতো। কিন্তু এখন মাখা সন্দেশের মণ্ড করে বলি হয়। ঐ বাৎসরিক কালী পূজার রাত্রে বহু ভক্ত মায়ের ভোগের প্রসাদ গ্রহণ করেন। মায়ের কাছে অনেকেই মানসিক করেন। মা তাঁদের মনোবাঞ্ছা পূরণ করেন।

বিজয়ানন্দ বিহার ও বিজয়ানন্দেশ্বর শিব

মহারাজ বিজয় চাঁদ মহাতাব ধর্মপরায়ণ, প্রতিভাবান, সাহিত্যিক, সঙ্গীতজ্ঞ সর্ব্বোপরি প্রজাবৎসল ছিলেন। ইংরাজী এবং বাংলা সাহিত্যে তাঁর অসাধরণ জ্ঞান ছিল। মহারাজা বিজয়চাঁদ মহাতাবই অষ্টম বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলনের উদ্যোগী ছিলেন। এই বর্ধমানে অষ্টম-বঙ্গীয়-সাহিত্য সম্মলনের অনুষ্ঠানে যে সমস্ত বিখ্যাত বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি ছিল তা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই সম্মিলনীর সভাপতি ছিলেন শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়। এই অনুষ্ঠান বর্ধমানের গোলাপবাগে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এর থেকেই প্রমাণিত যে মহারাজ বিজয়চাঁদ বঙ্গ সাহিত্যকে খুব সমাদর করতেন। তিনি নিজেও একজন সাহিত্য-প্রেমী ছিলেন। তাঁর সাহিত্য সৃষ্টি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। আঠারো বছর বয়সে তাঁর রচিত 'মনঃ শিক্ষা' নামক গীতি কাব্যে নিজেকে উদ্দেশ্য করে লিখেছিলেন জীবনের অসাড়তা। তাঁর কথায়,'ধুলিতে জীবন মিশে যায় যখন সময় হয়। তবে মানুষকে কর্ম করতে হবে। কর্মের ভেতর দিয়ে মানুষকে এগিয়ে যেতে হবে। অবশেষে কর্মক্ষয়ে তার মুক্তি হবে'। আধ্যাত্মিক জীবনের কথা তাঁর লিখিত দু-তিনটি পুস্তকে দেখা গেলেও তিনি বাস্তব জীবনকে উপেক্ষা করেন নি। প্রজার প্রতি যে তাঁর কর্ত্তব্য আছে সে কথা তিনি সব সময় মনে রাখতেন। ফলে তাঁর আধ্যাত্মিক এবং বাস্তব জীবনের সাথে সমন্বয় রেখে ইংরাজীর ১৯০৫ সালে তিনি 'রমনার বাগ' নামক স্থানে প্রায় বারো ফুট এক সুউচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত আশ্রম নির্মাণ করেন। এই আশ্রমের নাম দেন 'বিজয়ানন্দ বিহার'। গোলাপবাগের পূর্ব্ব দিকে এই রমনার বাগান। এই সুন্দর রমনীয় উদ্যানের ভিতরেই প্রতিষ্ঠিত 'বিজয়ানন্দ বিহার'। তবে এও শোনা যায় মহারাজা মহাতাব চাঁদ এক সময় ব্রাহ্ম ধর্মের প্রতি খুব অনুরক্ত হন। মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের সংস্পর্শেই তিনি ব্রাহ্ম ধর্মের প্রতি আসক্ত হয়েছিলেন। আশ্রম নির্মাণের পরিকল্পনা তাঁরই ছিল। তবে "বিজয়ানন্দ বিহার" মহারাজা বিজয় চাঁদেরই সৃষ্টি। তিনি এই সুউচ্চ প্রচীরের ভিতরে শঙ্করাচার্য্যের মোহ মুদগর শ্লোক উৎকীর্ণ করেছিলেন।

মন্দিরের উত্তর গায়ে এক লাল পাথরের স্তম্ভের একদিকে মহারাজ বিজয় চাঁদ মহাতাব তাঁর মনোমত শঙ্করাচার্য্যের শ্লোক উৎকীর্ণ করেছিলেন। স্তম্ভের অপর গাত্রে বাংলায় এই কথাগুলি লিপিবদ্ধ করেছিলেন ঃ—

"ওঁ নমঃ পরমাত্মনে
বর্ধমান রাজের রমনা উদ্যানের উত্ত
রাংশে এই স্থান বর্ধমানধিপতি
মহারাজধিরাজ বাহাদুর রাজশ্রী বিজয়
চাঁদ মহাতাব বঙ্গাব্দ ১৩১১ সালে
সংস্কার করিতে আরম্ভ করেন্। পরন্তু
দেবী ইচ্ছায় সুদীর্ঘকাল কার্য্য বন্ধ
থাকে পরে, পুনরায় সন ১৩২০ সাল
হইতে ইহার নির্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইয়া
সন ১৩২২ সালের বৈশাখ মাসের মধ্যে
প্রধান প্রধান কাজগুলি সম্পন্ন হয়।
পরম পিতা বিশ্বেশ্বরের প্রীত্যর্থে উদ্যান
মধ্যস্থিত সরোবরের মুক্তি গিরি নাম প্রদান
পূর্ব্বক তার সুপ্রতিষ্ঠিত কার্য্য ৪ঠা আষাঢ়
তারিখে সমাপনান্তে উহার উত্তরাংশে
একটি নূতন শিবালয় স্থাপন কবত পূর্ব্বভাগে
দুটি ও পশ্চিম দিকে দুইটি পুরাতন মন্দির
সংস্থাপিত করেন এবং উদ্যানের
দক্ষিণাংশে অর্জ্জুন বিটপি মূলে
নিজ সাধনাসন সংস্থাপন করত
উদ্যানের অপরাপর অংশ দেবো
পবনের উপযোগী করেন। অনন্তর
নিজ আধ্যাত্মিক নাম শ্রী বিজয়া
নন্দ সংযোজনে এই স্থানকে বিজয়া
নন্দ বিহার আখ্যা প্রদান করিয়া
ইহার দক্ষিণ বনের নাম প্রণব বন
ও পূর্ব্ব বনের নাম নিব্বর্বাণ বন
নির্দ্দেশ করত সদাশিবকে সহস্রবার
ধ্যান করিয়া এই সমগ্র দেবোপবন
ভগবান মহেশ্বররের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ
করিলেন। উত্তর মন্দিরে বিজয়া
নন্দের সাধনা লভ্য বিজয়া নন্দেশ্বর

· শিবের প্রতিষ্ঠা কার্য্য পূর্ব্ব দিকের দুইটি
মন্দিরে দক্ষিণা মূর্ত্তি শিব ও
মহাপ্রণবের সংস্থাপন এবং পশ্চিম
দিকের দুইটি মন্দিরে জগদ্‌গুরু
শ্রী শঙ্করাচার্য্য ও করনাবতার
সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তি
স্থাপন সন ১৩২২ সালের ১৩ই
জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতি বারে তৎ ক-
র্ত্তৃক সম্পাদিত হইল।
ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি।

এই শিলালিপি থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ মহাতাব ১৩১১ সালে রমণার উদ্যানের সংস্কার আরম্ভ করেন। প্রায় নয় বৎসর কাল কাজ বন্ধ থাকার পর পুনরায় ১৩২০ সালে এই বিহারের কাজ আরম্ভ হয় এবং ১৩২২ সালের বৈশাখ মাসের মধ্যে প্রধান প্রধান কাজগুলি সম্পন্ন হয়। ঐ উদ্যান মধ্যস্থিত যে সরোবরটি রয়েছে উহার সুপ্রতিষ্ঠিত কার্য্য ৪ঠা আষাঢ় তারিখে সমাপ্ত করে ঐ সরোবরটির নাম দেন "মুক্তি গিরি"। 'মুক্তি গিবি'র উত্তরাংশে আগ্রার ফতেপুর সিক্রির পরিকল্পনা অনুসারে তিনি লাল পাথরের শিব মন্দির স্থাপন করেন। সদা শিবকে সহস্রবার ধ্যান করিয়া এই সমগ্র দেবোপবন ভগবান মহেশ্বরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিয়া বাংলা সন ১৩২২ সালের ১৩ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার তাঁর সাধনা লভ্য বিজয়ানন্দেশ্বর শিব প্রতিষ্ঠা করেন। এই শিব লিঙ্গের বিশেষত্ব হচ্ছে কালো পাথরের গৌরী পট্টের উপর প্রায় এক ফুট ব্যাসের সাদা শিবলিঙ্গ এবং মাথায় বজ্র। ঐ মন্দিরের ভিতরে পিছনের দেওয়ালে সুন্দর কারুকার্য্য খচিত শ্বেত পাথরের উপর খোদাই করা 'ওঁ' চিহ্ন এবং জলের উপর পদ্ম কুঁড়ি, পদ্ম পাতা ও প্রস্ফুটিত পদ্মফুল খোদাই করা আছে। কি অপূর্ব কারুকার্য্য। এই বিজয়ানন্দেশ্বর শিবের ঠিক সোজা সুজি এক সরল রেখায় অবস্থিত মুক্তি গিরির ঠিক দক্ষিণ পাড়ে মহারাজ বিজয় চাঁদ মহাতাবের লাল পাথরের তৈরী সমাধি মন্দির। সুন্দর অবস্থান। সামনেই জলের ফোয়ারা ছিল। বর্তমানে বিলুপ্ত। এই সমাধি মন্দিরের ঠিক পশ্চিমে অর্থাৎ মুক্তি গিরির ঠিক দক্ষিণ পশ্চিম কোণে মহারাজ উদয় চাঁদ মহাতাবের সমাধি বেদী।

এই উদ্যানের দক্ষিণাংশে 'মুক্তিগিরি'র প্রায় দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে এক অর্জুন বিটপিতলে বাঁধানো জায়গায় মহারাজা বিজয় চাঁদ মহাতাব সাধনার জন্য নিজ সাধনাসন নির্মাণ করেন। এই সাধনাসনটি খুব সুন্দর।

'মুক্তিগিরি'র পূর্ব্বপারে দুইটি পুরাতন মন্দির এবং পশ্চিম পারের দুইটি পুরাতন মন্দির সংস্থাপন করেন। পশ্চিম পারের দুটি মন্দিরই পূর্ব্বমুখী। একটি মন্দিরের ভিতরে শ্বেত পাথরের নারায়ণ মূর্ত্তি খোদাই করা। আর একটি মন্দিরে খোদাই করা আছে শ্বেত পাথরের পদ্মফুল হাতে মহালক্ষ্মীর মূর্ত্তি। এই দুটি মন্দিরের একটিতে মহারাজা বিজয় চাঁদ সংস্থাপন করেছিলেন জগদ্‌গুরু শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মূর্ত্তি। অপরটিতে সংস্থাপন করেছিলেন করনাবতার সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধের প্রতি মূর্ত্তি।

মুক্তিগিরির পূর্ব্ব পারে যে একজোড়া মন্দির আছে। তার একটি মন্দির দক্ষিণমুখী। এই মন্দিরের ভিতরের পিছনের দেওয়ালে শ্বেত পাথরের উপর খোদাই করা আছে সমুদ্রে জল থেকে ওঠা উদিত সূর্য্য এবং উপরে 'ওঁ' চিহ্ন। এই মন্দিরেই তিনি মহাপ্রণবের সংস্থাপন করেন। অপর মন্দিরটি উত্তরমুখী। এই মন্দিরের ভিতর মহারাজা বিজয়চাঁদ প্রতিষ্ঠা করেন শ্বেত পাথরের "শ্রী দক্ষিণা মূর্ত্তি শিব"। এই মূর্ত্তি খুব সুন্দর। চতুর্ভুজ মহা মৃত্যুঞ্জয় মূর্ত্তি পদ্মাসনে ধ্যানরত অবস্থায় স্থিত আছেন এই মন্দিরের ভিতরে। এই দুটি মন্দিরের ভিতরেই দেওয়াল গাত্রে "মাণ্ডুক্যোপনিষৎ" থেকে বহু শ্লোক শ্বেত পাথরের উপর খোদাই করা ছিল। এখন অস্পষ্ট হয়ে গেছে। আমি কয়েকটি শ্লোক এখানে উদ্ধৃত করছি ঃ—

'ওঁ'

।। মাণ্ডুক্যো-পনিষৎ ।।

।। ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ ।।

ওঁ ভ্রদং কর্নেভিঃ শৃণুয়াম দেবাং ভদ্রং পশ্যেমা ক্ষতির্যজত্রাঃ।
স্থিরৈবঙ্গৈস্তুষ্টু বাহ্য সস্তমূভিঃ। ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ।।
ভদ্রং নো অপিবাতয় মনঃ।।
ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ।।
ওঁ মিত্যতদক্ষর মিদঁ সর্ব্বং, তস্যোপব্যাখ্যাণং-ভূতং
ভবদ ভবিষ্যদিতি সর্ব্বমোঙ্কার এবা যচ্চান্যৎ ত্রিকালাতীতং তদপ্যেকাঁর।। ১।
সর্ব্বংহ্যেতদ্ ব্রহ্মায়মাত্মা ব্রহ্ম মোহয়মাত্মা চতুষ্পাৎ।। ২।
জাগরিত স্থানো বহিষ্প্রজ্ঞঃ সপ্তাস একোন বংশতি মুখঃ
সুলভুগ্ বৈশ্বানরঃ প্রথম পাদঃ।। ৩।
স্বপ্নস্থানো হন্তঃ প্রজ্ঞঃ সপ্তাস একোনি বিংশতি মুখঃ
প্রবিবিক্তভূক্ তৈজযো দ্বিতীয়ঃ পাদঃ।। ৪।

বিজয়ানন্দেশ্বর শিবের মন্দিরের উত্তর দিকে ঠিক নিচের অংশে বিজয়ানন্দেশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রণাম মন্ত্র একটি শ্বেত পাথরে খোদিত আছে।

উদ্যানের অপরাপর অংশ দেবোপবনের উপযোগী করিয়া অনন্তর নিজ আধ্যাত্মিক নাম শ্রীবিজয়ানন্দ সংযোজন করিয়া ঐ স্থানকে বিজয়া নন্দ বিহার আখ্যা প্রদান করেন এবং ইহার দক্ষিণ বনের নাম 'প্রণব বন' ও পূর্ব্ব বনের নাম 'নিবর্বাণ বন' নাম দেন।

বিজয়নন্দেশ্বর শিবের মন্দিরের ঠিক উত্তর দেওয়ালে অর্থাৎ বিহারের চারি ধারে সুউচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত সমস্ত প্রাচীর গাত্রেই শঙ্করাচার্য্যের যে মোহমুদগরের শ্লোক খোদিত আছে তার একটি শ্লোক যেটি শিব মন্দিরের ঠিক সামনা সামনি উত্তর দেওয়ালে সিমেণ্টের খোদিত সেই শ্লোকটি আমি এখানে উদ্ধৃ ত করছি। এই শ্লোকেরও কিছু অংশ বিলুপ্তঃ—

"আয়ুঃ কল্লোললোলং কতিপয় দিবমস্থায়িনী যৌবনশ্রী
অথঃ সঙ্কল্প কল্পা ঘন সময় তড়িদ্বিভ্রমা ভোগ পৃগাঃ।
কণ্ঠা শ্লেষোপ গূঢ়ত—ন—চিরংযত্ প্রিয়াভিঃ প্রণীতং
ব্রহ্মন্যাসক্ত শি—ভবভয়া স্তা ধিপায়ং প্লবস্তাম্।।

এই রকম শ্লোক চারিধারের বিশাল বিস্তৃত প্রাচীর গাত্রে খোদিত করেছিলেন। এই মন্দিরে প্রতি বছর ১৩ই জ্যৈষ্ঠ বিজয়ানন্দেশ্বর শিবের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয় এবং মহারাজা বিজয়চাঁদ মহাতাবের মৃত্যুবার্ষিকী খুব সমারোহে পালিত হয় প্রতি বছর রাধা অষ্টমী তিথিতে। ঐদিন খুব শুদ্ধাচারে পূজাপাঠ, গীতাপাঠ, চণ্ডীপাঠ করা হয়। গীতাপাঠ এবং চণ্ডীপাঠ করেন শ্রী সুধীর ভট্টাচার্য্য, স্মৃতি তীর্থ মহাশয়। ঐ দিন দরিদ্রদের দান করা হয়। আগে ঐ সমস্ত উৎসব মহাসমারোহে উদযাপিত হত। এখন ঐ অনুষ্ঠানগুলি উদ্‌যাপিত হয়। তবে বর্তমানে সে জৌলুস আর নাই।

এই বিজয়ানন্দ বিহারের সবচেয়ে বিখ্যাত উৎসব শিবরাত্রি উৎসব। ঐ দিন বহু ভক্ত সমাবেশ হয়। সারারাত ব্যাপী পূজা-আর্চ্চা চলে। বহুভক্তপ্রাণ নরনারী এ পূজায় অংশ গ্রহণ করেন এবং বিজয়ানন্দেশ্বর শিবের মাথায় জল ঢালেন।

প্রতি বছর ঐ উৎসবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ডঃ প্রণয়চাঁদ মহাতাব বা তাঁর অনুপস্থিতিতে যে কোন রাজ বংশধর উপস্থিত থেকে বিজয়ানন্দেশ্বরের পূজায় অংশগ্রহণ করেন এবং উৎসব পরিচালনা করেন। ঠিক সন্ধ্যা নামার সাথে সাথে গোটা উদ্যানে সাজান অসংখ্য মশাল এক সাথে জ্বলে উঠে পরিবেশকে একেবারে মনোরম করে দেয়। ভারী সুন্দর লাগে সেই দৃশ্য।

এই বিজায়নন্দ বিহারের ভিতরে ঢুকলে আগে মনে হতো এ যেন এক অন্য জগৎ। দামী দামী নানা রকমের দুর্লভ বৃক্ষ, নানা রকম সুন্দর সুন্দর পুষ্পশোভিত, বর্ডার প্ল্যাণ্ট দিয়ে চারিধার বেষ্টিত এই বিহারকে করেছে আরো রমণীয়। মহারাজ

বিজয়চাঁদ মহাতাব সহস্রবার ধ্যান করে তাঁর সাধনালব্ধ্য বিজয়ানন্দেশ্বরকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, তাঁকে শ্রী মৎশঙ্করাচার্য্য বিরচিত শিব পঞ্চাক্ষর মন্ত্রে প্রণাম জানাইঃ-

নগেন্দ্র হারায় ত্রিলোচনায়
ভস্মাঙ্গরাগায় মহেশ্বরায়।
নিত্যায় শুদ্ধায় দিগম্বরায়
তস্মৈ 'ন' কারায় নমঃ শিবায়।।
মন্দাকিনী সলিল-চন্দন চর্চ্চিতায়
নন্দীশ্বর—প্রমথ নাথ মহেশ্বরায়।
মান্দার পুষ্প বহু পুষ্প সু পুজিতায়
তস্মৈ 'ম' কারায় নমঃ শিবায়।।
শিবায় গৌরী বদনা বজ্রবৃন্দ—
সূর্য্যায় দক্ষধবর নাশকায়।
শ্রী নীলকণ্ঠায় বৃষধবজায়
তস্মৈ 'শি'-কারায় নমঃ শিবায়।।
বশিষ্ঠ্য কুম্ভোদ্ভব গৌতমার্য্য
মুনীদ্র-দেবার্চ্চিত-শেখরায়
চন্দ্রার্ক-বৈশ্বানর-লোচনায়
তস্মৈ 'বা' কারায় নমঃ শিবায়।।
যজ্ঞ স্বরূপায় জটাধরায়
পিনাক হস্তায় সনাতনায়।
দিব্যায় দেবায় দিগম্বরায়
তস্মৈ 'য়' কারায় নমঃ শিবায়।।
পঞ্চাক্ষর মিদং পুন্যং সঃ পঠেচ্ছিবসন্নিধৌ
শিব-লোকমবাপ্নোতি শিবেনসহমোদতে।।

বেলকাশের তারামা

বর্ধমান কাঞ্চননগর থেকে একটু উত্তর পশ্চি মে গেলেই বেলকাশ। তখন ঐ অঞ্চল গভীর জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। এখন বেলকাশ পঞ্চায়েত এলাকা। প্রায় ১৫০ বছর পূর্ব্বে এই বেলকাশে এক জন তন্ত্র সাধক কালী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করে সাধনা করতেন। একটি আশ্রমও করেছিলেন। ঐ সাধক ভক্তদের কাছে পাগলাবাবা নামে পরিচিত ছিলেন এবং তাঁর আশ্রমটিকে বলা হত বেলকাশের শ্রীশ্রী পাগলা বাবার আশ্রম। সাধকের বিরাট জটা ছিল এবং বিশাল দাড়ি ছিল। তাঁর এক ভৈরবীও ঐ আশ্রমে থাকতেন। ভক্তরা তাঁকে সাধুমা বলতেন। পাগলা বাবা বেলকাশের গভীর জঙ্গলে তারা মার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করে আশ্রম তৈরী করেছিলেন। বহু ভক্ত ঐ তারা মার কাছে গিয়ে পূজা দিতেন। মায়ের কাছে রোগ, ব্যাধি, প্রভৃতি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বা সন্তান কামনায় অথবা পরিবারের শান্তির জন্য অনেকেই মায়ের কাছে মানসিক করতেন। মাও নাকি তাঁদের মনস্কামনা পুরণ করতেন। এরপর পাগলা বাবার বয়সের ভারে অসুস্থ হয়ে পড়লে বাংলার ১৩৫৫ সালে অর্থাৎ প্রায় পঞ্চ াশ বছর আগে ঐ পাগলা বাবার একজন ভক্ত গোবিন্দ চন্দ্র গড়াই সাধু বাবা এবং মাকে তাঁর প্রতিষ্ঠিত তারা মাকে নিজের বাড়ি কোটাল হাটে নিয়ে এসে মন্দির নির্মাণ করে পূজার ব্যাবস্থা করেন। কয়েক বছর সাধুবাবা কোটাল হাটে মায়ের পূজা করেন। তারপর তিনি দেহ রাখেন। তাঁর মৃত্যুর কয়েক বছর পর সাধুমাও দেহ রাখেন। শ্রী সুধীর কুমার ভট্টাচার্য্য, স্মৃতিতীর্থ মহাশয় মায়ের নিত্য পূজায় নিযুক্ত আছেন। এখনও ঐ কোটাল হাটেই মায়ের নিত্য পূজা হয় এবং ঐ তারামা বেলকাশের তারা মা নামেই পরিচিত। বর্তমানে মায়ের পূজা-আর্চ্চার ব্যবস্থা করে আসছেন গোবিন্দ চন্দ্র গড়াই মহাশয়ের বংশ ধরেরা। মায়ের নিত্য পূজা হয়। বাৎসরিক পূজার সময় মায়ের খুব ধুম-ধাম করেই পূজা হয়। ঐ দিন বহু ভক্ত আসেন এবং মায়ের ভোগের প্রসাদ গ্রহণ করেন। এখনও দেখা যায় অতীতের যে সমস্ত ভক্তদের মা মনস্কামনা পূর্ণ করেছিলেন সেই বিশ্বাসে তাঁরা তাঁদের বংশধরেরাও এখন মানসিকের জিনিসপত্র নিয়ে মায়ের পূজা নিয়ে ভক্তি জানাতে মায়ের কাছে আসেন। বর্তমানে মা গোবিন্দ চন্দ্র গড়াহর তাঁরই বাসগৃহ সংলগ্ন মন্দিরে স্থিত আছেন এবং পূজার ভার ওঁনার বংশধরেদের উপরই ন্যস্ত।

শ্রীশ্রী ধনেশ্বরী দেবী ঠাকুর বাড়ী

শ্রীশ্রী ধনেশ্বরী দেবী ঠাকুর বাড়ী প্রতিষ্ঠা করেন ধনদেয়ী দেবী বিবিজী বাংলা সন ২রা আষাঢ় ১২৯২ সালে। এই দেব মন্দির বর্ধমানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীশ্রীসর্ব্বমঙ্গলা মাতার মন্দির সংলগ্ন পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত। ভক্ত প্রাণ নরনারীরা মা সর্ব্বমঙ্গলাকে দর্শন করে একবার ধনেশ্বরী দেবী ঠাকুর বাড়ীতে প্রবেশ করে দেবী দর্শন করে যান।

ধনদেয়ী দেবী ছিলেন বর্ধমান মহারাজাধিরাজ মহাতাবচাঁদ বাহাদুরের এক মাত্র কন্যা। ১৮২৯ খৃষ্টব্দে ২৮শে ফেব্রুয়ারী বাংলা সন ১২৩৫ সালের ৮ই ফাল্গুন তারিখে, পাঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত সরহিন্দ নিবাসী জাওলানাথ কাপুরের পুত্র প্যারালাল কাপুরের কন্যা নয়ন কুমারীর সহিত মহারাজা মহাতাব চাঁদ বাহাদুরের প্রথম বিবাহ হয়। ইংরাজী ১৮২২ খৃষ্টাব্দে ১০ই মার্চ বাংলা সন ১২৮২ সালের ২৯শে ফাল্গুন তারিখে, মহারাণী নয়ন কুমারী জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ২৭শে জুন, বাংলা সন ১২৪৭ সালের ৪ঠা আষাঢ় তারিখে একটি কন্যা প্রসব করিয়া সাত দিনের মধ্যেই পরলোক গমন করেন। এই কন্যাই সূতিকাগারে মাতৃহীনা, পিতামহী কর্ত্তৃক বহু যত্নে প্রতিপালিতা ও পিতার এক মাত্র স্নেহের আধার মহারাজ কুমারী ধনদেয়ী দেবী বিবিজী।

সুকুমারী ধনদেয়ী দেবী সমৃদ্ধিশালী বর্ধমান মহারাজাধিরাজ বাহাদুর মহাতাব চাঁদের এক মাত্র স্নেহময়ী দুহিতা হওয়া স্বত্বেও অদৃষ্টের অখণ্ডনীয় লিপি অতিক্রম করতে পারেন নাই। বালিকা রাজনন্দিনীর আশাতরু যে অঙ্কুরেই করাল কালের দারুণ কুঠারাঘাতে সমূলে বিনষ্ট হবে, শৈশবেই যে তাঁকে সংসার সুখে জলাঞ্জলি দিয়ে অসহনীয় দারুন বৈধ্যব্যানলে আজীবন দগ্ধ হতে হবে, তা কে জানত। কে জানত যে বঙ্গের মহান্ সমৃদ্ধিশালী ভূপতির এক মাত্র স্নেহময়ী কন্যাকে চির জীবন ব্রম্মচারিনী হয়ে জীবন যাপন করতে হবে।

নিয়তির অখণ্ডনীয় নিয়মের বশবর্ত্তী হয়ে বাংলার ১২৬০ সালের ২৭শে আষাঢ় ইংরাজী ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জুলাই তারিখে নিদারুণ বিধাতা তাঁকে দারুণ বৈধব্যযন্ত্রণা প্রদান করলেন। বালিকা রাজ নন্দিনী পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কোন্ গুরুতর পাপের প্রতিফল সে এ জন্মে প্রাপ্ত হলেন, তা একমাত্র বিধাতাই বলতে পারেন।

বাংলার ১২৫৩ সালের ২০শে মাঘ ইংরাজীর ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে ১লা এপ্রিল

তারিখে সাত বছর বয়ঃক্রম কালে, পাটনা নিবাসী গঙ্গারাম মেহেরার পুত্র গোপীনাথ মেহেরার সহিত রাজকুমারী ধনদেয়ী দেবীর বিবাহ হয়। মাত্র সাত বছর বিবাহিত জীবনযাপনের পর বাংলার ১২৬০ সালের ২৭শে আষাঢ় ইংরাজীর ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জুলাই তারিখে অপুত্রক অবস্থায় গোপীনাথ মেহেরা দেহ রাখেন।

মহারাজা মহাতাব চাঁদ বাহাদুরের দ্বিতীয়া মহিষী মহারাণী অধিরাণী নারায়ণ কুমারী দেবীর সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা লালা জানকীপ্রসাদ নন্দের দৌহিত্র ও হর গোবিন্দ খান্নার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে রাজকুমারী শৈশব থেকে লালন পালন করায়, তার প্রতি স্বীয় পুত্রের ন্যায় অকৃত্রিম স্নেহশীল হওয়ায়, ১২৯২ সালের ২রা আষাঢ় তারিখে ঐ বালকটিকে দত্তক পুত্র গ্রহণ করে, লালা অবনীনাথ মেহেরা নাম প্রদান করেন। ১২৯৮ সালের ২৯শে বৈশাখ তারিখে জানকী প্রসাদ নন্দের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা লালা বংশ গোপাল নন্দের কন্যার সহিত অবনীনাথের বিবাহ দেন।

অর্থাৎ ধনদেয়ী দেবী ১২৯২ সালের ২রা আষাঢ় অবনীনাথকে দত্তক গ্রহণ করেন এবং ঐ তারিখেই তিনি শ্রীশ্রী ধনেশ্বরী দেবী মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

ধনদেয়ী দেবী সমস্ত সম্পত্তি অর্পণনামা দৃষ্টে দেবত্র করে দেন এবং রেজিষ্টার্ড উইল বলে অবনীনাথ মেহেরা মালিক হন। ধনদেয়ী দেবী ব্যক্তিগত ট্রাষ্ট কমিটি গঠন করেন এবং ঐ ট্রাষ্ট কমিটির নাম দেন শ্রীশ্রী ধনেশ্বরী দেবী ট্রাষ্ট কমিটি। ঐ উইলে আরও উল্লেখ আছে, বংশের জ্যেষ্ঠ পুত্র যিনি থাকবেন তিনিই হবেন ঐ ট্রাষ্ট কমিটির ম্যানেজিং সেবাইত।

সেই আইন বলে অবনীনাথ মেহেরার মৃত্যুর পর তাঁর তিন পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র ভোলানাথ মেহেরা ম্যানেজিং সেবাইত নিযুক্ত হন এবং দেব সেবার কাজ পরিচালনা করেন। বর্তমানে শ্রীশ্রীধনেশ্বরী দেবী ট্রাষ্ট কমিটির ম্যানেজিং সেবাইত হিসাবে নিযুক্ত আছেন শ্রী অমরনাথ মেহেরা।

বর্তমানে মন্দিরের পরিবেশ খুবই সুন্দর। মন্দির চত্বর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। মুল মন্দিরে প্রবেশ করে সামনেই সুন্দর নাট মন্দির। নাট মন্দিরে মহারাজা মহাতাব চাঁদ বাহাদুরের তৈল চিত্র ছাড়াও আরো অনেক তৈল চিত্র বিদ্যমান। নাট মন্দিরের পরেই দক্ষিণমুখী মূল মন্দির বা গর্ভগৃহ। এই মূল মন্দিরেই সিংহাসনে অধিষ্ঠিতা ধনদেয়ী দেবী প্রতিষ্ঠিত চতুর্ভুজা অষ্ট ধাতু নির্মিত মহালক্ষ্মী মূর্ত্তি এবং ঐ মন্দিরে অষ্টধাতু নির্মিত তাঁরই প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রী গোপাল জীউ এবং নারায়ণ শিলা, স্থিত আছেন। মূল মন্দিরের পশ্চিমে একটি শিব মন্দিরে তাঁরই প্রতিষ্ঠিত ধনেশ্বরী শিব শ্বেতপাথরের শোভা পাচ্ছেন। এই

শিব মন্দিরটি পূর্ব্বমুখী।

এই দেব মন্দিরে বেশ শুদ্ধাচারে নিত্য পূজা হয় এবং নিত্য অন্নভোগ হয়। সন্ধ্যায় শীতল হয় এবং লুচি মিষ্টি ভোগ হয়। এখানে বৈষ্ণব ধর্মের সমস্ত অনুষ্ঠান খুব জাঁক-জমক ভাবে উদ্‌যাপিত হয়। যেমন আষাঢ় মাসে পিতলের রথ টানা হয়। শ্রাবণী পূর্ণিমায় ঝুলন উৎসব, রাস উৎসব, দোল উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। রামনবমী, বাসন্তী পূজা, শিব রাত্রী, নীলষষ্ঠী প্রভৃতি উৎসব উদযাপিত হয়ে থাকে। সামনেই দোকান পসার। একেবারে জম-জমাট ভাব। তাছাড়া বর্ধমানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীশ্রী সবর্বমঙ্গলা মায়ের মন্দিরের সংলগ্ন হওয়ায় এই মন্দিরের ঐতিহ্য খুব বেশী।

তেজগঞ্জের কালী

দামোদরের তীরে ও ইদিল পুরের পূর্ব্বে দক্ষিণ-মশানস্থিত তেজগঞ্জের কালীর মন্দির (৮মঃ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন)। সদর ঘাট থেকে গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড্ বাইপাস ধরে সোজা পশ্চি মে খানিকটা পথ অতিক্রম করলেই দেখা যাবে একটি নির্দেশিকা। ঐ নির্দেশিকাটির একদিক তেজগঞ্জ এবং অপর দিকে আলমগঞ্জ নির্দেশ করছে। তেজগঞ্জের দক্ষিণ দিকে একটি রাস্তা ধরে খানিকটা এগিয়ে গেলেই একটি দালান মন্দিরের মধ্যে কষ্টি পাথরের এই তেজগঞ্জের কালী অধিষ্ঠিতা আছেন।

রাজবংশানুচরিত থেকে জানা যায় "বর্দ্ধমানে শ্রীশ্রীঁরাধা বল্লভ জীউ, অন্নপূর্ণা দেবী, ছোট দেশুড়ির শ্যামসুন্দর জীউ, তেজগঞ্জের কালী ঠাকুরাণী প্রভৃতি বহু দেব দেবী মহারাজ তেজচাঁদ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। ঐ সকল দেবতা দিগের পূজা ও ভোগাদির যে সুন্দর ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন তাহা আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। এই সকল দেবালয়ে যেরূপ প্রচুর পরিমাণে বিবিধ প্রকার ভোগের বন্দোবস্ত আছে, তাহা হইতে দেবালয়ের পূজক ব্রাহ্মণ ও ভৃত্যবর্গের ভোজনোপযোগী প্রসাদ বিতরিত হইয়াও যাহা অবশিষ্ট থাকে তদ্বারা বহুতর আগন্তুক ব্রাহ্মণ, সাধু-সন্ন্যাসী ও দরিদ্রগণ প্রতিপালিত হয়"।

সুতরাং এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে তেজগঞ্জের কালী মা মহারাজা তেজ চাঁদেরই প্রতিষ্ঠিত। দেবীর পূজা-আর্চা এবং ভোগের জন্য খুব ভাল ব্যবস্থাই ছিল। বর্তমানে মন্দির জরা-জীর্ণ অবস্থায় এবং মলিন অবস্থায় রয়েছে। কোন রকমে পূজা হয় বলেই মনে হল। মহারাজা তেজ চাঁদ নির্মিত এই মন্দিরের সম্মুখে কিছু টেরাকোটার কাজ আছে। এই কালী মূর্ত্তি এবং ভৈরব মূর্ত্তি একটি পাথরে তৈরী। মূল মন্দিরের সামনে অর্থাৎ দক্ষিণে নাট মন্দির। নাট মন্দিরের সামনে অর্থাৎ দক্ষিণে একটি চারচালা ছোট মন্দিরের ভিতরে একটি পাথরের উপর খোদিত বৃষভবাহন সমেত কাল ভৈরবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। অর্থাৎ মায়ের মন্দির দক্ষিণমুখী এবং ঠিক সামনা-সামনি উত্তরমুখী কালভৈরব স্থিত আছেন।

শ্রীশ্রী বর্ধমানেশ্বর শিবলিঙ্গ

বর্ধমানেশ্বর শিবলিঙ্গের আর্বিভাব দিবস বাংলা ২৫শে শ্রাবণ বৃহস্পতি বার ১৩৭৯, ইংরাজীর ১০ই আগষ্ট ১৯৭২ খৃষ্টাব্দ। এই শিবলিঙ্গটি খুবই প্রাচীন বলে মনে হয়। অনেকের মতে এটি দ্বাদশ শতকের শিল্পকলার নিদর্শন। যে অঞ্চলে শিবলিঙ্গ পাওয়া গেছে, ঐ অঞ্চলের চারিধার ছিল ধানক্ষেত। বর্তমানেও ঐ অঞ্চলকে সবুজ ধান ক্ষেত পরিবেষ্টিত করে আছে। এই অঞ্চল তখন একবারে ফাঁকা ছিল। ঐ অঞ্চলেরই চারি ধারে বর্ধমানের অধিকাংশ চালকলই অবস্থিত। এই অঞ্চলটি আলমগঞ্জ মৌজার দক্ষিণে ফকিরপুরের ভিখারী বাগানে অবস্থিত। এই ভিখারী বাগানেই অস্থায়ী একটি করগেটশিটের আটচালায় বর্ধমানেশ্বর শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন। যেখানে এখন শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন তারই সন্নিকটে মাটি খোঁড়ার সময় ঐ বৃহদাকার শিবলিঙ্গটির আবির্ভাব হয়। তারপর ঐ শিবলিঙ্গটি মাটি থেকে তুলে প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং নাম দেওয়া হয় বর্ধমানেশ্বর শিবলিঙ্গ। কোদাল, গাঁইতি বা শাবলের আঘাতে শিবলিঙ্গের বহু জায়গায় ক্ষত বিক্ষত হয়। এই জায়গাটি স্বর্গীয় চারুচন্দ্র দের কৃষিক্ষেত্র ছিল। প্রয়াত চারুচন্দ্র দের বংশধরেরাই এই অস্থায়ী মন্দির নির্মাণ করে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। চারুচন্দ্র দের তৃতীয় পুত্র প্রয়াত প্রফুল্ল চন্দ্র দে ই ছিলেন শিবলিঙ্গের পরিচালক। বর্তমানে প্রয়াত চারুচন্দ্র দের বংশ ধরেরাই এই শিবলিঙ্গের পূজা আর্চ্চা এবং রক্ষণা বেক্ষণের ব্যয় ভার বহন করেন। যেখানে ঐ শিবলিঙ্গ উঠেছিল সেই জায়গায় পাকা মন্দিরের কাজ আরম্ভ হয়েছিল। কিন্তু মন্দিরের ভিত্তিটুকু হয়েই কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। তারও নিদর্শন রয়েছে। পাশেই একটি পুকুর খনন করা হয়েছে। এই মন্দিরের দুই জন পূজারীর মধ্যে শ্রী রামপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় নামক পূজারীর সাক্ষাৎকারে জানা গেল যে, প্রতি বছর আবির্ভাব দিবসে, অর্থাৎ ২৫শে শ্রাবণ খুব জাঁক জমক ভাবে বর্ধমানেশ্বর শিবলিঙ্গের উৎসব হয়। ঐদিন সকাল থেকে ষোড়শোপচারে পূজা অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় বেলা ২টা পর্য্যন্ত ঐ পূজা হয়। তারপর নানা অনুষ্ঠান হয় যেমন পূজার পর শিবস্তোত্র পাঠ হয়। তারক ব্রহ্মনাম হয়। পরে চণ্ডীপাঠ অনুষ্ঠান হয়। ঐ দিন পরমান্ন ভোগ হয়। ভক্তদের মধ্যে ঐ পরমান্ন ভোগ বিতরণ করা হয়। পূজা শেষে শিবযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। ঐ দিন আরতি দুই বার হয়। একবার ভোগের পর এবং একবার পূজা শেষে। অন্যান্য দিনে আরতি সাধারণতঃ হয় না। তবে কোন মানসিকের পূজা থাকলে তাঁরা নিজেদের মতন পূজার আয়োজন করে থাকেন। বর্ধমানেশ্বর শিবলিঙ্গের নিত্য

সেবা হয়। নিত্য দুধ এবং গঙ্গাজল দিয়ে শিবলিঙ্গের স্নান করান হয়। সপ্তাহে একদিন গাওয়া ঘি সবর্বাঙ্গে মাখান হয়। প্রত্যহ বহু ভক্ত বর্ধমানেশ্বর শিবলিঙ্গের দর্শন করতে আসেন। তবে শিবরাত্রির দিন এখানে বিশেষ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বহু ভক্তসমাগম হয়। মেলা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। ভক্তরা শিবলিঙ্গের মাথায় ভক্তি সহকারে জল ঢালেন। শিবলিঙ্গটির উচ্চতা ৫ ফুট ৯ ইঞ্চি ও ব্যাস প্রায় ৬ ফুট এবং গৌরী পট্টের পরিধি হলো প্রায় ১৮ ফুট। ওজন ৩৫০ মনের মত। কয়েক বছর আগে বাঁকানদীর সংস্কারের সময় প্রায় ১ টন ওজনের এক কালো পাথরের ষাঁড় পাওয়া যায়। ঐ ষাঁড়টি বর্ধমান নির্মল ঝিলের একটি গাছের তলায় রক্ষিত আছে। অনেকের মতে এটিও নাকি দ্বাদশ শতকের শিল্প কলার নিদর্শন। বর্ধমানেশ্বর শিবলিঙ্গের গৌরী পট্টের তলায় পাইপ দেওয়া আছে। সমস্ত জল ঐ পাইপ দিয়ে পাশের পুকুরটিতে গিয়ে পড়ে। বর্ধমান রাজ বাটীর পশ্চিম দিকের রাস্তা নেতাজী সরনী দিয়ে বাঁকানদীর উপর রাধাগঞ্জ বা আলমগঞ্জের পুল পার হয়ে খানিকটা দক্ষিণে গিয়ে তারপর তেজগঞ্জ রোড ধরে যাবার পর বাঁকানদীর দক্ষিণে ভিখারী বাগানে অবস্থিত বর্ধমানেশ্বর শিব-লিঙ্গ।

নিমকাঠের তৈরী ভৈরবীশ্বরী কালী

বর্ধমানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীশ্রী সর্ব্বমঙ্গলা মাতার মন্দিরের ঠিক পশ্চিমে অর্থাৎ সর্ব্বমঙ্গলা পাড়ার মিদ্যাপুকুরের উত্তর পাড়েএকটি সরু রাস্তা দিয়ে এগিয়ে গেলে দেখা যাবে রাস্তার বাঁ পাশে একটি ভাঙ্গা দালান। এই দালানের ঠিক প্রবেশ পথের উপর লেখা আছে "তিনশত বছরের পুরানো নিম কাঠের শ্রীশ্রী ভৈরবীশ্বরী কালীমাতার মন্দির"। তিনশত বছরের পুরাতন এই দালান মন্দিরটি একেবারে ভগ্নপ্রায়। ভগ্নপ্রায় এই মন্দিরটি বাহির থেকে দেখলে একবারে মন্দির বলে মনেই হবে না। কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করলে মন্দিরে দেখা যাবে কালী মূর্ত্তি সমেত বহু দেব-দেবী।

বর্ধমান রাজ পরিবারের এক পূর্ব্ব পুরুষ ভৈরব চাঁদ কাপুর নিম কাঠের কালী মূর্ত্তি তৈরী করে ঐ দালান মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন তিনশত বছর আগে। ভৈরব চাঁদ কাপুর ছিলেন নিঃসন্তান। মা কালীর প্রতি যেমন তাঁর অগাধ ভক্তি ছিল তেমনই তিনি মা কালীর আরাধনাও করতেন। তিনি সন্তান না হওয়ার জন্য সন্তান কামনায় প্রতিদিন মায়ের কাছে প্রার্থনা জানাতেন। তাঁর কাতর প্রার্থনায় মা কালী একদিন রাতে ভৈরব চাঁদ কাপুরকে স্বপ্ন দেন অর্থাৎ ভৈরব চাঁদ কাপুর স্বপ্নাদিষ্ট হন যে মা কালী যেন তাঁকে বলছেন "তোর সন্তানের জন্য দুঃখ কিসের। আমিই তোর সন্তান হয়ে, তোর মেয়ে হয়ে তোর কাছে থাকব কথা দিচ্ছি"।

এরই পর মাঘ মাসের রটন্তী চতুর্দ্দশীর দিন নিমকাঠের কালী মূর্ত্তি তৈরী করে মন্দির নির্মাণ করে মাকে প্রতিষ্ঠা করেন ভৈরব নাথ কাপুর। সেই থেকেই মায়ের পূজার শুরু। মায়ের নিত্য পূজা হয়। উপরন্তু মাঘ মাসের রটন্তী চতুর্দ্দশীর দিন প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে মায়ের মহা সমারোহে পূজা হয় এবং বাৎসরিক শ্যামাপূজার দিন খুব জাঁক জমক করে মায়ের পূজা হয়।

মায়ের এই পূজা অতি নিষ্ঠা সহকারে, অগাধ ভক্তিতে ১৩৬০ সাল থেকে করে আসছেন শ্রী উমাপদ ভট্টাচার্য্য মহাশয়। বর্তমানে প্রায় নববই বছরের এই পূজারী যখন নিত্য পূজা করেন, মায়ের পূজার মন্ত্র উচ্চারণ এবং মাকে মনে প্রাণে ডাকেন তখন মনে হয় একজন শক্তিমান সাধক পূজায় রত। উমাপদ বাবু দৃষ্টিহীন। উমাপদ বাবু প্রত্যহ সকাল ৮টা থেকে মায়ের পূজা আরম্ভ করেন এবং প্রায় বেলা ২টা পর্যন্ত একনাগাড়ে মায়ের পূজা করে যান। প্রত্যহ কত ভক্ত যে মায়ের কাছে আসেন, তাঁদের সুখ-দুঃখের কথা জানাতে, তাঁদের মনস্কামনা পূর্ণ করার প্রার্থনায়।

বহু ভক্ত প্রাণ নরনারী আসেন মায়ের কাছে গোড়াতে। উমাপদ বাবুও মন্ত্রের সাহায্যে তাঁদের সেই আশা পূর্ণ করেন। উমাপদ বাবুর বিশ্বাস, মা আছেন। মা সকলের দুঃখ কষ্ট দূর করে দেন। সেই বিশ্বাসেই ভক্তপ্রাণ নরনারী যাঁরা আসেন তাঁদেরও বিশ্বাস জুগিয়ে যাচ্ছেন ঐ নবতিপর বৃদ্ধ। তাঁর ধারণা বিশ্বাসে শক্তি জোগায়। উমাপতি বাবু বলেন, এই বিশ্বাসের জোরেই আমি এই বৃদ্ধ বয়সে মায়ের পূজা করতে পারছি।

মায়ের মন্দির দক্ষিণমুখী, মন্দিরে নিম কাঠের তৈরী প্রাচীন কালী মূর্ত্তি তো আছেই, এছাড়াও রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ, গৌর নিতাই মূর্ত্তি, নারায়ণ শিলা এবং আরো, অনেক বিগ্রহের নিত্য পূজা এই মন্দিরে হয়। বাৎসরিক কালী পূজায় এবং প্রতিষ্ঠা দিবসে অর্থাৎ মাঘ মাসের রটন্তী চতুর্দ্দশীতে ছাগ বলি হয়। এ ছাড়াও মানসিকের পূজায় ছাগ বলি হয়।

বর্ধমান শহরের মধ্য স্থলে তিনশ বছরের এই প্রাচীন নিম কাঠের কালী মূর্ত্তি নিত্য পূজিতা হচ্ছেন। কিন্তু না আছে তাঁর পূজার সমারোহ না আছে আড়ম্বর, না আছে কোন প্রচার। অথচ অতি নীরবে এবং নিভৃতে এই পূজা হয়ে আসছে, অসংখ্য ভক্তপ্রাণ নরনারী প্রত্যহ পূজার ডালি সাজিয়ে মায়ের পূজা দিতে আসছেন, মনের কামনা বাসনা মাকে জানিয়ে যাচ্ছেন। উমাপদ বাবুও দিন রাত মায়ের পূজায় ব্যস্ত।

বর্তমানে মন্দিরের কোন আয় নাই। স্থানীয় মানুষজন এবং ভক্তরাই কোন রকমে সংস্কার করে মন্দিরটিকে টিকিয়ে রেখেছেন। প্রতিমার প্রাচীনত্ব নিয়ে বহু তথ্য শোনা যায়। শোনা যায় এই ধরনের নিম কাঠের কালী মূর্ত্তি নাকি একমাত্র পুরীর জগন্নাথ দেবের মন্দিরেই আছে। অনেকের মতে এই কালী মূর্ত্তি ভারতবর্ষের মধ্যে দ্বিতীয় নিম কাঠের কালী মূর্ত্তি।

শ্রীশ্রী গোকুল নাথ জীউ ঠাকুর বাড়ী এবং জুয়ালা নাথ এবং নারায়ণেশ্বর শিবমন্দির

গোকুল নাথ জীউ এবং জুয়ালা নাথ ও নারায়ণেশ্বর শিব প্রতিষ্ঠা করেন মণিলাল কাপুর বাংলার সন ১২৮১ সালে। কৃষ্ণসায়রের পশ্চিম পাড়ে মোহনবাগান খেলার মাঠ এবং বি. টি. কলেজ। এরই পশ্চিমে কাজীর হাটে এই দেব মন্দির অবস্থিত। এককালে বর্তমান মোহনবাগান খেলার মাঠ, বি. টি. কলেজের জায়গা এই দেবমন্দিরেরই সম্পত্তি ছিল। এখনও মোহনবাগানের পাশে একটি পুকুর আছে। পুকুরটির নাম কেঁও পুকুর। আয়তন পাঁচ বিঘা। এটি ছাড়াও গোকুল নাথ জীউর মন্দির প্রায় দশ বার কাঠার মত। জুয়ালা নাথ মন্দিরের পাশেও প্রচুর ফাঁকা জায়গা রয়েছে। এ ছাড়াও সাত খানা কলিয়ারী সমেত বহু সম্পত্তি ছিল। জমিদারী উচ্ছেদের ফলে ঐ সমস্ত সম্পত্তি আর নাই। ঐ সম্পত্তির কমপেন্‌সেশনের টাকায় একটি ট্রাষ্ট কমিটিগঠিত হয়েছে। বর্তমান সেবাইতদের এক বংশধর এবং ট্রাষ্ট কমিটির ম্যানেজিং সেবাইত শ্রী স্নেহাশিস লাল হাণ্ডের কাছ থেকে সংগৃহীত তথ্য থেকে এই দেবমন্দিরের বিস্তারিত বিবরণ জানা গেল।

মণিলাল কাপুরের পিতা ছিলেন জুয়ালা নাথ কাপুর। জুয়ালা নাথ কাপুরের পিতামহ শিবরাম কাপুরের আদি বাস ছিল সীর্‌হিন্দ পাঞ্জাব।

মণিলাল কাপুরের দুই কন্যা। প্রথমা কন্যা ছিলেন কিষণ কুমারী দেবী, স্বামী বংশগোপাল নন্দে এবং দ্বিতীয়া ছিলেন হর কুমারী দেবী, স্বামী মুকুন্দ লাল হাণ্ডে। এক মাত্র পুত্র কুন্দন লাল কাপুর ইনি নিঃসন্তান ছিলেন। মনিলাল কাপুরের দৌহিত্র অর্থাৎ হর কুমারী দেবীর পুত্র আনন্দ লাল হাণ্ডে কালক্রমে এই দেব মন্দিরের সেবাইত হন। তারপর আনন্দ লাল হাণ্ডের পুত্র গোবিন্দ লাল হাণ্ডের উপর দেবসেবার ভার পড়ে।

মুকুন্দ লাল হাণ্ডে হচ্ছেন আবার বর্ধমানাধিপতি মহারাজ তিলোক চাঁদ বাহাদুরের স্ত্রী মহারাণীর বিষণ কুমারী দেবীর ভ্রাতা বক্তারসিং হাণ্ডের বংশধর।

আনন্দ লাল হাণ্ডের একমাত্র পুত্র ছিলেন গোবিন্দ লাল হাণ্ডে। তাঁরই ছয় পুত্র বর্তমান। জ্যেষ্ঠ পুত্র স্নেহাশিস লাল হাণ্ডে বর্তমান দেব মন্দিরের ম্যানেজিং সেবাইত হিসাবে নিযুক্ত আছেন। এক বিশাল প্রাসাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রী

গোকুল নাথ জীউর রাধা কৃষ্ণের দারুণ মূর্ত্তি। এছাড়াও আছেন সাদা পাথরের নারায়ণেশ্বর শিবলিঙ্গ এবং নারায়ণ শিলা। এরই সামনে শিব মন্দিরের ভেতর শ্রী জুয়ালা নাথ শিবলিঙ্গ কালোপাথরের।

এই দেব মন্দিরের নিত্য পূজা হয় এবং ঝুলন যাত্রা, রাস যাত্রা, দোল যাত্রা, প্রভৃতি উঁৎসব পালিত হয়। অর্থাৎ বৈষ্ণব ধর্মের সমস্ত কিছু উৎসবই পালিত হয়। তবে নিয়মরক্ষা মাফিক। অতীতের সেই রম রমা ভাব আর নাই। কোন রকমে স্মৃতি টুকু ধরে রেখেছে।

মনমোহিনী ঠাকুর বাড়ী

বর্ধমান মহারাজার বাড়ী অর্থাৎ বর্তমান বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠিক দক্ষিণে পায়রাখানা রোড়ের উপর শক্তি বিবির ঠাকুর বাড়ীর ঠিক পূর্ব্ব গায়ে মনমোহিনী ঠাকুর বাড়ী অবস্থিত। বাহির থেকে দেখলে মনে হবে এটি একটি দালান বাড়ী। কিন্তু ঐ দালান বাড়ীর ভিতরে ঢুকলে বহু পুরাতন একটি মন্দির। এই মন্দির অনেকটা অধিষ্ঠাত্রী দেবী সবর্বমঙ্গলা মায়ের মন্দিরের ধাঁচে। তবে এই মন্দির একটু ছোট আকারের। এই মন্দিরের উপরের চূড়ায় চার দিকে চারটি এবং সর্বোচ্চ চূড়ায় একটু বড় আকারের আর একটি মোট পাঁচটি পিতলের চক্র আছে।

এই মন্দিরটি পূর্ব্বমুখী, বেশ পুরাতন। মনে হয় মহারাজা তেজচাঁদের আমলে রাজ পরিবারেরই মনমোহিনী দেবী এই মন্দির নির্ম্মাণ করে ঐ মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন শ্রীশ্রী বৃন্দাবন চন্দ্র জীউ বিগ্রহ।

এই বিগ্রহটি হচ্ছে অষ্ট ধাতুর তৈরী রাধা কৃষ্ণের মূর্ত্তি। এছাড়াও আছে নারায়ণ শিলা। এই মন্দিরের ঠিক দক্ষিণে আছে একটি শিব মন্দির। মন্দির উত্তরমুখী। এর ভিতরে স্থিত আছেন কালো পাথরের শিবলিঙ্গ। বৃন্দাবন চন্দ্র মন্দিরের ঠিক পূবের্ব আছে নাট মন্দির। এই নাট মন্দিরেই আগে কৃষ্ণ যাত্রা, রামায়ণ গান, ভাগবত পাঠ, প্রভৃতি নানা অনুষ্ঠান হতো। এখন আর ঐ সমস্ত কোন অনুষ্ঠানই হয় না। তবে নিয়মরক্ষা মাফিক বৈষ্ণব ধর্মের সমস্ত কিছু অনুষ্ঠানই এখানে উদযাপিত হয়। যেমন ঝুলন উৎসব, রাস উৎসব, দোল উৎসব প্রভৃতি এখানে অনুষ্ঠিত হয়।

এই মন্দিরে নিত্য পূজা হয় এবং ভোগ হয়। এই পূজার ব্যয় বহন করেন মহাতাব ট্রাষ্ট কমিটি। এই মন্দিরের পূজা-আর্চ্চা এবং রক্ষণাবেক্ষণের পরিচালনায় আছেন মহাতাব ট্রাষ্ট কমিটির এ্যাড্মিনিষ্ট্রেটর ডঃ প্রণয়চাঁদ মহাতাব। তবে বর্তমানে মন্দির জীর্ণ এবং ভগ্ন অবস্থায় দৃশ্যমান।

ছোটদেহুড়ির শ্রীশ্রী শ্যামসুন্দর জীউ এবং রাধাবল্লভ জীউ ঠাকুর

বর্ধমান রাজবাটীর পশ্চিম দিকের রাস্তা ধরে খানিকটা পথ এগিয়ে গেলে অতীতের ইটালিয়ান স্থাপত্যে নির্মিত বর্ধমান রাজকলেজিয়েট্ স্কুল এবং ভারতীয় স্টেট্ ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়ার আঞ্চলিক শাখা (নূতনগঞ্জ) অফিসের মাঝখানে একটি ছোট গলি দিয়ে গেলেই দেখা যাবে 'বিজয় চতুষ্পাঠী'। এটি বর্ধমান মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ মহাতাব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বাংলার সন ১৩০৬ সালে। বর্তমানে ঐ চতুষ্পাঠী সরকার অনুমোদিত। এই চতুষ্পাঠীর ঠিক পশ্চিম গায়ে একটি দালান মন্দিরে বর্ধমান মহারাজাধিরাজ তেজচাঁদ বাহাদুর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শ্রীশ্রী শ্যামসুন্দর জীউ এবং শ্রীশ্রী রাধাবল্লভ জীউ বিগ্রহ। শ্রীশ্রী শ্যামসুন্দর জীউ ঠাকুর বাড়ী এবং শ্রীশ্রী রাধাবল্লভ জীউ ঠাকুর বাড়ী, দুটি ঠাকুর বাড়ীই রাজা তেজচাঁদ বাহাদুরের প্রতিষ্ঠিত এবং খুব বিখ্যাত ঠাকুর বাড়ী। শ্যামসুন্দর জীউ ঠাকুর বাড়ীকে আবার বলা হতো গোয়াল বাড়ী। এই ঠাকুর বাড়ী বাজবংশের ছোটদেহুড়ির শ্রীশ্রী শ্যামসুন্দর জীউ এবং শ্রীশ্রী রাধাবল্লভ জীউর ঠাকুর বাড়ী নামে খ্যাত।

বর্ধমান মহারাজারা বর্ধমান জেলার অম্বিকা কালনায় গঙ্গার ধারে ছোটদেহুড়ি পাড়ায় মন্দির নির্মাণ করে শ্রীশ্রী শ্যামসুন্দর জীউ এবং শ্রীশ্রী রাধাবল্লভ জীউ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন প্রায় আড়াইশো বছর আগে। তারপর কালক্রমে ঐ মন্দির গঙ্গার ভাঙ্গনে ধবংস হয়ে যায়। তখন বর্ধমানের মহারাজারা ঐ শ্রীশ্রী শ্যামসুন্দর জীউ বিগ্রহ এবং শ্রীশ্রী রাধাবল্লভ জীউ বিগ্রহ কালনা থেকে বর্ধমানে নিয়ে এসে বর্ধমানের সুপারীবাগানে অস্থায়ী আটচালায় ঐ বিগ্রহ দুইটির পূজা-আর্চার ব্যবস্থা করেন। এখন যেখানে মন্দির বর্তমান, অতীতে সেটি ছিল মহারাজাদের গোয়ালবাড়ী। মহারাজা তেজচাঁদ বাহাদুর ঐ গোয়ালবাড়ী সংস্কার করে এবং সুন্দরভাবে দালান মন্দির নির্মাণ করে ঐ মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন শ্রীশ্রী শ্যামসুন্দর জীউ এবং শ্রীশ্রী রাধা-বল্লভ জীউ বিগ্রহ। তখন থেকেই এই গোয়ালবাড়ী মন্দিরে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু অনেকের কাছে এই ঠাকুর বাড়ী গোয়ালবাড়ী নামেই পরিচিত। মহারাজার দুই নিঃসন্তান মহিষীর ইচ্ছায় শ্রীশ্রী শ্যামসুন্দর জীউ এবং শ্রীশ্রী রাধাবল্লভ জীউ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন মহারাজ তেজচাঁদ। মন্দিরের বর্তমান সেবাইত শ্রী রবীন্দ্রনাথ অধিকারী মহাশয়ের কাছ থেকে এই দেব মন্দির সম্বন্ধে অনেক কিছু তথ্য জানা গেল।

মন্দিরের প্রবেশ দ্বারে প্রবেশ করে দেখা যাবে দক্ষিণমুখী মূল মন্দির। ঐ মূল মন্দিরেই শোভা পাচ্ছেন শ্রীশ্রী শ্যামসুন্দর জীউ এবং শ্রীশ্রী রাধাবল্লভ জীউ বিগ্রহ। এই বিগ্রহগুলি সবই নিমকাঠের খোদাই করা মূর্ত্তি। উভয় মূর্ত্তিই রাধা কৃষ্ণের মূর্ত্তি। কিন্তু আমি রাধাবল্লভ জীউ ঠাকুরবাড়ী সম্বন্ধে লেখার সময় উল্লেখ করেছি শ্রীশ্রী রাধাবল্লভ জীউ বিগ্রহের বিশেষত্ব হলো শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ চরণ অগ্রে এবং শ্রীরাধারও দক্ষিণ চরণ অগ্রে। এই মন্দিরেও যে রাধাবল্লভ জীউ বিগ্রহ শোভা পাচ্ছেন তাতেও সেই একই রূপ প্রকাশিত হয়েছে। এই রাধা-বল্লভ জীউর মূর্ত্তি খুব কমই চোখে পড়ে। বর্ধমানে দুটি রাধাবল্লভ জীউ বিগ্রহ শোভা পাচ্ছেন এবং দুটি বিগ্রহই বর্ধমান মহারাজাধিরাজ তেজচাঁদের প্রতিষ্ঠিত। এই শ্যামসুন্দর জীউ ঠাকুর বাড়ী বর্ধমানের একটি বিখ্যাত ঠাকুর বাড়ী। মন্দিরে বেশ শুদ্ধাচারে নিত্যপূজা, নিত্যভোগ, শীতল, আরতি প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। মূলমন্দিরে আরো অনেক বিগ্রহ শোভা পাচ্ছেন। এই দেব-মন্দিরে শ্রীশ্রী শ্যামসুন্দর জীউ এবং শ্রীশ্রী রাধাবল্লভ জীউর বিগ্রহ ছাড়াও নিমকাঠের তৈরী একটি গোপাল জীউ এবং আর একটি নৃত্য গোপাল জীউ আছেন। এই মন্দিরে আর একটি ছোট রাধাকৃষ্ণের নিত্য পূজা হয়। এই মন্দিরে একটি সুন্দর শ্বেত পাথরের শিবলিঙ্গ বিরাজমান। প্রত্যহ এই মন্দিরে সাতটি শালগ্রাম শিলার পূজা অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে সম্পন্ন হয়।

বর্তমান রথতলায় অতীতে বর্ধমান মহারাজাদের দুটি বিশাল রথ বৈকালে টানা হতো। একটিকে বলা হতো রাজার রথ এবং অপরটিকে বলা হতো রাণীর রথ। শ্রীশ্রী শ্যামসুন্দর জীউ বিগ্রহকে রথ টানার আগে ঐ রথতলায় নিয়ে যাওয়া হতো। একটি রথে শ্রীশ্রী শ্যামসুন্দর জীউ বিগ্রহকে চড়ানো হতো। অপর রথে শ্রীশ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ জীউকে চড়ানো হতো। তারপর রাজ পরিবারের কেউ প্রথমে রথের রসি ধরে টান দেওয়ার পর হাতি রথের রসি ধরে টান দিত এবং জনসাধারণ শঙ্খঘণ্টা ধ্বনির সাথে সাথে রথ টানতো। এই ছিল বর্ধমানের রথযাত্রার বৈশিষ্ট্য।

শ্যামসুন্দর জীউ মন্দির বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। মূল মন্দিরের সামনেই নাট মন্দির। এই নাট মন্দিরেই অতীতে খুব বিখ্যাত বিখ্যাত অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই মন্দিরে সারাবছরই নানা অনুষ্ঠান হতো। সারা বছরই মন্দির উৎসব মুখরিত থাকতো। বর্তমানে ঐ সমস্ত অনুষ্ঠান হয় না। অতীতে দুর্গা পূজার দশমীর দিন শ্রীশ্রী শ্যামসুন্দর জীউ এবং রাধাবল্লভ জীউর বিজয়যাত্রা উৎসব পালিত হতো। আশ্বিন মাসের প্রতিপদ থেকে কার্ত্তিক পূর্ণিমা পর্যন্ত ঠাকুর বাড়ীতে প্রায় একমাস মহাভারত অথবা রামায়ণ গান হতো। কার্ত্তিক মাসে অন্ন কুট, বনবিহার বিবাহোৎসব পালিত হতো। পৌষ মাসের প্রতিপদ থেকে মাঘ মাসের দ্বিতীয়া অবধি প্রায় একমাস জীউদের খিচুড়ি ভোগ হতো। পৌষ মাসের প্রতিপদ থেকে মাঘীপূর্ণিমা পর্যন্ত

শ্যামসুন্দর জীউর ঠাকুর বাড়ীতে রামায়ণ হতো। এ ছাড়াও শ্যামসুন্দর জীউ এবং রাধাবল্লভ জীউর ফুল দোলযাত্রা, ফুল বাঙ্গালা, বৈশাখ কৃত্য, রাস উৎসব, ঝুলন উৎসব, প্রভৃতি উৎসব মহা সমারোহে উদযাপিত হতো এবং বর্তমানেও ঐ সমস্ত উৎসব উদ্‌যাপিত হয়।

এই সব অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতেন তখনকার দিনের সব বিখ্যাত বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব এবং নাম করা সমস্ত সংগঠন। এই নাট মন্দিরে আমরা দেখেছি কোন বছর মতি রায়ের দলের যাত্রাগান, কখনও গণেশ অপেরা, কখনও বা নট্য কোম্পানির যাত্রাগান, তাছাড়া নাম করা সব কৃষ্ণযাত্রা দলের কৃষ্ণযাত্রা অনুষ্ঠিত হতো। রামায়ণ গান করতেন বিখ্যাত রামায়ণ গায়কেরা। ভাগবত পাঠ করতেন বিখ্যাত সমস্ত ব্যক্তিত্ব। প্রতি বছর ফেলারাম বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রসময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের রামায়ণ গান বাঁধা ছিল। জীতেন্দ্র নাথ গোস্বামীর ভাগবত পাঠ হতো। আরো কত বিখ্যাত অনুষ্ঠান বর্ধমানবাসীরা এই দেব-মন্দিরে দেখার সুযোগ পেতেন তা বলে শেষ করা যাবে না। তা ছাড়া ঐ সমস্ত অনুষ্ঠানে কোন দর্শনী লাগতো না। প্রত্যহ বৈকালে ভক্ত প্রাণ নর-নারী উপস্থিত হতেন এই সমস্ত দেব-মন্দিরে অনুষ্ঠান দেখার জন্যে। আনন্দের সাথে ঐ সমস্ত অনুষ্ঠান দেখে মনে শান্তি নিয়ে বাড়ী ফিরতেন সকলে।

বর্ধমান ১০৮ শিবমন্দির

বর্ধমান রেলস্টেশন হতে সোজা পশ্চিমে গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড্ ধরে দুই মাইল বা তিন কিলোমিটার পথ গিয়ে গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড বাই পাশের কাছে একটি চৌরাস্তার মোড়। ঐ মোড় থেকে সোজা উত্তরে শিউড়ি রোড্ ধরে একটু গেলেই আগেকার তালিতগড় বা মহবৎগড় ছিল। এরই নিকটে নবাবের হাটে ১০৮ শিব মন্দির অবস্থিত। মহারাজা তেজচাঁদের জননী অর্থাৎ রাজা তিলোকচাঁদের পত্নী এই ১০৮ এবং আর একটি আলাদাভাবে অর্থাৎ মোট ১০৯টি শিব মন্দির নির্মাণ করে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

Bengal District Gazetteers -১৯১০ এ উল্লেখ আছে

"About 2 miles form the town, at Nawab Hat, is a group of 108 Siva Lingam temples which stand in a rectangle planted with trees and containing some well kept tanks; these temples were built and consecrated in October 1788 by the Maharani Adhiswari Bishnu Kumari Bibi, wife of Tilak chandra and mother of Tej Chandra. This series of temples is exactly similar to that of Kalna, of which a full description is given in the article on that town. Near the temples and probably intended to Guard there is the spacious fort of Talitgarh which formed the refuge of the Burdwan family and its retainers during the Maratha invasions of the 18th century."

১০৮ শিবমন্দির প্রতিষ্ঠার কথা লোক মুখে প্রচারিত হলেও আসলে ১০৯টি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মহারাণী বিষ্ণু কুমারী। শিব মন্দিরের পশ্চিম দিকের প্রবেশ পথের উপর শিলালিপিতে খোদিত আছে ঃ—

"শকে শূণ্য শশাঙ্ক শৈল কুমিতে নির্মায় রাধা হরি প্রীত্যৈ
পূণ্যবতী নবাধিকশতং শ্রীমন্দিরাণী স্বয়ম্।
ধীর শ্রীযুত তেজচন্দ্র ধরণী-ধৌরেয় চূড়ামনে
মাতা তৎসবিধে বিধায় সুসরস্তীরে সমস্থাপয়তু।"

মন্দিরে এই শিলালিপি হতে জানা যায় যে, ১৭১০ শকাব্দে বা ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে এই মন্দিরগুলি নির্মিত হয়েছিল। শোনা যায় দসনামী শৈব সম্প্রদায়ের অনুপ্রেরণা ছিল ঐ মন্দিরগুলি প্রতিষ্ঠার পিছনে। মন্দির নির্মাণে তখনকার দিনে লক্ষাধিক টাকা

ব্যয় হয়েছিল। আরো জানা যায় বিষ্ণু কুমারী মন্দিরের নির্মাণ কার্য্য ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ করেন এবং সম্ভবতঃ ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে এই নির্মান কার্য্য শেষ হয়। বিষ্ণু কুমারী মন্দিরের নির্মাণ কার্য্য সমাপন করে ১০৮ মন্দিরের দরজার উপর শ্বেত পাথরে নিম্নলিখিত লিপি উৎকীর্ণ করেছিলেন।

"শ্রী হরি শকাবর ১৭৯০ সন ১১৯৫, ইং ১৭৮৮ সালে
পুণ্য শশাঙ্ক শৈল কুমেতি নির্মায়।
রাধা হরি প্রীতে পুণ্যবতী নবাধিক শত শ্রী মন্দিরাণী
স্বয়ং শ্রীল শ্রীযুক্ত তেজচন্দ্র ধরণী ধেয়য় চুড়ামনে খাতা
তৎস্ববিধে বিধাও মুরাস্তীনে সং পদে শয়ত ঃ"

ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে মন্দিরের নির্মাণ কার্য্য এবং লিপি উৎকীর্ণ করা হয়েছিল সর্ববশক্তিমান ঈশ্বরকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার জন্য, কারণ যিনি (ঈশ্বর) তাঁহার যুবক পুত্রকে বিদেশীর ষড়যন্ত্রের হাত হতে রক্ষা করেছিলেন এবং তাহাকে গদী লাভে সহায়তা করেছিলেন এবং ইহাও অত্যন্ত অভিজ্ঞতার সাথে লক্ষ্য করার বিষয় যে, শিবমন্দিরের শ্বেত পাথরের উৎকীর্ণ লিপিতে রাধা হরি লিখিত আছে যাহা সফলতার সহিত মন্দিরের নির্মাণ এবং প্রতিষ্ঠার জন্য আনন্দ প্রকাশ করে। বিষ্ণু কুমারী নিজেও একজন উপাসিকা ছিলেন ঠিকই, তবুও একথা নির্দ্বিদায় বলা যায় যে, যে পরিবারে তাঁর বিবাহ হইয়াছিল, সেই পরিবারের অর্থাৎ রাজ পরিবারের ইষ্ট দেবতা হলেন রাধাকৃষ্ণ অথবা লক্ষ্মী নারায়ণ এবং সেই কারণেই তিনি শিলালিপিতে 'রাধা হরি' কথাটি লিখিয়েছিলেন।

১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে তেজচাঁদ যখন ১৬ বছরে পদার্পন করেন হিন্দু প্রথা অনুযায়ী বিষ্ণু কুমারী বর্ধমান রাজের দায়িত্ব তার পুত্র তেজচাঁদের উপর ন্যস্ত করেছিলেন। রাজার দায়িত্ব পুত্রের উপর ন্যস্ত করার পর সাত বছর বিষ্ণুকুমারী ভগবান শিবের মন্দির নির্মাণ এবং উৎসর্গ লিপি প্রভৃতি নির্মাণের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে মহারাণী বিষ্ণু কুমারী কালনার পবিত্র গঙ্গাতীরে রামেশ্বর শিব মন্দির নির্মাণ করেছিলেন এবং শিবলিঙ্গ কষ্টি পাথরের তৈরী করিয়েছিলেন। এই মন্দির বিষ্ণু কুমারীর সুন্দর পরিকল্পনা মাফিক, বাংলার ঐতিহ্য মণ্ডিত আট চালা নকসায় চতুস্কোণ প্রাঙ্গণে নির্মিত হয়েছিল। মহারাণী বিষ্ণুকুমারীর মনের সাধ ছিল তিনি জপমালার মত মন্দির নির্মাণ করিবেন। জপমালায় ১০৮টি পুঁথি বা দানা থাকে এবং এ ছাড়া একটি অতিরিক্ত দানা বা পুঁথি থাকে যাকে মেরু বলা হয়। হিন্দুদের নিকট ১০৮ সংখ্যার একটি ঐন্দ্রজালিক প্রভাব আছে। ১০৮ সংখ্যার বিষয়ে অনেক ব্যাখ্যাও আছে। যাইহোক রাণী বিষ্ণু কুমারী বালেশ্বরের মন্দিরের আটচালার নকসাকে নমুনা হিসাবে সাজিয়ে বর্ধমানের নবাব হাটে ১০৮ শিব মন্দিরের

প্রতিষ্ঠা করিলেন ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে। সম্ভবতঃ ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে এই মন্দির নির্মাণ সমাপ্ত হয়েছিল। ১০৮ দুধের মত সাদা আটচালা সংযুক্ত মন্দিরের ভিতরে কষ্টি পাথরের শিবলিঙ্গ নির্মিত হয়েছিল যা আয়তাকার মুক্তার হারের মত দেখতে হয়েছিল। বাহিরের দেওয়াল ১০৮ মন্দিরের পিছনে সংযুক্ত। ১০৮টি দরজা যাহা ভিতরে আছে। মন্দিরগুলির সামনে উন্মুক্ত টানা বারান্দা এবং তার নিচে বাঁধান রাস্তা আছে। প্রতিটি মন্দিরের আয়তন ১০'প্র ১০' এবং উচ্চতা প্রায় ১৫ ফুট। কিন্তু কোন টেরাকোটার অলঙ্কার নাই। সব মন্দিরগুলিই একই রীতিতে নির্মিত। এই আয়তাকার মন্দির অর্থাৎ আয়তক্ষেত্রের প্রবেশের দরজা পশ্চি ম দিকে। পূর্ব্ব দিকে কিছু দূরে আয়তক্ষেত্র থেকে বিচ্ছিন্ন করা ১টি ছোট অর্থাৎ ১০৯ম (একশত নবম) মন্দির নির্মিত হয়েছিল মেরুকে প্রদক্ষিণ করিবার জন্য। আয়তক্ষেত্রের ভিতরে গাছের দ্বারা আচ্ছাদিত বাগান তৈরী করেছিলেন। মাঠের অধিকাংশ স্থল লইয়া দুইটি পুষ্করিনী খনন করিয়েছিলেন যাতে পূণ্যার্থীরা পূজার পুর্বে স্নান করিয়া পবিত্র চিত্তে পূজা দিয়া দেব দর্শনে রত হতে পারেন। মহারাণী বিষ্ণু কুমারী বিশ্বাস করিতেন যে, প্রথম মন্দির হইতে শেষ মন্দির পর্যন্ত যে কোন ভক্তের মন্দির পরিক্রমা কবা, ১০৮ বার কোন মন্ত্র উচ্চারণ অপেক্ষাও অধিক ফলদায়ক। প্রতি বছর শিব চতুর্দশীতে উৎসব ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়। বর্ধমান শহর ছাড়াও পাশের বহু গ্রাম থেকেও ভক্তারা আসে মহাদেবের পূজার জন্য এবং শিবের মাথায় জল দেবার জন্য। বেশ কয়েকদিন ধরেই ঐ সময় মেলা থাকে এবং উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

কালনায় রামেশ্বর শিব মন্দির, বর্ধমানের নবাব হাটে ১০৮ শিব মন্দির নির্মাণে মহারাণী বিষ্ণু কুমারীর অবদান উল্লেখযোগ্য। ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে ৫ই ডিসেম্বর মিত্র সেন ও লক্ষ্মী দেবীর বন্দীদশা কালে তিলক চাঁদ জন্মগ্রহণ করেন। তিলক চাঁদ শৈশব থেকেই খুব সাহসী, ধৈর্যশালী বলবান এবং যোদ্ধাও ছিলেন। ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে তিলক চাঁদের সাথে বিষ্ণু কুমারীর বিবাহ খুব জাঁক জমকের সহিত হয়েছিল। কথিত আছে এই বিবাহে বর্ধমান রাজের আনুমানিক ১,১৯,০০০ টাকা খরচ হয়েছিল। বিষ্ণু কুমারীর দুই কন্যা তোতা কুমারী ও চিত্র কুমারী এবং এক পুত্র নাম তেজচাঁদ। বিষ্ণু কুমারী রাজকীয় কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণের পর ধর্ম সম্বন্ধীয় কার্য্য কলাপে এবং মন্দিরাদি নির্মাণ কার্যে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বেশী দিন নিয়োজিত করিতে পারেন নাই। এই ১০৮ শিব মন্দির প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আরো ও শোনা যায়, মহারাণী বিষ্ণু কুমারী একদিন স্বপ্ন দেখেন সুন্দর একটি রমনীয় স্থানে বহু মন্দিরের সমাবেশ। যাগ, যজ্ঞ সহ মন্দিরে মন্দিরে শিবের পূজার্চ্চনা করছেন তিনি।

ধর্মপরায়ণা, তেজস্বিনী, নীতিজ্ঞান সম্পান্না বিদূষী মহারাণী নবাবহাটে স্বপ্নে দেখা মন্দিরের অনুরূপ শ্রীকান্ত তর্কলঙ্কার শ্লোক মত ১০৯ টি শিব মন্দির স্থাপন

করে লক্ষাধিক ব্রাহ্মণকে বর্ধমানে সমবেত করেছিলেন। পুত্রের সুবুদ্ধি কামনার জন্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের কাছে আশীর্বাদ কামনা করেছিলেন। পুত্র তেজচাঁদকে তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন—রাজ সম্মান ও ঐতিহ্যকে রক্ষার জন্য শিব মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন মন্দিরে অবস্থান করে শুদ্ধ চিত্তে ব্রাহ্মণআপ্যায়ণ ও পদধূলি গ্রহণ করে সমবেত ব্রাহ্মণগণের কাছ থেকে আশীর্বাদ কামনা করতে। ১০৯ শিব মন্দির নির্মিত হয়েছিল ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে। মহারাজ তেজচাঁদ মায়ের নির্দেশ পালন করেছিলেন। মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন আগত লক্ষ ব্রাহ্মণের পদধূলি যত্ন সহকারে রাজ অন্তঃপুরে রেখে দিয়েছিলেন মহারাণী বিষ্ণু কুমারী। পরবর্তীকালে বর্ধমানে সংস্কৃত পণ্ডিতগণের একটি মহামণ্ডল প্রতিষ্ঠার জন্য ভারত বিখ্যাত একটি চতুষ্পাঠী গড়ে দিয়েছিলেন মহারাজ তেজচাঁদ। সেই চতুষ্পাঠীতে কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, মিথিলা থেকে অনেক বিদ্যার্থী অধ্যয়ণের জন্য আসতেন।

বর্ধমান থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্র "সংবাদ বর্ধমান" কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ১২৫৭ সালের ১২ই আশ্বিনের সংখ্যাতে বর্ধমানের ১০৯টি শিব মন্দিরের উল্লেখ সহ মহারাণী বিষ্ণু কুমারীর স্তুতি করে ১০৯টি শিবের নাম প্রকাশিত হয়েছিল। বর্ধমানের ঐতিহ্য স্মরণে রেখে সে নামগুলি উল্লেখ করছি পাঠক পাঠিকাদের অবগতির জন্য শ্রী অজিত ভট্টাচার্য্যের লিখিত প্রবন্ধ থেকে নামগুলি জানিতে পারি। যেমন— (১) স্থানু (২) উগ্র (৩) মহাকাল (৪) বিভু (৫) মহেশ্বর (৬) শিব (৭) শূল (৮) শূলপাণি (৯) রুদ্র দিগম্বর (১০) মহারুদ্র (১১) পরমেশ (১২) বারানসীপতি (১৩) আদিনাথ (১৪) সদাশিব (১৫) শ্রীবিশ্বপতি (১৬) চন্দ্রচূড় (১৭) বামলিঙ্গ (১৮) কপিলঈশ্বর (১৯) সিদ্ধি নাথ (২০) কৃপানাথ (২১) শ্রীতারকেশ্বর (২২) বিষধবজ (২৩) নাগেশ্বর (২৪) কেশব (২৫) বিভূতি (২৬) শ্রীকপর্দী (২৭) জটি (২৮) শম্ভু (২৯) শ্রী প্রমথপতি (৩০) কৃপানাথ (৩১) পাপহারী (৩২) বিঘ্ন বিনাশন (৩৩) ভোজনাথ (৩৪) বক্রেশ্বর (৩৫) যোগী জনার্দন (৩৬) হরিহর (৩৭) জগৎগুরু (৩৮) কুবের ঈশ্বর (৩৯) ভূতনাথ (৪০) চক্রেশ্বর (৪১) শ্রী রাবনেশ্বর (৪২) জগন্নাথ (৪৩) জলেশ্বর (৪৪) লক্ষ্মীকান্তশ্বর (৪৫) বিশ্বপতি (৪৬) জ্ঞানেশ্বর (৪৭) শ্রীঘণ্টেশ্বর (৪৮) উমাপতি (৪৯) শিবপ্রিয় (৫০) শ্রীবাসুকীপতি (৫১) রমাপতি (৫২) বিশ্বপতি (৫৩) অগতির গতি (৫৪) যদুনাথ (৫৫) ভূতনাথ (৫৬) পুষ্প দন্তেশ্বর (৫৭) লক্ষ্মীকান্ত (৫৮) শিবকান্ত (৫৯) যদুকালেশ্বর (৬০) তিলভাণ্ডারেশ্বর (৬১) যোগীবরণপতি (৬২) নাগভট্ট (৬৩) নাদরূপী (৬৪) নীলকণ্ঠস্বর (৬৫) চতুর্ভূজ (৬৬) ত্রিলোচন (৬৭) রাজ রাজেশ্বর (৬৮) মৃত্যুঞ্জয় (৬৯) কাশীনাথ (৭০) শ্রীপঞ্চ বদন (৭১) মদন (৭২) অন্তকদণ্ডী (৭৩) ভূজঙ্গ ভূষণ (৭৪) আশুতোষ (৭৫) তিলক বিজয়ী (৭৬) জনার্দ্দন (৭৭)

সনাতন (৭৮) সভার্ণব জয়ী (৭৯) বিশ্বকর্তা (৮০) গুরুশ্রী (৮১) পরমগুরু (৮২) চক্রী (৮৩) চন্দ্রনাথ (৮৪) পরাৎপর (৮৫) গুরুধবনি (৮৬) পুষ্পদন্তনাথ (৮৭) ত্র্যম্বক (৮৮) ঈশান (৮৯) বদ্রী (৯০) শ্রীরুদ্র মুরতি (৯১) মহাবিষ্ণু (৯২) মহাজিষ্ণু (৯৩) শ্রী ভৈরবপতি (৯৪) কালেশ্বর (৯৫) গঙ্গাধর (৯৬) শশাঙ্ক শেখর (৯৭) পার্ব্বতীপতি (৯৮) প্রাণবল্লভ (৯৯) কপিরাজ নাথ (১০০) মদনঅরি (১০১) শূর অরি (১০২) রক্ষ যক্ষেশ্বর (১০৩) সোমনাথ (১০৪) তীব্রতবা (১০৫) জ্যোতি কুলধন (১০৬) বিশ্বগ্রাসী (১০৭) সবর্বগ্রাসী (১০৮) সত্যানন্দনাথ (১০৯) ত্রাটক ঈশ্বর ॥ এই তথ্যটি ডঃ মিহির চৌধুরী কামিল্যা মহাশয় নানা যুক্তি তথ্যযোগে সমর্থন করেছেন।

তিনি তাঁহার জীবনের শেষ ভাগে নিজেকে ভগবানের পূজা অর্চনাদিতে নিযুক্ত করিয়া সুখ ও শান্তিতে বেশী দিন অতিবাহিত করতে পারেন নাই।১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে বিষ্ণু কুমারী সাংঘাতিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং দেহ রাখেন। স্থির প্রজ্ঞা, বুদ্ধি মতী বিষ্ণু কুমারী বহু সমস্যার মধ্যেও দেব সেবায় রত ছিলেন। বর্ধমান নবাব হাটের ১০৮ শিব মন্দির বর্ধমানবাসীর তথা পশ্চি ম বাংলার গর্ব। আয়তক্ষেত্রকায়, জপমালার মত, শ্বেত শুভ্র, আটচালা সংযুক্ত মন্দির বোধ হয় আর কোথাও নাই। এই ১০৮ শিব মন্দির বর্ধমানবাসীর গর্ব। ১০৮ শিব মন্দিরের দুশো বছর পূর্তিতে এখানে একটি যাত্রীনিবাস তৈরী হয়েছে। এর ফলে দর্শনার্থীদের থাকার কোন অসুবিধা নেই। এটি বর্ধমানের একটি দর্শনীয় স্থান।

এখানে একটি প্রশ্ন থেকে যায়, কোন্ শিবলিঙ্গটির কি নাম তা যদি প্রতিটির মন্দিরের প্রবেশ দ্বারের মাথায় উৎকীর্ণ থাকতো তা হলে দর্শকদের বিশেষ সুবিধা হতো।

গ্রন্থঋণ ঃ— ১। Bengal District Gazetter

২। ১০৮ শিব মন্দিরের দ্বিশত বার্ষিকী স্মরণিকা

৩। দৈনিক মুক্তবাংলা পত্রিকায় ৬-৯-৯৪ অজিত ভট্টাচার্য্যের লিখিত প্রবন্ধ, 'সাহিত্য চর্চা' বিভাগে প্রকাশিত।

কুঞ্জবিহারী ঠাকুর বাড়ী

বর্ধমান শহরের নূতনগঞ্জ বাজারের নিকট ঈশ্বরীতলার ঠিক পশ্চিমে এই ঠাকুর বাড়ী অবস্থিত। অতীতে এই অঞ্চল রাধাগঞ্জ নামে খ্যাত ছিল। এই ঠাকুর বাড়ী খুব প্রাচীন। প্রায় আড়াইশো বছর আগে বর্ধমানাধিপতি মহারাজ তিলোকচাঁদ বাহাদুরের জামাতা লালা দয়ালচাঁদ বাবু এই মন্দির তৎকালীন রাধাগঞ্জ মহল্লার মধ্যে নির্মাণ করে ঐ মন্দিরে শ্রীশ্রী রাধাকুঞ্জ বিহারী বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। মহারাজ তিলোক চাঁদ বাহাদুরের দুই কন্যা এবং এক পুত্র ছিলেন। দ্বিতীয়া কন্যা মহারাজকুমারী চিত্র কুমারী দেবী তাঁরই স্বামী দয়ালচাঁদ বাবু। অর্থাৎ তেজচাঁদ বাহাদুর ছিলেন দয়ালচাঁদ বাবুর শ্যালক। তারপর কালক্রমে মদনলাল সেঠের কন্যা এবং লালা তোতা রাম কাপুরের স্ত্রী কিষনদেয়ী দেবী সেবাইত নিযুক্ত হন। কিষনদেয়ী দেবীর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র বিনয়লাল কাপুর সেবাইত হন।

বিনয়লাল কাপুর যখন সেবাইত সেই সময় উত্তমাশ্রম থেকে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী এসেছিলেন। তিনি মন্দিরে থাকতেন এবং মন্দিরের দেবপূজার দিকে দৃষ্টি রাখতেন। তাঁরই সময়ে মন্দিরে নানা রকম ভক্তি মূলক অনুষ্ঠান হতো যাতে শুদ্ধাচারে পূজা-আর্চা হয় তার দিকে স্বামীজির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। প্রায় ৩৫ বছর তিনি এই মন্দিরে অধিষ্ঠান করেছিলেন। সেই সময় ব্রাহ্মণ ছিলেন অর্থাৎ পূজার কাজে নিযুক্ত ছিলেন ব্রহ্মচারী বিজয় কৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায়। তিনি বহুকাল পূজার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর একটি পা কাটা ছিল। কিন্তু তিনি ঐ অবস্থায় নিষ্ঠার সাথে মন্দিরের পূজায় কাজ করতেন। ঐ সময় পূজার মন্দিরের সমস্ত কিছু ব্যাপারেই সাহায্য করতেন দ্বিজপদ দাস মহাশয়। তিনি সব সময় পূজার ব্যাপারে তো বটেই এমন কি সমস্ত অনুষ্ঠানের ব্যাপারে তিনি মনে প্রাণে সাহায্য করতেন।

শ্রীশ্রী রাধাকুঞ্জ বিহারী ঠাকুরের প্রতিষ্ঠা দিবস না পাওয়ায় স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ মাঘী পূর্ণিমার তিথীটিই ঠিক করলেন রাধাকুঞ্জ বিহারী ঠাকুরের প্রতিষ্ঠা দিবস হিসাবে। এই মাঘী পূর্ণিমা তিথীতেই মহোৎসব হয় এবং ঐ দিন বহু ভক্ত ঐ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে ভোগের প্রসাদ গ্রহণ করেন। প্রতি বছর মাঘী পূর্ণিমাতেই এই মহোৎসব হয়ে থাকে। শ্রীশ্রী রাধাকুঞ্জ বিহারী ঠাকুর প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে একটি প্রবাদ আছে মহারাজাধিরাজ বাহাদুর এবং দয়াচাঁদ বাবু প্রত্যহ কৃষ্ণসায়রের পারে বেড়াতে যেতেন। একদিন দেখেন একটি সাধু কতকগুলি শিলাকার বস্তু নিয়ে বসে আছেন। তখন দয়ালচাঁদ বাবু ঐ সাধুর নিকট গেলে, সাধু তাকে একটি শিলা দিতে

আসেন তখন দয়ালচাঁদ বাবু বলেন আমি অন্য কোন শিলা চাই না। আপনার বুকের কাছে যে শিলাটি আছে আমাকে ঐ শিলাটি দেন। সাধু ঐ শিলাটি দিলে দেখা যায় ঐটি শ্রীধর মূর্ত্তি। দয়ালচাঁদ বাবু ঐ শ্রীধর মূর্ত্তি শিলাটি নিয়ে এসে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন। দয়ালচাঁদ বাবুর যে রাধাকুঞ্জ বিহারীর প্রতিষ্ঠাতা তার প্রমান হচ্ছে শ্রীশ্রী রাধাকুঞ্জ বিহারী বিগ্রহের পাদদেসে এই নাম খোদিত আছে। মন্দিরের প্রবেশ পথ ঈশ্বরী তলার পশ্চি মে একটি ছোট গলি। গলিটি দিয়ে একটু গেলেই মন্দিরে প্রবেশ করা যাবে। মন্দির দক্ষিণ মুখী। সামনেই নাটমন্দির নাটমন্দিরের দক্ষিণে ভগ্ন রাস মঞ্চ। অতীতে এই রাস মঞ্চে শ্রীশ্রী রাধাকুঞ্জ বিহারীর রাস উৎসব ধূমধামের সাথে উদ্‌যাপিত হোত। এখন রাস মঞ্চ ভগ্ন অবস্থায় দৃশ্যমান। নাটমন্দিরে অতীতে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হতো। বৈষ্ণব ধর্মের সমস্ত কিছু অনুষ্ঠান যেমন দোলযাত্রা, ঝুলন যাত্রা, জন্মাষ্টমী, মহোৎসব প্রভৃতি অনুষ্ঠান আজও বেশ নিষ্ঠার সাথে উদ্‌যাপিত হয়। শ্রীশ্রী রাধাকুঞ্জ বিহারীর ঠাণ্ডা ভোগ হয়।

মন্দিরের ভিতরে শ্রীশ্রী রাধাকুঞ্জ বিহারীর অপূর্ব মূর্ত্তি দৃশ্যমান। কষ্টি পাথরের শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি এবং অষ্ট ধাতু নির্মিত শ্রীরাধার মূর্ত্তি অতীতের এক দুর্লভ ভাস্কর্য্যের নিদর্শন। এছাড়াও অষ্ট ধাতু নির্মিত তিনটি গোপাল মূর্ত্তি (বেশ বড় আকারের) শোবা পাচ্ছেন। তিনটি নারায়ণ শিলা এবং শ্রীধর শিলা মন্দিরে রক্ষিত আছেন।

মন্দিরে নিত্যপূজা, আরতি এবং নিত্যভোগ শুদ্ধাচারে হয়। ভক্তদের সমাগমও বেশী। কতকগুলি অনুষ্ঠান যেমন মাঘী পূর্ণিমা, ঝুলন যাত্রা, জন্মাষ্টমী প্রভৃতি অনুষ্ঠান খুব জাঁক জমক ভাবে হয় এবং বহু ভক্ত সমাগম হয়।

অতীতে শ্রীশ্রী রাধাকুঞ্জ বিহারীর ভূরশুট, হুগলী, হাওড়া, মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চ লে প্রচুর সম্পত্তি ছিল। কিন্তু জমিদারী অবলুপ্তির পর সমস্ত কিছু নষ্ট হয়ে গেছে সামান্য কিছু কমপেনশেসনের টাকা পাওয়া যায়।

বঙ্কুবিহারী ও জ্যোতিশ্বর শিব

বর্ধমান রাজবাড়ীর সামনে বিজয়চাঁদ রোডের উপর মিঠাপুকুর মোড়। এই মিঠাপুকুর মোড়ের দক্ষিণে যে রাস্তাটি চলে গেছে ঐ দিকে একটু এগিয়ে শ্রীশ্রী ভূবনেশ্বরী মাতা এবং সোনার কালীবাড়ী। ঐ সোনার কালীবাড়ী থেকে সামান্য একটু দক্ষিণে গেলে চৈতন্য মঠ---এখানে রাধা-কৃষ্ণ এবং নিতাই গৌড় মূর্তির নিত্য পূজিত হন। প্রত্যহ সন্ধ্যায় নামগান হয় এই মন্দিরে। এই মঠের পাশেই একটি সরু গলির ভিতর এই বঙ্কুবিহারী মন্দির অবস্থিত। এটি এখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়েছে। বিদ্যালয়টির নাম---

"শিশু কুঠীর জাতীয় বিদ্যালয়"---

প্রতিষ্ঠাতা ঃ ভোলানাথ মহন্ত।

ফ্রি প্রাইমারী বিদ্যালয় হিসাবে ১৯৫৬ সাল থেকে সরকার অধিগহণ করেছেন। বর্তমানে ঐটিকে কেউ মন্দির বলে জানে না। কিন্তু ভিতরে বঙ্কুবিহারীর সুন্দর মূর্ত্তির নিত্য পূজা হয়। নিত্য ভোগ হয়।

১২৭০ সালের ২৬শে ভাদ্র বর্ধমান রাজ পরিবারেরই নান্নী বিবি এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তখন এই মন্দিরে খুব ধূম ধাম করে নিত্য পূজা ভোগ হতো। বৈষ্ণব ধর্মের সমস্ত কিছু উৎসবই এখানে ধূমধামে পালিত হত। মন্দির দক্ষিণ মুখী। সামনেই নাট মঞ্চ । পাশে এবং সামনে কয়েকটি ছোট ঘর। এই নাট মঞ্চে এবং দুটি ঘরে ছাত্রদের ক্লাস হয়। এই মন্দিরে রাধা কৃষ্ণের মূর্ত্তি অর্থাৎ বঙ্কুবিহারী বিগ্রহ ছাড়াও অষ্টধাতুর গোপাল মূর্তি শোভা পাচ্ছে। এই গোপালটির নাম প্রিয়গোপাল। একটি শালগ্রাম শিলাও ছোট পিতলের সিংহাসনে শোভা পাচ্ছেন। এই মন্দিরের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এই মন্দিরে জ্যোতিবিবি প্রতিষ্ঠিত জ্যোতিশ্বর-শিবলিঙ্গ কালো পাথরের ছিল, যার পাঁচটি মুখ ছিল। এই জন্য এই শিবলিঙ্গটিকে বলা হত পঞ্চ মুখী জ্যোতিশ্বর শিব। অতীতে এই মন্দিরের খুব রমরমা ছিল। কারন এই ঠাকুরের সেবার জন্য এবং মন্দিরের রক্ষনা বেক্ষনের জন্য প্রচুর সম্পত্তি দেওয়া ছিল। কিন্তু জমিদারীপ্রথা বিলোপের ফলে সেই সমস্ত সম্পত্তি আর নাই। যৎসামান্য কমপেনশেষনের টাকা পাওয়া যায় সেখান থেকেই কোন রকমে নিত্যসেবা ও নিত্যভোগ হয়। হয়তো কয়েক বছর পর আর মন্দিরের কিছু অবশিষ্ট থাকবে না।

'উড়ে কালী'

বিজয় তোরণ থেকে বিজয় চাঁদ রোড ধরে খানিকটা এগিয়ে এলে দেখা যাবে রূপমহল্ সিনেমা। এই সিনেমার ঠিক কাছেই একেবারে বিজয় চাঁদ রাস্তার উপরই ডানদিকে এই কালী মায়ের মন্দির। মায়ের মন্দিরের অবস্থান এতই গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় যে প্রত্যহ হাজার হাজার মানুষ, স্ত্রী পুরুষ, ছেলে, বয়স্ক নির্বিশেষে মায়ের কাছে শ্রদ্ধা জানিয়ে যান। অবস্থানই মায়ের গুরুত্ব আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। পাশেই সি.এম.এস. হাই স্কুল থাকায় বাচ্ছাদের মায়েরা ছেলেদের বিদ্যালয়ে দিয়ে এসে এখানে বিশ্রাম করেন। এই মন্দির চত্বর দিনের সব সময়ই জমজমাট থাকে।

এই কালী মা কেন যে 'উড়ে কালী' বলে পরিচিত হলেন তার কোন কারন কিন্তু জানা নাই। কিন্তু সকলেই এই কালী মাকে 'উড়ে কালী' বলেই জানে। প্রায় একশত পঁচিশ বছর আগে মিথিলা থেকে পণ্ডিত জগদীশ্বর ওঝা বর্ধমানে আসেন বর্ধমান-রাজের প্রধান রাজজ্যোতিষি হয়ে। পণ্ডিত জগদীশ্বর ওঝাই এই কালী মা প্রতিষ্ঠা করেন। যখন মাকে প্রতিষ্ঠা করেন তখন এই অঞ্চল একবারে নির্জন ছিল এবং চারিধার ফাঁকা ছিল। জনমানব বলতেই ছিল না। পণ্ডিত জগদীশ্বর ওঝা রাজার জ্যোতিষী হিসাবে খুবই প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। উনি এই কালী মা প্রতিষ্ঠা করে তাঁর সাধনা করেন। বর্ধমানরাজ নিত্যভোগ এবং পূজার ব্যাপারে আর্থিক সাহায্য দিতেন। পণ্ডিত জগদীশ্বর ওঝার মৃত্যুর পর তাঁর দুই পুত্র চতুর্ভুজ ওঝা এবং মার্কণ্ডেয় ওঝা এই দুই পুত্রই সেবাইত হিসাবে মায়ের পূজার ভার নেন। এঁনারা দুজনেই বর্ধমান মহারাজার দেবোত্তর জ্যোতিষী হিসাবে সারাজীবন কাটিয়েছেন। মায়ের সেবাইত হিসাবে মায়ের পূজা করে গেছেন। বর্তমানে মার্কণ্ডেয় ওঝার একমাত্র পুত্র বদ্রীনারায়ণ ওঝার মাসে অর্ধেক দিন পালা থাকে এবং হরিনারায়ণ ওঝারা তিন ভাই মায়ের অর্ধেক দিনের পালা করেন।

মায়ের মূর্ত্তি মাটির। প্রতি তিন বৎসর অন্তর অন্তর মায়ের মূর্ত্তি তৈরী করা হয়। প্রতি বছর বাৎসরিক কালীপূজার দিন মায়ের অন্নভোগ করা হয়। এদিন মায়ের মূর্ত্তি পরিষ্কার করে আবার নূতন ভাবে সমস্ত অঙ্গাবরণ করা হয়। বাৎসরিক পূজা হয় মহা নিশায়। অর্থাৎ রাত্রি ১২টার পর মায়ের ঘট আসে। তারপর পূজা আরম্ভ হয়। পূজা শেষ হতে প্রায় ভোর হয়ে যায়। পরদিন সকালে মায়ের পূজার প্রসাদ এবং ভোগ ভক্তদের বিতরণ করা হয়।

মায়ের নিত্য সেবা বেশ ভক্তি সহকারে এবং ষোড়শোপচারে করা হয়। বহু

ভক্ত প্রতিদিন পূজার ডালি সাজিয়ে ভক্তি সহকারে মায়ের পূজা দিতে আসেন। শনি, মঙ্গল বার ভক্তদের খুব ভীড় হয়। তবে বছরে বিশেষ কয়েকটি দিনে যেমন প্রতি অমাবস্যায়, নববর্ষ, বিজয়া দশমী এবং বাৎসরিক কালী পূজায় বহু ভক্ত সমাগম হয় এবং ভক্তি সহকারে মায়ের পূজা দেন। মায়ের মন্দিরের পিছনে কষ্টি পাথরের রামেশ্বর শিবলিঙ্গ আছে। প্রত্যহই পূজা হয়। বর্তমান সেবাইতদের মধ্যে ৭৩ বছরের শ্রী হরিনারায়ণ ওঝার নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্য জনসাধরনের জানার জন্য লিখিত হল। শ্রী হরিনারায়ণ ওঝা মহাশয় গত ৫৬ বছর বর্ধমান রাজ স্টেটের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছেন এখন তিনি ঐ কাজে নিযুক্ত আছেন।

বুধকালী ও নাগেশ্বর শিব

কৃষ্ণসায়রের উত্তর পারে যেখানে বাংলার রূপকার ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের পূর্ণাবয়ব মূর্ত্তি আছে সেখান থেকে একটু পশ্চি মে গেলেই ঠিক তারাবাগ আবাসনের প্রবেশ পথের ডানদিকে অর্থাৎ কৃষ্ণসায়রের উত্তর-পশ্চিম কোনে পাশাপাশি দুটি মন্দির। একটি মন্দির নাগেশ্বর শিবের এবং অপরটি বুধকালীর মন্দির। এই মন্দির দুটি মহারাজাধিরাজ তেজচাঁদ বাহাদুর ১৭৩০ শকাব্দে নির্মাণ করে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন নাগেশ্বর শিব কষ্টি পাথরের এবং অপর মন্দিরে কষ্টি পাথরের বুধকালী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরে একটি শ্বেত পাথরে খোদিত আছে—"ওঁ বুধ কালী"। বর্ধমানরাজ প্রতিষ্ঠিত ইং ১৩৭০ শকাব্দে সাধক কমলাকান্তের শিষ্য মহারাজ তেজচাঁদ বাহাদুর। পূজারী ব্রাহ্মণ শ্রী গুরুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য। এই স্মৃতি ফলক প্রদান করিলেন। সুতরাং এখান থেকেও বোঝা যায় বর্ধমান মাহারাজা তেজচাঁদ বাহাদুর এই বিগ্রহ দুটি প্রতিষ্ঠা করেন।

আরো কথিত আছে বুধ কালী এবং ভূ-কালী একই সাথে একই সময়ে প্রতিষ্ঠিত এবং পূজারী ব্রাহ্মণও একজনই। অর্থাৎ যিনি ভূ-কালীর পূজারী তিনিই বুধ কালীর পূজারী। তাই গুরুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ই ভূ-কালী এবং বুধ কালীর পূজারী। ভূ-কালী এবং বুধ কালী দুটি মূর্ত্তিই একই রকমের এবং কষ্টি পাথরের তৈরী। মায়ের নিত্য পূজা হয় এবং ভোগ হয়। পূজা করেন গুরুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মশাই, উনিই বুধ কালীরও সেবাইত। বার্ষিক কালী পূজা খুব ধুমধাম করে হয় এবং ছাগ বলি হয়।

কালী ও শিবমন্দির যেখানে অবস্থিত তার প্রাকৃতিক শোভা এবং পরিবেশ খুবই মনোরম। সামনেই ফাঁকা জায়গা। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের পূর্ণাবয়ব মূর্ত্তির চারিধার বাঁধানো। এই মূর্ত্তির পাদদেশে অধিকাংশ অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা বয়স্ক ব্যক্তিদের আলোচনার একটি প্রকৃষ্ট জায়গা। জীবনের কত সুখ-দুঃখের কাহিনী, কত রকমেরই না খবরা-খবর, একবারে পারিবারিক জীবন থেকে শুরু করে খেলা-ধূলা, পরিবেশ দূষন, রাজনীতি, ধর্ম, অফিসের ওয়ার্ক কালচার, শিক্ষা-পদ্ধতি, সংসারের শান্তি-অশান্তি কতরকমেরই না আলোচনা হচ্ছে। আর ঐ রূপকার নির্বাক হয়ে ঐ সমস্ত খাস খবরের রস উপভোগ করছেন, আর ভাবছেন এখানেও তাঁর রেহাই নাই। যেহেতু এই কৃষ্ণসায়রের পারই সকাল বিকাল ভ্রমণের প্রকৃষ্ট জায়গা তাই সবসময় এই অঞ্চল সরগরম।

মায়ের মন্দিরের সামনে ভ্রমণকারীরা বছরে নববর্ষ উৎসব, বিজয়াসম্মেলন প্রভৃতি অনুষ্ঠান করেন। প্রায় সকল ভ্রমনকারী ভ্রমন করতে এসে মাকে তাঁদের বিনম্র ভক্তি জানিয়ে যান।

ভূ-কালী

বর্ধমান 'কৃষ্ণসায়র পরিবেশ কাননে'র প্রবেশ পথের ঠিক দক্ষিণ গায়ে একটি দালান মন্দিরের ভি তর মায়ের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। কৃষ্ণসায়রের পূর্ব্ব পাড়ে এই মন্দির নির্মাণ করেছিলেন সস্ত্রীক মহারাজাধিরাজ বাহাদুর তেজচাঁদ ১৭৩০ শকাব্দে। একই সাথে তিনি বুধ কালী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। খুব সম্ভবত একই দিনে, একই রকমের দুটি কালী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মহারাজাধিরাজ তেজচাঁদ বাহাদুর।

শোনা যায় মা. তেজচাঁদ বাহাদুরকে স্বপ্ন দেন যে আমি এখানে মাটির তলায় আছি। আমায় উদ্ধার করে আমার ঐখানেই মন্দির নির্মান করে প্রতিষ্ঠা কর। সেই মত মহারাজা সস্ত্রীক ঐ স্থানে উপস্থিত হয়ে মাকে মাটী থেকে উদ্ধার করে, মন্দির তৈরী করে মাকে প্রতিষ্ঠা করেন।

'ভূ' শব্দের অর্থ পৃথিবী বা মাটি। যেহেতু মাটীর নীচে থেকে মাকে উদ্ধার করা হয়েছিল বলে মায়ের নাম হয় 'ভূ-কালী'। মহারাজা ঐ স্থানে চৌদ্দ শতক তখনকার দিনে প্রায় আট কাঠা জায়গায় ঐ দালান মন্দির তৈরী করেন। পূজারীদের থাকার বাসগৃহ ঐ মন্দিরের মধ্যেই। মন্দির দক্ষিণ মুখী। মন্দিরের ভেতরে কষ্টি পাথরের তৈরী মায়ের মূর্ত্তি এবং কষ্টি পাথরের তৈরী মহাকাল ভৈরব মূর্ত্তি। এছাড়াও আছে কষ্টি পাথরের শীতলা মূর্ত্তি, মা ষষ্ঠী, সিংহবাহিনী, মঙ্গলচণ্ডী, পঞ্চানন, সূর্য্যমূর্ত্তি এবং নারায়ণ শিলা, এই মন্দিরে শোভা পাচ্ছেন। সমস্ত বিগ্রহেরই নিত্য শুদ্ধাচারে পূজা হয়। মায়ের নিত্য সেবা হয়। অন্নভোগ হয়।

শ্যামাপূজার দিন মায়ের খুব ধূমধাম করে পূজা হয়। বহুভক্ত সমাগম হয়। ছাগ বলি হয়। এছাড়াও মানসিক থাকালে ছাগবলি হয়। এখানে ষষ্ঠী পূজা থেকে শীতলা মায়ের পূজা, সূর্য্য পূজা, সিংহ বাহিনী মঙ্গলচণ্ডী প্রভৃতি সব পূজাই এখানে হয়ে থাকে।

বর্তমান সেবাইত শ্রী গুরুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট থেকে জানা গেল, ওঁনারা তিনপুরুষ ধরে মায়ের পূজারী। ঐ দালানেই ওঁনারা বসবাস করেন। জ মিদারী প্রথা উচ্ছেদের ফলে বর্ধমানের মহারাজার যখন সব কিছু সম্পত্তি বিলুপ্ত হয় তখন তিনি এই মন্দির দালান সমেত বর্তমান সেবাইত শ্রী গুরুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে দিয়ে যান। শ্রী গুরুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ই এই মন্দিরের বর্তমান সেবাইত।

“উসোদীঘির পাড়ে ওলাইচণ্ডী মা”

সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে বিলীন হয়ে যায় বহু জনপদের গরিমা, কিন্তু রাঢ় বাংলার লোক সংস্কৃতির প্রভাব ও ঐতিহ্যের পটভূমিতে আজ ও সেইসব জনপদের গুরুত্বকেই অস্বীকার করা যায় না। আঞ্চলিক জনজীবনের সেইসব ঘিরে আজও মানুষের মনে অসংখ্য প্রশ্ন। তাই বৈশাখী শুক্লপক্ষের সপ্তদশ দিবস মঙ্গলবার রৌদ্র-কারোজ্জ্বল দিনে এই অতীত অন্বেষণের জোয়ারে নিজেকে ভাসিয়ে তাই পৌঁছে গেলাম রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের উল্লিখিত রাঢ় বর্ধমানের ‘আট-হাট, ষোল গলির বত্রিশ বাজারের এক হাট কাজীর হাটে।’ বর্ধমান শহরের অদূরে ‘গোদা’-র কাছেই এই জনপদ। এককালে গণ্ডক গ্রাম ছিল। গল্পের মতো হলেও বহু প্রমাণ মেলে আজ সে সব ঘটনা।

ত্রয়োদশ শতকের কাছাকাছি সময়ে যে রাজনৈতিক রাষ্ট্রবিপ্লব রাঢ় বাংলার সমাজে এক প্রবল ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি করে, তা সমাজের মর্মমূল ধরে প্রচণ্ড আবেগে নাড়া দিয়েছিল, চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে রয়েছে তার সুস্পষ্ট স্বাক্ষর। শক্তির দম্ভের বিরুদ্ধে লাঞ্ছিত জাতি সেদিন। কাতর কণ্ঠে অভিযোগ করেছে ভাগ্য-দেবতার কাছে। তাই কাহিনীর অন্তরালে ‘চণ্ডীমঙ্গলর সমাজে একদিন যেমন ছিল অসংযম ও অমিতাচার অন্যদিকে তেমনি ধর্মবিশ্বাস। তাই মনসামঙ্গল কাব্যে যেমন কাব্য প্রাধান্য অধিক, চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে তেমনি সমাজ প্রাধান্য অধিক। তাই ওলাইচণ্ডী মেলা ও পুজোকে পরখ করার কারণে এবং বিলুপ্ত রাঢ় সাংস্কৃতির অতীত খুঁজতে গিয়ে ভস্মাচ্ছাদিত অতীতের মধ্য থেকে নিয়ে এলাম যে কিংবদন্তী কাজীর হাটের উসোদীঘির পাড়ে ওলাইচণ্ডী এই হাটের উসোদীঘির পাড়ে ওলাইচণ্ডী এই গ্রামের আরাধ্য দেবী। দেবীর আবির্ভাবের ইতিহাস যেমন বিচিত্র তেমনি রোমাঞ্চকর। কাজীর হাটের অল্প দূরে গোদ্দার দক্ষিণ পশ্চিম কোণে প্রায় দুশো বিঘে আয়তনে একটি দীঘি। নাম বেনে দীঘি। দীঘির জল কাকচক্ষুর ন্যায় জ্বলজ্বল করছে, পাশ দিয়ে চলে গেছে মেঠো পথ, রাখালরা মাঠে চলেছে। এমনি এক শিশির বিন্দু ঝরা মনোরম শীতের সকালে আজ থেকে আনুমানিক তিনশো বছর আগে বর্তমানে জীবিত সনাতন দাসের পূর্বপুরুষ ওই দীঘিতে ছাকনি জাল দিয়ে জিওল মাছ, গুগলি, শামুক, কাঁকড়া

প্রভৃতি ধরার সময় জালে একটি শিলার মত পাথর পায়। ওখানে বেশীর ভাগ বর্গক্ষেত্রীয়দের বাস ছিল। তারপর ওরা ওই পাথর গুগলি শামুক থেতো করতে থাকে। কিন্তু আশ্চর্যের কথা প্রতিদিনের আঘাতে ওই শিলারূপ দেবীমূর্তির কোন বিকৃতি ঘটে নি। তারপর একদিন ওই সনাতন দাসের পূর্বপুরুষ স্বপ্নাদৃষ্ট হন। স্বপ্নে তাকে মা আদেশ দেন, আমি ওলাইচণ্ডী মা, শিলা রূপে তোর কাছে আছি। তুই ামাকে উদ্ধার করে কাজীর হাটে উসো দীঘির পাড়ে বটবৃক্ষের তলায় বেদী তৈরী করে আমায় প্রতিষ্ঠা করে পূজোর ব্যবস্থা কর। আমরা সাত বোন। বোঁয়াইচণ্ডী, বসনচণ্ডী, প্রভৃতি। বোঁয়াইচণ্ডী মাতার পূজো হয় আষাঢ় মাসে আর এই ওলাইচণ্ডীর মায়ের পূজো হয় বৈশাখ মাসে শেষ মঙ্গলবারে আগের মঙ্গলবার। বৈশাখ মাসে যে মাসে পাঁচটি মঙ্গলবার পড়ে সেবছর তৃতীয় মঙ্গলবারে মায়ের পূজো হওয়া বিধি নির্দিষ্ট। বর্তমান পূজারী ব্রাহ্মণ নেপাল চক্রবর্তীর কাছ থেকে সংগৃহীত তথ্য থেকে জানা যায়, বাংলার ১৩২৬ সাল পর্যন্ত মায়ের পূজোর কাজে নিযুক্ত ছিলেন গৌর চক্রবর্তী মহাশয়। তারপর কালক্রমে পূজোর দায়িত্বে আসেন বামাপদ চক্রবর্তী বংশের নেপাল চক্রবর্তী। সংগৃহীত তথ্য থেকে জানা যায় মায়ের ঘট আনা হয় বেনেপুকুর থেকে এবং ঘট আনার অধিকার একমাত্র বংশের বড় ছেলের আছে। ঘট আনার দৃশ্য খুব রোমাঞ্চকর। যিনি ঘট বহন করবেন তিনি সকাল থেকে স্নান করে শ্রদ্ধাচারে উপোস করে মায়ের পীঠস্থানে ধ্যানস্থ থাকে। তারপর দ্বিপ্রহরে ঘট আনার অনুষ্ঠান। ঘট আনার সময় পূজারী ব্রাহ্মণ বিকট চিৎকার করে অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় টলতে টলতে গিয়ে ঘট আনেন। তারপর মায়ের পূজো আরম্ভ হয়। ওই পূজোমণ্ডপে প্রচুর ভক্ত সমাগম হয়। দূর দূরান্ত থেকে ভক্তরা আসে মায়ের পূজো দিতে। অনেক ভক্ত আবার ঢাকের বাদ্যির সঙ্গে পূজো নিয়ে আসেন। বিরাট মেলা হয়। মেলায় বিভিন্ন ধরনের জিনিস বিক্রি হয়। প্রচুর জনসমাগম হয়। স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করে ও এই বিশাল ভীড় সামাল দেওয়া মুস্কিল হয়ে যায়।

মায়ের পূজো যে কত আসে তা অকল্পনীয়। কথিত আছে মায়ের কাছে মানত করলে মা তা মনাস্কমনা পূর্ণ করেন। সেই বিশ্বাসে কত ভক্ত মায়ের কাছে হত্যা দেন, দণ্ডী কাটেন তা স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। এবছর মানসিকে ছাগ বলি হয় দেড়শোর অধিক। বহু ভক্তের ভর হয়। পরের দিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। যেমন বাউল গান, যাত্রার গান প্রভৃতি।

এই মণ্ডপের নীচেই অধিষ্ঠিত আছেন ধর্মরাজ।

বীরহাটার বড়মা

বর্ধমান রেলওয়ে ষ্টেশন হতে সোজা দক্ষিণ মুখে জি-টি. রোড বরাবর অগ্রসর হয়ে প্রায় ১ কি. মি. দূরে তেলমারুই রোড ও কালীবাজার রোডের সঙ্গম স্থলে এই দেবী মন্দিরের অবস্থান।

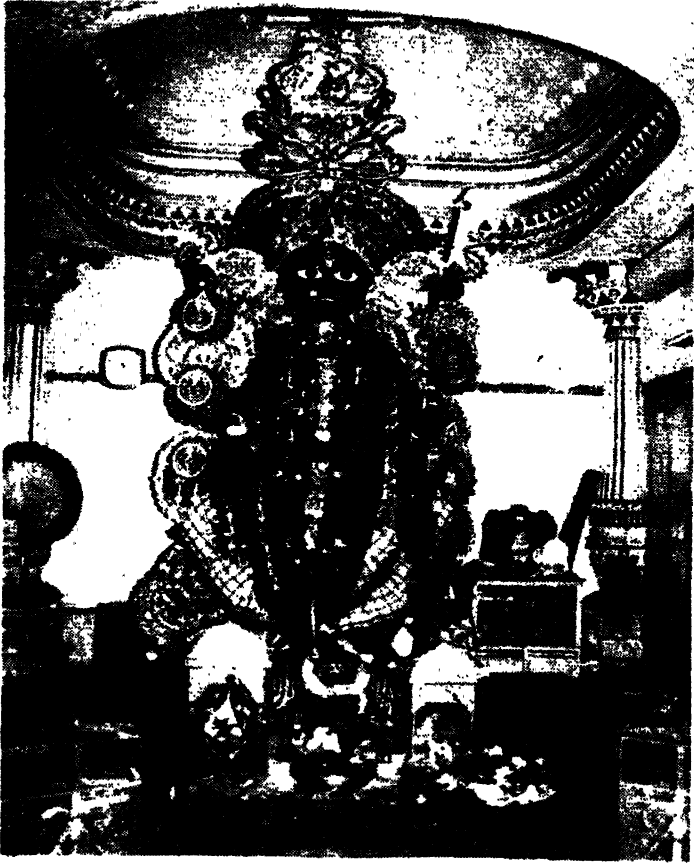
বীরহাটা কালী মাতার প্রতিষ্ঠার সঠিক ইতিহাস জানা না গেলেও এ সম্বন্ধে জনশ্রুতি এই যে, রাজা 'বিরাট' এই দেবী প্রতিষ্ঠা করেন। অনেকে আবার এই দেবীকে ' ডাকাতে কালী ' নামে অভিহিত করে থাকেন। আবার, কারও কারও মতে, পুরাকালে এখানে অনেক বীরাচারী সন্ন্যাসী আসতেন; তাঁদের নামানুসারে এই অঞ্চলের নাম বীরহাটা হয়েছে। এ-ও জনশ্রুতি আছে, বর্ধমানে বর্গী হাঙ্গামার সময় এতদঞ্চল থেকে বর্গীদের অপসারণ করার জন্য জনগণ 'বর্গী হটাও' অভিযান চালায়। 'বর্গী হটাও' শব্দটি পরিবর্তিত হয়ে পরবর্তী কালে 'বীরহাটা' নামে অভিহিত হয়ে থাকতে পারে। তবে এখনও পর্যন্ত এর সঠিক ইতিহাস জানা যায় নাই।

প্রয়াত ভাষাচার্য ডঃ সুকুমার সেনের ভাই প্রয়াত সুশীল কুমার সেন এর তথ্য উদ্ঘাটনে সচেষ্ট হলেও তেমন কিছু তথ্য উদ্ঘাটিত হয় নাই। তবে কথা প্রসঙ্গে তিনি অগ্রজ সুকুমার সেন মহাশয়ের মুখে শুনেছিলেন যখন জি-টি. রোড পীচরাস্তা হওয়ার সময় এই দেবীর অস্তিত্ত্ব ছিল এবং বাঁকা নদীর তীরবর্তী জঙ্গলাকীর্ণ এতদঞ্চলে পথ নির্মাণ কালে জনমজুরেরা যখন মাটি কাটছিল তখন ঐ স্থানে একটি বেদীর অস্তিত্ত্ব পাওয়া যায়, এর বেশী আর কিছু জানা যায় নাই।

ঐ সময় দক্ষিণদামোদর অঞ্চলের কোন ঘোষাল পরিবার মা'র পূজাদি কর্মে নিযুক্ত ছিলেন। উক্ত মহল্লাবাসী প্রবীণ ব্যক্তিরা বলেন, তাঁরা তাঁদের পিতা-পিতামহদের কাছে শুনেছেন তখনকার দিনে, ম্যালেরিয়া মহামারীর প্রাদুর্ভাব সময়ে প্রচলিত ধ্যানধারণানুযায়ী 'রক্ষাকালী'র পূজা হতো। তাঁদের উক্তি থেকে অনুমিত হয় ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে জঙ্গল পরিষ্কার করে উক্ত বেদীটিকে শক্তপোক্তভাবে পুনর্নির্মাণ ক'রে বাঁশ-খড় তালপাতার ছউনী করে একটি স্থায়ী পূজা মণ্ডপ নির্মাণ করা হয়।

কালক্রমে স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের আন্তরিক প্রচেষ্টায় এবং বংশগোপাল নন্দে মহাশয়ের অর্থানুকুল্যে একটি পাকা ঘর তৈরী হয় এবং তখন থেকেই স্থানীয় বাসিন্দা স্বর্গীয় ননীগোপাল চন্দ্র, অধর সেন, রেণুপদ দত্ত প্রমুখ ভক্তদের প্রচেষ্টায় প্রতি অমাবস্যায় মা'র পূজা শুরু হয়। তার নিদর্শন স্বরূপ আজও মা'র মূল পূজার দিন 'চন্দ্র'দের বাড়ী থেকে পূজার উপকরণ হিসাবে রূপার আসনাঙ্গুরীয়, মধুপর্কের কাংস বাটি আনা হয়।

পরে প্রাক্তন এম. পি. গুরুগোবিন্দ বসু মহাশয়ের পিতা তৎকালীন্ বর্ধমান



বীরহাটার বড়মা

কালেক্টারীর সুপারিন্টেন্ডেন্ট্ স্বর্গীয় মোহিনীমোহন বসু মহাশয় এই পূজার ব্যবস্থ পনা ও দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯২৪ খ্রীঃ অব্দের কাছাকাছি সময়ে মোহিনীমোহন বসু, বৈদ্যনাথ মুখার্জী, শশধর রায় প্রমুখ ভক্তগণের প্রচেষ্টায় অর্থ সংগ্রহ এবং মহাল্লাবাসী'দের নিকট ধর্মভাণ্ড (একটি ভাঁড় বিশেষ যাতে প্রতি পরিবার প্রতিদিনের রান্নার চাল থেকে এক মুষ্টি করে চাল উক্ত ধর্মভাণ্ডে রাখবেন)। চালের বিক্রয়লব্ধ অর্থে মন্দিরের স মনে একটি টিনের পরচালা তৈরী করা হয়। তাঁদেরই প্রচেষ্টায় স্থানীয় বাসীন্দা ও ভক্তগণের মধ্য থেকে স্বর্গীয় মোহিনীমোহন বসু, উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কালীমন্দিরের সেবাইত হিসাবে নিযুক্ত হন। পরবর্তীকালে বীরহাটা, কালীবাজার, টাউনহল পাড়া প্রতাপেশ্বর শিবতলা ও মুরাদ মহল্লা এই পাঁচ পল্লীর ব্যক্তিদের নিয়ে "কালীবাড়ী সমিতি' নামে একটি রেজিষ্টার্ড সমিতি গঠিত হয়। বর্তমানে একটি স্থায়ী ট্রাষ্ট কমিটি গঠিত হয়েছে। ২০০১ খৃঃ অব্দে গঠিত 'বীরহাটা কালী ট্রাষ্ট'পূজাদির সঠিক পরিচালনা করে থাকেন। এই মন্দিরের পূর্বে এবং পরেও কোন স্থায়ী সম্পদ কিছু ছিল না। কেবল সাধারণের অর্থানুকুল্যে সার্বিক ব্যয় নির্বাহ হতো। ১৯৭৩ খ্রীঃ অব্দে স্বর্গীয় গুরুগোবিন্দ বসু মহাশয় এককালীন ১৭২৫ টাকা দান করেন, যার উদ্দেশ্য ছিল প্রাপ্য সুদ থেকে মা'য়ের প্রতি অমাবস্যার খরচ নির্বাহ হবে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে একটি ট্রাষ্টি গঠন করেন মহল্লার প্রাচীন বাসিন্দা নন্দদুলাল গাঙ্গুলী, শশাঙ্কশেখর মুখার্জী, সুধীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য এবং অরুণ কুমার রায় মহাশয়দের নিয়ে। বর্তমানে শ্রী রায় ব্যতীত সকলেই প্রয়াত।

কালক্রমে মহল্লার বাসিন্দা স্বর্গীয় লক্ষ্মণচন্দ্র দে মহাশয়ের অর্থানুকুল্যে স্বর্গীয় গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের ব্যবস্থাপনায় বাসগৃহের আদলে মায়ের পাকা ঘর তৈরী হয়। মূল বেদী কিছুটা স্থানান্তরিত করে এবং টিনের চালার পরিবর্তন করে পাকা ছাদযুক্ত নাটমন্দির নির্মিত হয়। পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ ১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দে পাড়ার যুবকবৃন্দ এবং ভক্তদের অক্লান্ত শ্রম ও অকুণ্ঠ সহযোগিতায় নাসিকের নিকট গোদাবরী তীরে ত্র্যম্বকের একটি ছোট মন্দিরের চূড়ার আদলে মা'র মূল মন্দিরের চূড়া এবং সর্বভারতীয় রীতি অনুসারে মন্দির অলঙ্কৃত করা হয়।

বীরহাটা কালীমাতা বর্ধমান শহরে 'বড়মা' নামে অভিহিত হয়ে থাকেন। এই মূর্তিটি বর্ধমান শহরে সর্ব বৃহৎ আকারের বলে হয়তো ঐ নামে অভিহিত। বর্তমানে ট্রাষ্ট কমিটির মাধ্যমেই পূজাদি ও মন্দির রক্ষণাবেক্ষণ হয়ে থাকে। পূর্বে বড়মা'র খড়ের কাঠামোতেই প্রতি অমাবস্যায় পূজা হতো, কোন দিন নিত্যপূজার ধারাবাহিক ব্যবস্থা ছিল না। ১৯৯২ খ্রীষ্টাব্দের কালীপূজার সময় হতেই ধারাবাহিক নিরবিচ্ছিন্নভাবে মা'র নিত্য পূজাদি চলছে। ঐ সঙ্গে একই মন্দিরে বাবা বীরেশ্বর মহাদেবের নিত্য সেবা চলে আসছে।

এ যাবৎকাল যাঁরা মায়ের পূজাদিকর্মে নিযুক্ত ছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দক্ষিণদামোদরের ঘোষাল পরিবার, মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শঙ্করীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, কালিদাস ভট্টাচার্য (এক বছরের জন্য) প্রভৃতি। ১৯৯২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে নিত্য পূজা করে আসছেন ভারত ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত বিশ্বেশ্বরী চতুষ্পাটীর অধ্যক্ষ শ্রী দেবাশিস মুখোপাধ্যায়, কাব্য-ব্যকরণ, কৃত্য স্মৃতি তীর্থ, বৌদ্ধ দর্শনাচার্য। এই চতুষ্পাঠীটি মন্দিরের দ্বিতল গৃহে অবস্থিত। এখানে বহু ছাত্র-ছাত্রী পৌরহিত্য, ব্যাকরণ, কাব্য, স্মৃতি ছাড়াও উচ্চবিদ্যালয়ের পাঠ অবৈতনিক হিসাবে গ্রহণ করে থাকেন।

উপরিউক্ত তথ্যগুলি চতুষ্পাঠীর অধ্যক্ষ মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে জ্ঞাত এবং এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন,"আমি নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করি, কারণ, মায়ের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে ১৯৯২ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব পর্য্যন্ত এই দীর্ঘ সময়ে অনেকানেক কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ মায়ের নিত্যপূজার ব্যবস্থা করেছিলেন কিন্তু নিরবচ্ছিন্নভাবে তা স্থায়ী হয় নাই। মায়ের কৃপায় আমার মত অধমের হাতে ১৯৯২ সাল থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে নিত পূজা গ্রহণ করে আসছেন। আমি ধন্য।"

এখানে দুর্গা পূজা, লক্ষ্মীপূজা ইত্যাদি পূজা হয়। প্রতি অমাবস্যায় মায়ের বিশেষ পূজা, হোম ও ভোগ হয়ে থাকে। মায়ের নিত্য সেবা হলেও নিত্যভোগের ব্যবস্থা এখনও করা যায় নাই। প্রতি অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় মায়ের খিচুড়ি ও পরমান্ন ভোগ হয়। তাছাড়াও যাদের বাড়ীতে কোন কারণে সত্যনারায়ণ পূজা করা সম্ভব হয় না তাঁদের সকলের প্রচেষ্টা ও সহযোগিতায় পূর্ণিমায় সত্যনারায়ণ পূজা হয়।

অমাবস্যায় কালীপূজা সাধারণতঃ রাত্রিকালে হলেও প্রতি অমাবস্যায় পূজা হয় সকাল ৫টা থেকে বৈকাল ৩টা পর্যন্ত। কেবলমাত্র মায়ের বার্ষিক কালীপূজায় ছাগ বলি হয়।

মায়ের প্রতিমা সারা বছরই মন্দিরে অবস্থান করে। বার্ষিক পূজার দিন সকালে মায়ের নিত্য সেবার পর সকাল ৭টায় মায়ের ঘট নিরঞ্জন হয় তারপর শহরের আপামর জনসাধারণ ও ভক্তরা বিশাল শোভাযাত্রা সহকারে মায়ের প্রতিমা নিরঞ্জন করে। সে বছরের নূতন প্রতিমা বেলা ১২টার পর মন্দিরে স্থাপন করা হয়। তারপর আবার যথারীতি নিত্য সেবা হয়। সাধারণতঃ ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার পরের দিন অন্নকূট মহোৎসব হয়।

মায়ের নিত্যসেবা হয় ভক্ত সাধারণের অর্থানুকূল্যে। প্রতিদিন নিত্য পূজার খরচ হিসাবে লাগে ৭০ টাকা। মায়ের নির্দিষ্ট কোন আয় না থাকায় নিত্য সেবার ব্যবস্থার জন্য যে চিন্তা ছিল, আজ ভাবতে অবাক লাগে এই মূহুর্তে মায়ের নিত্য সেবার জন্য আগ্রহী ভক্ত নাম নথিভুক্ত করলে তার সেবার দিন ধার্য হবে চার বছর পর। তবে ট্রাষ্ট কমিটি নির্দিষ্ট সময়ের এক মাস পূর্বে ডাক যোগে বা ফোন পরিসেবার মাধ্যমে তাঁকে নির্দিষ্ট দিনটি জানিয়ে দেবেন। মায়ের ভোগের জন্য কাউকে দক্ষিণা

দিতে হয় না। ভোগ দেবার জন্যে নাম নথিভুক্ত করলে একশত পঞ্চাশ টাকা ট্রাস্ট কমিটিকে দিতে হবে। তবে তার জন্য তিনি দুই জনের খাবার মত ভোগ পাবেন। প্রতি অমাবস্যায় বা পূর্ণিমায় মায়ের ভোগের জন্য চার-পাঁচজনের নাম নথিভুক্ত করা হয়।

দেবমন্দির পরিচালনার ভার বা পূজা-আর্চা এবং মন্দির রক্ষণাবেক্ষণের ভার বীরহাটা কালীমাতা ট্রাষ্ট কমিটির উপর ন্যাস্ত। বর্তমানে এই ট্রাষ্ট কমিটির সদস্যারা হলেন ---

হলেন ---	শ্রী সুধীর কুমার চ্যাটার্জী	---	সভাপতি
	শ্রী আশীষ চ্যাটার্জী	---	সহ সম্পাদক
	শ্রী অরুণ কুমার রায়	---	কোষাধ্যক্ষ
	শ্রী শৈলেন্দ্র নাথ চ্যাটার্জী	---	সদস্য
	শ্রী তপন চ্যাটার্জী	---	ঐ
	শ্রী সমীর চ্যাটার্জী	---	ঐ
	শ্রী তাপস চ্যাটার্জী	---	ঐ
	শ্রী সরিৎ গাঙ্গুলী	---	ঐ
	শ্রী সোমেন্দ্র নাথ সরকার	---	ঐ
	শ্রী রণজিৎ হুই	---	ঐ
	শ্রী কুমার সিন্‌হা	---	ঐ
	শ্রী অশোক ব্যানার্জী	---	ঐ
	শ্রী সিদ্ধেশ্বর মুখার্জী	---	ঐ
	শ্রী সুধীর রঞ্জন ভট্টাচার্য্য	---	ঐ
	শ্রী সোমেশ চ্যাটার্জী	---	ঐ
	শ্রী প্রবাস মুখার্জী	---	ঐ

সমিতির দীর্ঘদিনের সম্পাদক বর্ধমানের বিশিষ্ট সমাজসেবি অধ্যাপক মানস কুমার রায়। এর আমলেই বীরহাটাকালীমাতার নিত্যসেবা শুরু হয় এবং তাঁরই ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বর্ধমান ন্যায়ালয়ে বীরহাটা কালীবাড়ী ট্রাষ্ট গঠিত হয়েছে। দুঃখের বিষয় নবগঠিত ট্রাষ্টের সম্পাদক হিসাবে তাঁকে আমরা পেলাম না, কালের অমোঘ বিধানে তিনি লোকান্তরিত হলেন। তাঁর অকাল মৃত্যুতে শোকাহত চিত্তে শ্রীমায়ের চরণে অমর আত্মার চিরশান্তি প্রার্থনা করি।

জনগণের নিকট আবেদন, এই মাতৃদেবীকার আরও কোন তথ্য বা ইতিবৃত্ত জানা থাকলে তা "বীরহাটা কালীবাড়ী ট্রাষ্ট কমিটি"-কে লিখিত ভাবে জানাতে। কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁর নামোল্লেখ থাকবে।

বর্ধমান শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যমঠ, মিঠাপুকুর

মিঠাপুকুরের মোড় থেকে সোজা উত্তরে একটু গেলে মিঠাপুকুর রাস্তার উপর বাঁ-দিকে শ্রীকৃষ্ণ-চৈ তন্যমঠ অবস্থিত।

শ্রী চৈতন্যদেবের শিক্ষা ও দীক্ষা-ভূমি বলেই হয়তো বর্ধমানের গ্রামে গ্রামে নিম্ন, মধ্য ও উচ্চ পরিবারেও বৈষ্ণব ধর্মের প্রসার ঘটেছিল। এই একবিংশ শতকে শহরের মিঠাপুকুর রোডে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের নির্মিত 'চৈতন্য মঠ' আছে। এখানে নিত্য নাম-কীর্ত্তন হয়; হয় বিভিন্ন পার্বন অনুষ্ঠান। এখানে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত বহু জ্ঞানী-গুনী-নর-নারী আসেন। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বহু স্ত্রী-পুরুষ এই মঠে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

বাংলার ১৩৬৮ সাল ইংরাজীর ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে বৈশাখ মাসে এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় প্রতিষ্ঠা করেন বর্ধমান নূতন গঞ্জের লব্ধ-প্রতিষ্ঠ জমিদার রাজকৃষ্ণ দত্তের কন্যা পান্নাময়ী দেবী। পান্নাময়ী দেবীর বিবাহ হয় বর্ধমান বামচাঁদাই পুরের ভূস্বামী শশীভূষণ দে-র পুত্র ভোলানাথ দে-র সঙ্গে। অল্প বয়সে স্বামীর মত্যুর পর পান্নাময়ীদেবী মিঠাপুকুরে তাঁদেরই জায়গায় এই চৈতন্যমঠ নির্ম্মাণ করেন। পান্নাময়ী দেবীর সন্তান সন্ততি না থাকায় এই বিশাল সম্পত্তি যাতে জনগণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় সেই ইচ্ছায় তিনি প্রথমে বামচাঁদাইপুরে একটি দাতব্য চিকিৎসালয়, একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও একটি মঠ মন্দির প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সেই সময় তিনি নবদ্বীপে তেঘরিপাড়ায় গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি অর্থাৎ 'দেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ' থেকে দীক্ষিত হন। ঐ মঠের প্রচারক প্রবর নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী যাঁর সন্ন্যাস নাম শ্রীমদ্ভক্তি কমল মধুসূদন গোস্বামী মহারাজের অনুপ্রেরণায় তিনি নিজ গ্রামে মঠ-মন্দির-নির্মাণে ইচ্ছাপ্রকাশ করলেও পরিবেশের অভাবে শেষ পর্য্যন্ত ঐ প্রস্তাব বাতিল করেন। পরে মনস্থ করেন যে বর্ধমানের লস্করদিঘী অঞ্চলে তাঁদের নিজস্ব ১২ কাঠা জায়গার উপর যে বিশাল বাড়ী আছে সেখানে তিনি ঐ মঠ-মন্দির-নির্মাণ করবেন। কিন্তু সেখানের পরিবেশও অনুকূল না থাকায় শেষ পর্য্যন্ত মিঠাপুকুরে তাঁদের যে বাড়ী ছিল অর্থাৎ বর্তমানে যেখানে এই চৈতন্যমঠ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেই স্থানই অনুকূল বিবেচনার্থে ঐখানেই মঠ-মন্দির নির্ম্মাণ করেন এবং নাম দেন 'বর্ধমান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মঠ'।

প্রতিষ্ঠা দিবসে বহু ভক্তকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়েছিল। ঐ সময় দু-দিন সুদৃশ্য রথ নির্ম্মাণ করে ব্যাণ্ড ও সংকীর্ত্তণ সহযোগে শোভাযাত্রা সহকারে বর্ধমান শহর পরিক্রমা করা হয়েছিল। এই মঠের সব থেকে বড় উৎসব জন্মাষ্টমী ও নন্দোৎসব।



বর্ধমান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যমঠ, মিঠাপুকুর

ঐ দিন প্রায় দুহাজার ভক্তকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। আর একটি উল্লেখযোগ্য উৎসব অঘ্রাণ মাসে শুক্লা নবমীতে গুরুপূজা। ঐ দিনও প্রায় হাজার ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করে। এছাড়া প্রত্যহ ভোর বেলায় মঙ্গলারতি ও তারপর বাল্য ভোগ হয়। সকাল ৮ নাগাদ ফল-মূল, মিষ্টি, চিঁড়া সহকারে অর্চ্চন-নৈবেদ্য নিবেদন করা হয়। দুপুরে পরমান্ন সহ আতপ চালের ভোগ দেওয়া হয় সঙ্গে থাকে ভাজা, ঘণ্ট, চচ্চরি, ডাল, রসা, চাটনি ইত্যাদি। বিকালে জাগরণের পর বৈকালিক ফল মিষ্টি ভোগ হয়। রাতে অন্যান্য ব্যঞ্জন সহ ঘি মাখা রুটি দুধ ভোগ হয়।

প্রত্যহ মঙ্গলারতির পর প্রভাতি প্রার্থনা-কীর্ত্তন মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন শাস্ত্রপাঠ ও শেষে নাম কীর্ত্তন এবং তারপর শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়ে থাকে। প্রত্যহ ঐ সময় বহু শ্রোতা সমাগম হয়। বর্ধমান এই চৈতন্য মঠে প্রত্যহ দুবার পাঠ কীর্ত্তন নিয়মিত হয়ে থাকে।

মঠের বর্তমান অধ্যক্ষ শ্রী মদ্ভক্তি জীবন আচার্য্য মহারাজের নিকট জানা গেল পান্নাময়ী দেবীর প্রচুর সম্পত্তি ছিল, তা বর্তমানে আইনানুসারে খাস জমিতে পরিণত হওয়ায় মঠের পরিচালনা খুব কষ্টকর হয়ে গেছে। পরিচালনার প্রায় সমস্ত ব্যয় ব্রহ্মাচারীদের ভিক্ষালব্ধ আয়ের দ্বারা অর্থাৎ জনসাধারণের সাহায্যের উপর নির্ভরশীল। এই মন্দির-প্রতিষ্ঠা উৎসব ও সেবার নিয়মাদি গুরুদেব শ্রীমদ্ভক্তি কমল মধুসূদন গোস্বামী কর্তৃক ব্যবস্থিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বর-সিদ্ধেশ্বরী কালীমাতা

এই সিদ্ধেশ্বরী মন্দির কতদিন আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সে বিষয়ে সঠিক কোন তথ্য পাওয়া যায় নাই। তবে অনুমান করা যায় বা শ্রুত হয় প্রায় দু'শো বছর পূর্বে বর্ধমান মিঠাপুকুর অঞ্চলে তৎকালীন বর্ধমানের মহারাজা কালীপুকুরের ধারে এই সিদ্ধেশ্বরী মন্দির এবং তৎসংলগ্ন শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কালীপুকুরের উত্তর পাড়ে তখন ছিল ঘন জঙ্গলের মধ্যে শ্মশান। নিকটে কোন বসবাস ছিল না। কালক্রমে এই দেব-দেবীর পূজাও প্রায় লুপ্ত হওয়ার মুখে। সেই সময়, আজ থেকে আনুমানিক দু'শো বছর আগে বর্ধমান জেলার দক্ষিণে পলাশন নামক গ্রামের ঘোষ পরিবারের জনৈক পরম ধার্মিক ব্যক্তির যিনি উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ছিলেন, তিনি এই মন্দিরে নিয়মিত পূজা-অর্চনা, ধ্যান ইত্যাদি করতেন। পরে তিনি চাকুরী থেকে স্বেচ্ছাবসর নিয়ে মাতৃসেবায় নিজেকে নিয়োগ করেন এবং মৃন্ময়ী মূর্ত্তি চিন্ময়ীরূপে প্রকাশিত হয়। তারপর থেকে তৎকালীন মহারাজা এই দেব-সেবার ভার ঘোষ মশাইকে অর্পন করেন এবং ঘোষ মশাই সেবাইত হিসাবে ঐ দেব সেবার কাজ চালিয়ে যান। ঘোষ মশাই-এর মৃত্যুর পর ঐ দেব-সেবার কাজ লুপ্ত প্রায় হয়ে পরে। তিনি থাকাকালীন পূজা, বলিদান, নিত্যসেবা সব কিছুই মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হত। মায়ের কাছে যে বলিদান হ'ত তার প্রমাণও পাওয়া যায়, ওখানে একটি হাড়কাট জীর্ণ অবস্থায় বহুদিন বর্তমান ছিল। এখন লুপ্ত।

কালক্রমে মায়ের পূজার ভার আরোপিত হয় শ্যামলাল পাড়ার কাশীশ্বরী দেবী নামে এক ধর্মপ্রাণা মহিলার উপর। তিনি ছিলেন মন্দিরের ভোগ রন্ধনকারিণী শ্রদ্ধেয়া অভয়াদেবীর শ্বাশুরীমাতা। ঐ কাশীশ্বরী দেবী জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত দেব-সেবার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি মৃত্যুকালে স্থানীয় অধিবাসীদের নিকট অনুরোধ করেন এই দেব-সেবার ভার নেওয়ার জন্য। তাঁর অনুরোধে সাড়া দিয়ে স্থানীয় প্রখ্যাত উকিল মোহিনী রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, শচীনন্দন সিংহ, গনেশ বাবু, কৃষ্ণচন্দ্র কানু, কালীকৃষ্ণ রায়, যশোদা নন্দন সিংহ, শক্তিপদ বসু, আদিনাথ সেন, শচীমিত্র, বিভূতি ভূষণ দাস, শিরীষ ঘোষ, অমিয় সরকার, রাখোহরি সরকার, বংশীধর পাইন, সুবোধ কুমার দে, শিবরঞ্জন ব্যানার্জী প্রমূখ উদ্যোগী ব্যক্তিগন দেবীর নিত্য সেবার ব্যবস্থা করেন। তাঁদের উদ্যোগে নিত্য পূজা, বাৎসরিক পূজা, অন্নকূট উৎসব মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে।

বর্তমানে মন্দির সুন্দরভাবে সংস্কার করা হয়েছে। মায়ের মন্দির লাগোয়া শিব-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন সিদ্ধেশ্বর শিবলিঙ্গ। বারোমাস মায়ের মূর্ত্তি থাকে।



শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বরী কালীমাতা

পুনরায় পরের বছর আবার ঐ মূর্ত্তি নিরঞ্জন করে নূতন মূর্ত্তির পূজা হয়। নিত্য পূজা হয় বেশ শুদ্ধাচারে। নিত্য মায়ের ভোগ হয়।

ভক্তরা আগের দিন নির্দ্দিষ্ট মূল্য দিয়ে নাম লিখিয়ে গেলে মায়ের ভোগের প্রসাদ পাবেন। ঠিক মধ্যাহ্নে মায়ের অন্নভোগ হয়। ত্রি-সন্ধ্যা মায়ের আরতি হয় ও পূজা হয়। ভক্তরা মায়ের কাছে মানসিক করলে মা তাঁদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। প্রতি শনিবার এবং বিশেষ বিশেষ দিনে মন্দিরে নাম গান হয়। বাৎসরিক কালীপূজা, শিবরাত্রি ও জন্মাষ্টমী উৎসব মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হয়।

যাঁর উদ্যোগে এই মন্দির বর্ত্তমান পর্যায়ে রূপায়িত হয়েছে তার রূপকার স্বর্গীয় শচীনন্দন সিংহ।

মন্দির পরিচালনার ভার একটি পরিচালন সমতির উপর ন্যাস্ত। বর্তমানে পরিচালনা সমিতির সম্পাদক হলেন শ্রী রামদাস ভট্টাচার্য্য। বর্তমানে মায়ের পূজার কাজে নিযুক্ত আছেন শ্রী কালী কিঙ্কর রায়।

কোটালহাটের শীতলা মা

মায়ের অবস্থান কোটাল হাটের কমলাকান্ত কালীমন্দির ও ভারতীবালিকা বিদ্যালয়ের পাশ দিয়ে দক্ষিণ দিকে যে রাস্তাটি চলে যাচ্ছে অর্থাৎ ভারতী বালিকা বিদ্যালয়ের ঠিক পশ্চিম দিকে স্বর্গীয় নারায়ণ চন্দ্র দে মহাশয়ের গৃহে। মন্দির বলে কিছু নাই। ওঁনারই বাড়ীর একটি কক্ষে মা অধিষ্ঠিতা আছে ন। কথিত আছে বর্ধমানের মহারাজা কৃষ্ণরাম রায়ের আমলে এই ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ প্রায় তিনশো বছরের এই ঠাকুর। কে বা কারা এই শীতলা মাকে প্রতিষ্ঠা করেন তার সঠিক ইতিহাস জানতে না পারায় অনুমান করা হয় রাজা কৃষ্ণরাম রায়ই এর প্রতিষ্ঠাতা। তখন মায়ের মন্দির ছিল। কিন্তু কালক্রমে সংস্কারের অভাবে মন্দিরের অস্তিত্ব কিছু নাই। শেষ মন্দির সংস্কার করা হয়েছিল মহারাজ বিজয়চাঁদের আমলে।

মা শীতলা হলেন মড়ক মহামারী বসন্তের দেবতা। যদিও বর্তমানে এই বসন্ত রোগ দেশ থেকে নির্মূল হয়ে গেছে, তবুও মা শীতলাকে ভয় করে না এমন লোক খুব অল্পই আছে। শীতলা অবশ্য সারা বাংলায় এমনকি ভারতের বিভিন্ন স্থানে পূজিতা হন। এ পর্য্যন্ত পরিদৃষ্ট শীতলা মূর্ত্তি ও প্রতীকগুলিকে পাঁচটি ভাগে উল্লেখ করা যায়। তার মধ্যে এই মূর্ত্তিটি শাস্ত্রোক্ত ধ্যান-মূর্ত্তি-প্রকাশক মৃন্ময়ী আশ্চর্য নারী মূর্ত্তি। মায়ের বাহন গর্দভ। কখনো বা গর্দভের উপরে তিনি উপবিষ্টা। তাঁর ডানহাতে একটি লম্বা ঝাঁটা। বাঁ হাতে কলসী। মাথায় চক্রাকারে একটি মুকুট ও মুকুটের উপরে একটি কুলো। সর্বাঙ্গে বিবিধ অলংকার। মূর্ত্তির পদতলে অনুচর জরাসুর। তারই সঙ্গে ঘণ্টাকর্ণ ও দাসী পদ্মাবতী।

এই মূর্ত্তি যে বর্ধমানের রাজাদের প্রতিষ্ঠিত তার স্বপক্ষে যুক্তি হলো আমরা শিশুকাল থেকে দেখে আসছি যে রাজপরিবারের কোন অনুষ্ঠান হলেই এই মায়ের মন্দিরে পূজা দেওয়া হতো। এমন কি শেষবার আমরা দেখেছি ছোট রাজকুমার স্বর্গীয় অভয়চাঁদ মহাতাবের বিয়ের সময়। বিবাহের পরদিন ছোট রাজকুমার ও তাঁর স্ত্রীকে শোভাযাত্রা সহকারে নিয়ে আসা হয়। সাথে ছিলেন তৎকালীন মহারাণী রাধারাণী দেবী। এই শোভাযাত্রায় হাতী এবং বিভিন্ন ধরণের বাজনা ও বহুলোক অংশ নেয়। তবে বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় বর্ধমান শহরের অধিকাংশ মাড়োয়ারী সম্প্রদায়ের ভক্তগণই মায়ের মন্দিরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে।

শীতলা অষ্টমী তিথিতেই মায়ের বিশেষ পূজা হয়। পাঁজিতে উল্লিখিত নির্দিষ্ট অষ্টমী তিথিতে (কোন বার ফাল্গুন মাসে আবার কোনবার চৈত্র মাসে পরে) ঐ বিশেষ পূজা হয়। ঐ দিন বহু ভক্ত মায়ের পূজা দিতে আসেন। তার মধ্যে বেশীর ভাগই



কোটালহাটের শীতলা মা

থাকে। মাড়োয়ারী সম্প্রদায়ভুক্ত। ভোর পাঁচটা থেকে মায়ের পূজা আরম্ভ হয়। চলে বৈকাল পর্যান্ত। দৈনন্দিন পূজার কাজে নিযুক্ত আছেন শ্রী অক্ষয় চট্টোপাধ্যায় এবং বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়।

এছাড়া মায়ের নিত্য সেবার ব্যবস্থা আছে। প্রত্যহ পূজা, আরতি হয়। জন্মাষ্টমী উৎসব এবং শীতলা অষ্টমী পূজায় হরিনাম সংকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়। বৈশাখ মাসেই বেশী ভক্ত মায়ের পূজা দিতে আসেন। বর্ত্তমানে সেবাইতরা হচ্ছে কাশীনাথ দে, পরেশ নাথ দে, তারকনাথ দে, বৈদ্যনাথ দে ও সীতানাথ দে।

মন্দিরের ভিতর ধর্মরাজ, শিবলিঙ্গ, নারায়ণ শিলা এবং অন্যান্য দেব-দেবীর মূর্ত্তি সমেত মোট ১৬টি মূর্ত্তি এই মন্দিরে বিরাজ করছেন।

ভাতছালার শ্রীশ্রী দুর্গামাতা

ভাতছালার এই দুর্গামাতা খুব প্রাচীন না হলেও অল্প কয়েক বছরের নয়। বর্ধমান রাজসিংহাসনে তখন রাজা বনবিহারী কাপুর আসীন। সুতরাং বলা যেতে পারে এই দেবী দুর্গামাতা প্রায় দেড় শত বছর যাবৎ পূজিতা হয়ে আসছেন।

ভাতছালার এই অঞ্চলটি সে সময় 'হাড়ি জাতির' বসবাস। সেইজন্য এই পাড়াকে হাড়িপাড়া বলা হতো। বর্তমানে দেবী দুর্গামাতার যে মন্দিরটি আছে সেইটি তখন ছিল লক্ষ্মী হাড়ি ও বাদলা হাড়িদের গোয়াল ঘর। ইটের পাকা গাঁথনি দেওয়াল ছিল না, বাঁশ আর মাটির ছিটেবেড়ার দেওয়াল।

কথিত আছে একদিন সন্ধ্যায়; বৃষ্টি পড়ছে, আকাশ মেঘে ঢাকা। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের ঝিলিক। চারদিক অন্ধকার। তখন এখানে ইলেকট্রিক লাইট ছিল না। অধিকাংশই গাছ-গাছালিতে ভরা এই অঞ্চল। হঠাৎ হাড়িদের মনে হলো, গোয়ালঘরে কে যেন মানুষজন ঢুকেছে। তারা গরু চোর সন্দেহে লাঠি সোঁটা নিয়ে এসে দেখে, একজন স্ত্রীলোক ছেলে কোলে দাঁড়িয়ে আছেন, মনে হলো বেশ বড় ঘরের মহিলা। বললেন, "খুব বৃষ্টি পড়ছে তাই এখানে একটু দাঁড়িয়েছি . . . ।" লক্ষ্মী-বাদলা-রা লজ্জিত হয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করে চলে যায়। সেই রাত্রেই তারা স্বপ্ন দেখে, সেই মহিলা জ্যোতির্ময়ী রূপে দাঁড়িয়ে আছেন বলছেন, "আমি স্বয়ং দেবী দুর্গা। তোমরা আমায় ঐ স্থানেই পূজোর ব্যবস্থা কর।" কিন্তু হাড়িদের সে সঙ্গতি ছিল না। ঘটনাটি রাজা বনবিহারী কাপুরের কর্ণগোচর হয়। ঐ জায়গা ছিল মহারাজার খাস জমি। যাই হোক, তিনি ঐ ছিটে বেড়ার ঘরেই পূজার ব্যবস্থা করে দেন। পূজার সঙ্কল্প হতো বনবিহারী কাপুরের নামেই। তাঁর পরলোক গমনের পরেও সেই ব্যবস্থা চলে আসছিল।

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে অক্টোবর মাসে বনবিহারী কাপুরের পুত্র বিজনবিহারী কাপুর, 'বিজয়চাঁদ মহতব' নামে বর্ধমান রাজ সিংহাসনে বসেন। (প্রাচীন বর্ধমানের সংস্কৃতি —নীরদবরণ সরকার, পৃঃ ৯৯)। তিনি পূজাস্থল ও ঐসব জমির খাজনা আদায়ের নির্দেশ দেন। কিন্তু দরিদ্র হাড়ি সম্প্রদায় অপারগ হওয়ায় খাজনা দিতে অস্বীকার করলে রাজকর্মচারিগণ দুর্গামাতার ছিটেবেড়ার পূজার ঘর ভেঙে সব তছনছ করে দেন। তখন ভাতছালার এক বাসিন্দা এবং রাজকর্মচারী ভূপতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় অপরাপর রাজকর্মচারীদের এই অন্যায় কর্মের জন্য তাঁদের প্রতিবাদ করেন এবং বিজয়চাঁদ মহ্‌তাবের বিরুদ্ধে বর্ধমান কোর্টে মামলা দায়ের করেন। তখন তাঁকে চাকুরী হতে বরখাস্ত করা হয়। কিন্তু জেদী ব্রাহ্মণ তাতেও রাজার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী বা তাঁর আনুগত্য

স্বীকার না করে সর্বসান্ত হয়ে মামলা চালাতে থাকেন। শেষে ধর্ম ও ধর্মস্থানের অবমাননার কারণে মামলায় বিজয়চাঁদ পরাজিত হন এবং দেবীর পাকা মন্দির নির্মাণ করিয়ে দিতে বাধ্য হন। পূজা খরচের জন্য বাৎসরিক ৫০ টাকা বরাদ্দ করেন। এদিকে মহারাণী অধিরাণী ভূপতি বাবুর প্রতি প্রসন্ন হয়ে পূজা বাবদ আরও ৫১ টাকা করে বরাদ্দ করেন। ভূপতি বাবুকেও তাঁর চাকুরীতে পুনর্বহাল করেন।

তখনহতে, জমিদারী প্রথা বিলুপ্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত রাজকোষ হতে প্রতি বছর পূজা বাবদ ১০১ টাকা করে পাওয়া যেত।

ভূপতি বাবু চাকুরীতে পুনর্বহাল হলেও মামলায় সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়ে যাওয়ায় রাজানুগ্রহেই 'উইলবাড়ীতে' আশ্রয় পান। অতঃপর ভাতছালারই একজন বাসিন্দা শশীভূষণ ঘোষ মহাশয়ের হাতে পূজার দায়িত্ব অর্পণ করেন। পূজার কাজকর্ম যাতে সুষ্ঠুভাবে চলে তজ্জন্য তিনি স্থায়ী বন্দ্যোবস্ত করেন। সেই অনুসারে পূজার চারদিন বড়বাজারের 'রামলাল সিং'-এর দোকান হতে ধূপ-ধূনা ও দশকর্মাদি দ্রব্য বিনামূল্যে পাওয়া যেত, পুরাতনচকের মালাকার দিতেন মায়ের অঙ্গের সমস্ত ডাকের সাজ। তার জন্য তিনি কোন মূল্য গ্রহণ করতেন না। মানকর থেকে মৃৎশিল্পী এসে মূর্তি নির্মাণ করতেন, মাত্র আসা যাওয়ার গাড়ী ভাড়ার বিনিময়ে। বেড় থেকে বায়েন আসতো। তারা পূজার চার দিন ঢাক বাজাতো, পাড়ায় চারবাড়িতে আহারাদি করতো মাত্র। ঘোষ মহাশয় অন্তিমকালে এই দায়িত্ব দিয়ে যান ভাতছালার এক সঙ্গতি সম্পন্ন অমৃত্য হাড়িকে। জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত তিনি এই দায়িত্ব পালন করে অন্তিমকালে এই দায়িত্ব তুলে দেন তৎকালে নবাগত সত্যপ্রকাশ ভট্টাচার্য মহাশয়ের হাতে। এই সময় ভট্টাচার্য মহাশয়ের অনুরোধে শ্রী ক্ষেত্রনাথ অধিকারী মহাশয় একবার পূজার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। ভট্টাচার্য মহাশয়ের পরলোক গমনের পর তাঁর তৃতীয় পুত্র জয়নারায়ণ এই দায়িত্ব স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেন। তিনি এই পাড়ার কয়েকজন উৎসাহী যুবককে নিয়ে পূজা চালিয়ে আসছিলেন। কিন্তু তাঁর অকাল মৃত্যুতে ভাতছালার অধিবাসীবৃন্দ পূজার দায়-দায়িত্ব সানন্দে গ্রহণ করে এ যাবৎকাল সুষ্ঠুভাবেই তা পরিচালনা করে আসছেন। এবং মন্দির সংস্কার আদি কাজ, তাছাড়া বর্তমান বর্ষে মন্দির সম্মুখে নাটমঞ্চ নির্মাণ করাচ্ছেন। সাধ্য ও সামর্থ অনুযায়ী প্রতিবেশীরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।

স্মৃতিচারণ — ঁভূপতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা
শ্রীমত্যা ভবানী দেবী (চট্টোপাধ্যায়)

সাক্ষাৎকার --- শ্রী দুর্গানন্দ চট্টোপাধ্যায়

গ্রন্থপঞ্জী

১। অষ্টমবঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন (স্মরণিকা) ১৩২১

২। রাজবংশানুচরিত --- রাখালদাস মুখোপাধ্যায়।

৩। সম্বাদভাস্কর --- রচনা সংকলন (বিবিধ)

৪। বর্ধমান সম্মিলনী --- হীরকজয়ন্তী সংখ্যা ১৯৭৪

৫। রাঢ়ের গ্রামদেবতা---ডঃ মিহির চৌধুরী কামিল্যা।

৬। বর্ধমানের কথা --- শ্রী সুশীল কুমার সেন।

৭। Bengal Dist. Gazetteers, BURDWAN, 1910 J.C.K. Peterson.

৮। ১০৮ শিব মন্দিরের দ্বিশতবার্ষিকী স্মরণিকা।

৯। দৈনিক মুক্তবাংলা পত্রিকায় ৬-৯-৯৪ অজিত ভট্টাচার্য্যের লিখিত প্রবন্ধ (সাহিত্যচর্চাবিভাগে প্রকাশিত)।

১০। বর্ধমান ঃ --- ইতিহাস ও সংস্কৃতি, যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী (১৯৯৪) ৩য় খণ্ড

১১। বর্ধমান রাজ সভাশ্রিত বাংলা সাহিত্য --- ডঃ আবদুস সামাদ।

১২। বর্ধমান স্মরণিকা --- ১৯৮২

১৩। প্রাচীন বর্ধমানের সংস্কৃতি ও ধর্মীয় চেতনা --- নীরদবরণ সরকার।

১৪। বিস্মৃত রাঢ়ের বিলুপ্ত কথন --- নীরদবরণ সরকার।

১৫। বর্ধমান পরিক্রমা --- সুধীর চন্দ্র দাঁ

১৬। দেবীসর্ব্বমঙ্গলা --- রতনলাল দত্ত।

১৭। সর্ব্বব্যাপী চরাচর দেবী সর্ব্বমঙ্গলা উপাখ্যান --- নীরদবরণ সরকার।

১৮। বর্ধমান ১০৮ শিবমন্দির (বাংলা ও হিন্দী) --- নীরদবরণ সরকার।

১৯। রাঢ় বর্ধমানের সাধক কবি কমলাকান্তের জীবনী ও পদাবলী --- নীরদবরণ সরকার।

২০। আপন অন্তর্লোকে রাঢ়ের প্রাসঙ্গিকতা --- নীরদবরণ সরকার।

২১। সংস্কৃতির আলোকে বর্ধমান --- জয়ন্ত সোম।